টাইন নদীর তীর থেকে

জিয়াউল হক

টাইন নদীর ওপার থেকে

জিয়াউল হক

বাংলাদেশ রাইটার্স গিল্ড

www.pathagar.com

টাইন নদীর ওপার থেকে

জিয়াউল হক

প্রকাশক
বাংলাদেশ রাইটার্স গিল্ড-এর পক্ষে
পারভেজ রানা
স্যুইট-৫, লেভেল-৮, ৫৬, পুরানা পল্টন লাইন
ঢাকা-১০০০
ফোন: ০১৫৫-৭৮৫৩-১৬৮, ০১৯২২০০৯৯৮৪, ০১৯১১০১০১২৭
e-mail: bangladeshwg@gmail.com
Web: www.bdwritersguildblog.com

প্রকাশকাল
অমর একুশে গ্রন্থমেলা, ২০১২

স্বত্ব: লেখক

প্রচ্ছদ: অপূর্ব খন্দকার

মূল্য: ২০০ (দুইশত) টাকা
ISBN:978-984-90048-4-4

TYNE NODIR OPAR THEKE, BY- ZIAUL HAQUE. PUBLISHED BY BANGLADESH WRITERS' GUILD, PRICE: 200.00 TK. (15$) ONLY

www.pathagar.com

যাঁর হাতে এ নজরানাটুক

আম্মা ছোটকালে প্রায়ই বলতেন 'পড়া শোনা না করলে ঘোড়ার ঘাস কাটিস্, গাধা কোথাকার'। কথাটা বলতেন, কারণ, খুবই দুরন্ত ছিলাম। সারাক্ষণ এটা ওটা নিয়ে মা'কে জালিয়ে মারতাম ঘরে থাকলে। আর বাইরে খেলার মাঠে মারামারি থেকে শুরু করে পাঠান বাচ্চাদের সাথে বাঙ্গালী-পাকিস্থানী লড়াই, কিংবা করাচির সেই বিখ্যাত দর্শনীয় 'আগা খান'কা কোঠি'র মালির চোখ ফাঁকি দিয়ে ফুল তোলা কিংবা কবুতর ধরে নিয়ে আসা। এসবই ছিল নিত্যদিনের কর্মসূচী। বাসায় ফিরে প্রচন্ড কড়া মেজাজের বাবা'র হাতে পিটুনিটাও ছিল নৈমিত্তিক রুটিন!

আম্মা'র কষ্ট হতো আমার এই মার খাওয়া দেখে। আমাকে আটকাতে চাইতেন ঘরে, কিছু একটা দিয়ে। সেই 'কিছু একটা'রই তিনি ব্যবস্থা করেছিলেন। মরহুম নাসিরউদ্দীনের 'বেগম' পত্রিকার নিয়মিত গ্রাহিকা ছিলেন তিনি। সেই পত্রিকা'র কবিতা/ছড়ার পাতা হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলতেন 'এগুলো পড়, আমাকে পড়ে শোনাও'। তাঁর সান্নিধ্য আমার কাছে চিরদিনই মধুর। আম্মাকে ছড়া, কবিতা শোনাতে লেগে যেতাম।

একদিন আম্মা রাঁধছেন। আমিও তাঁকে কবিতা পড়ে শোনাচ্ছি 'বেগম' পত্রিকা থেকে। কি মনে হলো, মুখে মুখে একটা কবিতা বানিয়ে ফেললাম, মাত্র দু'টি লাইন। আম্মাকে শুনিয়ে দিলাম। আম্মা বুঝলেন, এটা পত্রিকার পাতা থেকে নয়, তাঁর গুণধর সন্তানের বাচালতা! কিন্তু তার পরেও তিনি বললেন 'ভালো কবিতা'!!

এই একটা মন্তব্যই আমার জীবনের মোড় পাল্টে দিয়েছে। এক দৌড়ে উঠে গিয়ে স্কুলের ড্রয়িং আঁকা পেন্সিল দিয়ে ঐ কবিতার লাইনের সাথে আরও দু'টি লাইন অনেক গবেষণা (!) করে লিখে আম্মাকে দেখিয়ে বলেছি, 'আম্মা, এটা আমি লিখেছি'। আম্মা তা পড়ে খুব খুশী হবার ভান করে বললেন 'সুন্দর হয়েছে, কিন্তু আরও ভালো লিখতে হবে। আর ভালো লিখতে হলে অনেক পড়তে হয়'।

সেই থেকে শুরু। স্কুলের বই পড়ি আর না পড়ি, হাতের কাছে যে বই, পত্রিকা, যখন যা পেয়েছি, তাই নিয়েই বসে পড়েছি। আম্মা বলেছেন, ভালো লেখার জন্য নাকি অনেক পড়তে হয়, সেই নেশায়। ভালো লেখক হবার নেশায়। কিন্তু দূর্ভাগ্য, 'ভালো লেখক' হতে পারিনি। সবাই তা হতে পারেনও না। কাজেই সে বিষয়ে আমার কোন দু:খ নেই। নেই কোন অনুতাপ, কিংবা বিন্দুমাত্র অনুশোচনা!

তবে আমার মা যে আমাকে বই পড়া, আর লেখায় আটকাতে পেরে খুশী হয়েছিলেন তাতেই আমি খূশী। আজও আমার নেশা বই পড়া, বই কেনা। আর এই নেশা তৈরীর পেছনে যাঁর অবদান সবচেয়ে বেশী, আজকের এই লেখাটিও আমার সেই মমতাময়ী মা 'ফাতেমা হক' এঁর হাতে তুলে দিলাম।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

আমার দু'টি কথা

আল্লাহর অশেষ শুকরিয়া যে 'টাইন নদীর ওপার থেকে' বইটা শেষ পর্যন্ত প্রকাশ হলো। বেশ ক'মাস ধরেই লেখার কাজ চলছিল। বইটার ব্যাপারে তেমন কোন পরিকল্পনা মনে ছিল না। হঠাৎ করেই শুরু করেছি। প্রবাসে বিভিন্ন দেশের বিচিত্র নারী পুরুষের সাথে কাজ করতে হয়, প্রতিদিনই তাদের সাথে ওঠা বসা করতে হয়। জীবন আর জীবিকার ত্বাগিদে ব্যস্ত সময় কাটালেও সে ব্যস্ততার তারাও এক একজন অনিবার্য, অবিভাজ্য অংশ। এভাবে আমার এই ক্ষুদ্র জীবনের দুই তৃতিয়াংশই কাটল প্রবাসে, নানা বর্ণের, নানা দেশের মানুষের সাথে।

এদেরই একজন কানাডার ওন্টারিও'র মেলেনি জনসন, এখন মারিয়াম জনসন, সদ্য ধর্মান্তরিত মুসলমান। ব্রিটেনে একসময় আমার অধীনে কাজ করতে গিয়ে অনেক ঘরোয়া আলোচনায় নীরব শ্রোতা হয়ে অংশ নিয়েছেন। সম্প্রতি পাওয়া তার একটা ই-মেইলের সুত্র ধরেই বইটা লিখতে বসেছিলাম অনেকটা আবেগতাড়িত হয়েই।

ইউরোপের এই অমুসলিম পরিবেশে নিজের চোখেই দেখছি বস্তুবাদী এ সমাজটার পরিবর্তনটা, খুব কাছ থেকেই। এ সমাজেরই লোকজনের সাথেই রাত দিন উঠা বসা, কাজ কর্ম, কথা বার্তা, লেন দেন। তাদের সাথেই হচ্ছে সুখ দুখের আলাপ, ভাবের লেন দেনও। সেরকমই কিছু কথা বার্তা, কিছু ঘটনা আর দৃশ্যমান পরিবর্তনকে একজন মুসলমানের দৃষ্টিভংগীতে তুলে ধরার ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার ফসল, এ বই।

মেলেনি জনসন, আজকের মারিয়াম জনসন'সহ আমার দেখা, জানা কয়েকজন নওমুসলিমের ইসলাম গ্রহণের কথা, এর পাশাপাশি দেশে বিদেশে, চেনা অচেনা কিছু মুসলমানের ইসলাম কেন্দ্রিক দৃষ্টিভংগী, ইউরোপ ও বিশ্বজুড়ে চলমান সামাজিক পরির্বতন আর ইসলামের বিস্তার, যা আমাকে ভাবিয়েছে, আলোড়িত করেছে, আনন্দিত বা ব্যাথিতও করেছে, সেরকমই কিছু ঘটনা, কিছু অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করেই এই লেখার সুত্রপাত হয়েছিল, আর এর পুরোটা জুড়েই তা চলেছে।

প্রকাশ হয়ে সুধী পাঠকের হাতে আসা বই এর তালিকায় এটি আমার একাদশতম বই। বাংলা ব্লগে লেখা লেখি করা কিছু উৎসাহি ব্লগারদের নিয়ে গঠিত 'রাইটার্স গিল্ড' এর কর্ণধার ক'জন পারভেজ রানা, এম এম ওবায়দুর রহমান, এঁদের উৎসাহ আর কর্মতৎপরতার কারণেই এত দ্রুত বইটা পাঠকের হাতে পৌছাল, তাঁদের প্রত্যেকের কাছেই কৃতজ্ঞ। আল্লাহ এসব আত্মসচেতন তরুণদের মাধ্যমে দেশ আর জাতির ইতিবাচক পরিবর্তনের সূচনা করুন, সে প্রার্থনা করি।

বিনায়বনত

জিয়াউল হক

abuarif@yahoo.com

অক্টোবর, ২০১১/ ইংল্যণ্ড

www.pathagar.com

www.pathagar.com

এক

ফিওনা থোমাস। একালের ফরিহা থোমাস। চল্লিশোর্ধা অনিন্দ্য সুন্দরী ইংরেজ মহিলা। তিনি আমাদের হাসপাতালে আসতেন প্রতি সপ্তাহেই। পরিচয়টাও সেখানেই হয়েছিল। দীর্ঘাঙ্গি লাল গাত্রবর্ণ, স্লীম ফারিহা প্রথম দর্শনেই চোখে পড়ার মত একজন।

ফারিহা একজন ইংরেজ, কিন্তু মুসলমান। একটা সময় ছিল, যখন 'ইংরেজ' আর 'মুসলমান' দুটো পরিচয়ের সমন্বয় হতো না। কিন্তু এখন হয়। একটা সময়ে একজন ইংরেজের মুসলমান হওয়াটা ছিল একটা 'খবর'। কিন্তু আজ কাল অহরহ দেখা যায় ইংরেজ মুসলমান, একেবারে নিরেট, নিখাঁদ ইংলিশ মুসলমান। মাঝে মাধ্যেই বিভিন্ন মস্‌জিদে, বিশেষ করে, ইস্ট লন্ডন মস্‌জিদসহ ছোট বড় বিভিন্ন শহরের মস্‌জিদবা ইসলামি সেন্টারগুলোতে ইংলিশ নারী পুরুষরা মুসলমান হচ্ছেন।

একটি দশক, তথা নাইন ইলেভেনের আগে ব্রিটেনে গড়ে প্রতি বসর দশ থেকে পনেরো হাজার ইংলিশ মুসলমান হতেন। কিন্তু ২০০১ সালে আমেরিকার নিউইয়র্কের টুইন টাওয়ারে সন্ত্রাসী হামলা এবং ২০০৩ এ ইরাক ও আফগানিস্থানে ব্রিটেন, আমেরিকার নেতৃত্বে পশ্চিমা শক্তির যুদ্ধে নেমে পড়ার পর থেকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের হার ব্যাপকভাবে বেড়েছে। ব্রিটেনে এখন প্রতি বসর গড়ে ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশ হাজার ইংলিশ নারী-পুরুষ ইসলাম গ্রহণ করে। আর ২০০৯ সালে এ সংখ্যা ৪০ হাজারে উঠেছে। এই নও মুসলিমদেরই একজন হলেন ফারিহা।

তিনি আসতেন আমাদের হাসপাতালে তার পালক পিতাকে দেখতে। তার পালক পিতা, টমাস গ্রে ডিমেনশিয়ায় আক্রান্ত, শারিরীক ও মানসিক ভাবে পঙ্গু হয়ে বিগত কয়েকটা বৎসরই আমাদের এখানে চিকিৎসারত। ভদ্রলোকের ক্লিনিকাল রিহাবিলিটেশনটা আমাকেই দেখতে হয়। সে সুত্রেই ফারিহার সাথে পরিচয়। আলাপও হয় প্রায়ই। ফারিহা প্রথম যেবার আমাদের এখানে আসেন সেবারেই তার প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষিত হয়েছে, অত্যন্ত শালীন পোষাক এবং ইসলামি কায়দায় পর্দা করে হেজাব পরা দেখে।

তাঁকে দেখে মনে গড়ে গিয়েছিল, কিছুদিন আগেই ব্রিটেনে বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত জনৈক ব্রিটিশ মুসলমান ছাত্রীর জিলবাব পরিধান করে স্কুলে যাওয়া নিয়ে হৈ চৈ হয়েছিল, সে কথা। বিষয়টি শেষ পর্যন্ত আদালত পর্যন্তও গড়িয়েছিল। আর মিডিয়ায় তা নিয়ে নিয়ে ব্যাপক তর্ক বিতর্কও হয়েছিল। তারও কিছুদিন আগে পাশের দেশ

www.pathagar.com

ফ্রান্সেও হিজাব নিষিদ্ধ করা নিয়ে ব্যাপক রাজনৈতিক আর সামাজিক অস্থিরতা দেখেছি, যার ঢেউ বিশ্বময় লেগেছিল! শেষ পর্যন্ত তো ফ্রান্সে হিজাবকে নিষিদ্ধই করে ফেলা হয় স্কুল কলেজসহ সরকারি প্রতিষ্ঠানে।

একটি গণতান্ত্রিক দেশের লক্ষ লক্ষ নাগরিকের মৌলিক অধিকার হরণ হয় সভ্যতাগর্বিত বিশ্বের নাকের ডগায়! পেছনে যুক্তি আর কারণ একটাই, তা এই যে, এটা নাকি ইউরোপের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিচিতিকে অক্ষুণ্ন রাখার জন্যই করা হয়েছে।

তখনই এই ব্রিটেনের কোন কোন মহল হতে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় লেখা লেখি করে এ কথাটা বলা হয়েছিল, বলার চেষ্টা করা হয়েছিল যে, ঢালাওভাবে মুসলিম ইমিগ্র্যান্টদের কারণে ইউরোপ তার স্বকীয়তা হারাচ্ছে! এই ব্রিটেনেও রাজনৈতিক, সংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ঐতিহ্য হুমকির মুখে পড়ছে। এখনই যদি তার লাগাম টেনে ধরা না যায় তবে পুরো ব্রিটেনই একদিন একটি ইসলামি রাষ্ট্র বনে যাবে! এমন অনেক কুশলী, উদ্ভট ও উস্কানিমুলক কথাবার্তা বলা হয়েছে, ফিচার নিবন্ধেও লেখা হয়েছে।

পত্র পত্রিকা একবার কিছু একটা নিয়ে লেখালেখি শুরু করলেই হল, এক শ্রেণীর মানুষ আছে, যারা বিষয়টি নিয়ে উঠে পড়ে লাগে যেন। তেমনটাই নেমেছিলেন ব্রিটেনের এককালিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী, এবং হাউজ অব কমন্সের লিডার, ব্রিটিশ সমাজ, রাজনীতির ও সরকারের প্রভাবশালী নেতা জ্যাক স্ট্র স্বয়ং। বলেছিলেন, মুখে নেকাব ব্যবহার করাটা হলো ব্রিটিশ সমাজে দৃশ্যমান বৈপরিত্য এবং সুস্পষ্ট সাতন্ত্রবোধের পরিচায়ক। তার মতে এটি মুসলমানদের ব্রিটিশ সমাজব্যবস্থায় ইন্টিগ্রেশনের পথে বড় বাধা।

মি. ষ্ট্র'র ঐ মন্তব্যের প্রতিবাদে লণ্ডনের সাপ্তাহিক পত্রিকায় আমার নিয়মিত কলামে তার উদ্দেশ্যে প্রশ্ন রেখেছিলাম, এই ব্রিটেনেইতো হাজার হাজার নেকাব পরা নারী ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, উকিল, সলিসিটর, শিক্ষক সহ অন্যান্য পেশায় কাজ করে আসছেন! কোনদিনও কি তাঁদের কারো বিরুদ্ধে কোন ইমপ্লয়ার বা ক্লায়েন্টের পক্ষ হতে 'নেকাবের কারণে ইন্টিগ্রেশনের পথে, বা সুষ্ঠুভাবে কাজ করার পথে বাধার সৃষ্টি হয়েছে বা হচ্ছে' এমন অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে?

এটা যদি মুলধারা ব্রিটিশ সমাজের সাথে সুস্পষ্ট স্বাতন্ত্রবোধ এবং বৈপরিত্যের দৃশ্যমান চিহ্ন হয়ে থাকে, তবে খুব স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন এসে যায় যে, ব্রিটেনের শিখ সম্প্রদায়ের মাথায় যে পাগড়ী ব্যবহার করা হয়, সে পাগড়ী এবং মিঃ ষ্ট্র'র নিজের সম্প্রদায়, ইহুদি পুরুষদের মাথায় যে টুপি ব্যবহার করা হয়ে থাকে তা, এমনকি

www.pathagar.com

খৃষ্টধর্মে বিশ্বাসীরা যে গলায় ক্রস ঝুলিয়ে রাখেন, এসবইতো একইভাবে 'দৃশ্যমান বৈপরিত্য' এবং সুস্পষ্ট স্বাতন্ত্রবোধের পরিচায়ক! তাদের বেলাতেও কি তিনি অভিযোগটি উত্থাপন করবেন, যে অভিযোগটি তিনি করেছেন মুসলিম নারীদের পর্দা করার বেলায়?

যদি না করেন, তবে যারা বলেন যে, বেছে বেছে কেবলমাত্র মুসলমান এবং ইসলামের উপরেই অতি কৌশলে আক্রমণ করা হচ্ছে, তাদের সেই কথাটাইতো সত্য হয়ে গেল। নেকাব বা হেজাব সেরকমই বৈপরিত্য প্রকাশ ঘটায়, ঠিক যেমন বৈপরিত্যের প্রকাশ ঘটায় শিখদের পাগড়ী, খৃস্টানদের ক্রস এবং ইহুদিদের মাথায় টুপি। ঐ দুই সম্প্রদায়ের পোষাকের বৈপরিত্য যদি ব্রিটিশ সমাজব্যবস্থায় স্বাতন্ত্রতার পরিচায়ক না হয়, তাদের ক্ষেত্রে ইন্টিগ্রেশনের পথে কোন বাধা না হয়, তবে মুসলমানদের হেজাবের বেলায় কেন তা 'স্বাতন্ত্রতার পরিচায়ক' হবে? কেন তা তাদের ইন্টিগ্রেশনের পথে বাধা হবে? বিষয়টি বোধগম্য নয় মোটেও!

মাল্টিকালচার বিশিষ্ট ব্রিটেনতো এই জন্যই বিশ্বের কাছে একটি আদর্শস্থানীয় 'গণতান্ত্রিক ব্রিটেন' হিসেবে পরিচিত ও সুখ্যাতি প্রাপ্ত যে, এখানে বিভিন্ন ধর্ম ও মতাবলম্বীরা তাদের নিজ নিজ ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্রবোধ, নিজ নিজ ধর্মীয় স্বাধীনতা বজায় রেখেই একটি গণতান্ত্রিক ব্রিটেনের অধিবাসি। আজ হঠাৎ করে কেন ব্রিটেনকে সেই ঐতিহ্য, সেই সুনাম, সেই পরিচিতিকে বিসর্জন দিতে হবে ? আধুনিক বিশ্বের কোন দেশে কোন জাতিসত্তাকে তাদের নিজেদের ইতিহাস, ঐতিহ্য, ধর্ম ও নাগরিক অধিকার বিসর্জন দিয়ে ইন্টিগ্রেটেড হতে হবে, এটাও কি আজ এই সভ্যতা গর্বিত বিশ্বের কাছে শুনতে হবে?

আসলে নেকাব বা হেজাব ইন্টিগ্রেশনের পথে কোন বাধাই নয়। তেমনি, যেমনি শিখদের পাগড়ী কিংবা, খৃস্টানদের ক্রস অথবা ইহুদি পুরুষদের মাথার টুপি, কোনটাই ব্রিটিশ সমাজে ইন্টিগ্রেশনের পথে কোন বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। ইন্টিগ্রেশনের পথে সবচেয়ে বড় বাধা হলো, বিদ্বেষপূর্ণ মানসিকতা। মূল ধারার ব্রিটিশ রাজনীতিবীদ, বুদ্ধিজীবি এবং অনেক সাধারণ মানুষও পাগড়ী পরিহিত শিখকে বা টুপি পরিহিত ইহুদিকে মেনে নিতে পারলেও কেবলমাত্র মুসলমানদের কে মেনে নিতে পারছেন না।

তো তারা এই ফারিহা বা ফিওনাকে না মেনে কোথায় যাবেন? তিনি তো এ দেশে উড়ে আসেন নি। তিনি এখানে আর দশটা ইংরেজের মত ইংরেজ বাবা মা'র ঔরসে জন্ম নেয়া, এই ইংল্যান্ডের আলো বাতাসে, এখানকার শিক্ষা, সাংস্কৃতি আর দর্শনে

www.pathagar.com

বেড়ে ওঠা রক্তে মাংসে একজন ইংলিশ। তার ব্যাপারেও কি এরা বলবেন যে, ফারিহা ব্রিটিশ সমাজে পুরোপুরি ইন্টিগ্রেটেড হতে পারেন নি?

ফারিহা কিন্তু এমনটা মনে তো করেনই না, বরং একবার মাত্র এক আলাপের মাঝখানে সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী জ্যাক স্ট্র'র মন্তব্যটা স্মরণ করিয়ে দিতেই তিনি রেগে লাল হয়েছিলেন। তার চেহারাটাই যেন বদলে গিয়েছিল। কোন মন্তব্য না করে কেবলমাত্র এতটুকুই বলেছিলেন;

'একবার, মাত্র একটাবারের জন্য তাঁকে আমার সামনে এসে কথাটা বলতে বলো, কেমন তার সাহস, আমিও সেটা একবার দেখতে চাই।'

তিনি রেগে গেছেন দেখে আর কথা বাড়াইনি। তবে ভালো লেগেছিল আত্মপরিচয়ের ব্যাপারে তার সচেতনতা, বলিষ্ঠতা, আর দৃঢ়তা দেখে। সত্যিই বলতে কি, খুশীও হয়েছিলাম আজকালের এই বৈরী পরিবেশে একজন মুসলমান হিসেবে নিজের স্বকীয়তা রক্ষার ব্যাপারে তার কঠোরতা দেখে।

অথচ তাঁকে দেখে কিন্তু তেমন মনে হয় না। খুবই ধীর, স্থির, খুবই নম্র টাইপের একজন মানুষ। চলা ফেরা, কথা বার্তায় শালীন, দৃষ্টি সব সময়ই নিয়ন্ত্রিত তাঁর। প্রথম দিনই নামাজের জন্য কোন নির্ধারিত স্থান আছে কি না, সেটা জানতে চেয়ে নামাজ আদায় করেছিলেন ভিজিটিং আওয়ারে।

সেটাও বেশ চিত্তাকর্ষক ঘটনা ছিল। আমি তখন আমার প্রাত্যহিক রাউন্ডে দুপুরের দিকে দোতলায় নার্সিং স্টাফের অফিসে বসে তাদের এসাইন করে দেয়া রুগীগুলোর মধ্যে থেকে কয়েকটা রুগীর কেয়ারপ্লান অডিট করছি। কানাডিয়ান নার্স মেলেনি জনসনও আমার সামনে আছেন এবং মাঝে মাঝে আমার বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন বা প্রয়োজনীয় কাগজ পত্র দেখাচ্ছেন। এমন সময় এক ভারতীয় নার্সিং এ্যাসিস্ট্যান্ট সুষমা দিক্ষিত এসে মেলেনিকে জানালেন, টমাস গ্রে'র ভিজিটর একটা রুম খুলে দেয়া যায় কিনা জানতে চাচ্ছেন, তিনি 'সালাত' করবেন।

মেলেনি জনসন বুঝলেন না ব্যাপারটি। টমাস গ্রে'র ভিজিটর ফারিহা, ভারতীয় নার্সিং এ্যাসিষ্টান্টের কাছে জানতে চেয়েছেন নামাজের জন্য কোন নির্ধারিত জায়গা আছে কিনা। অনুরোধ করেছেন তাঁকে সেরকম একটুখানি জায়গার ব্যবস্থা করে দিতে যেন তিনি 'সালাত' আদায় করতে পারেন।

www.pathagar.com

'হোয়াট ইজ সালাঠ'? আমার দিকে চেয়ে নিজস্ব বাচনভঙ্গীতে মেলানি জনসনের প্রশ্ন। তাঁকে বুঝিয়ে বললাম 'হোয়াট ইজ সালাত'। সাথে সাথে নির্দেশও দিলাম ভদ্রমহিলাকে সাহায্য করতে। তিনি বুঝলেন, এবং নির্দেশমত সেই নার্সিং এ্যাসিস্ট্যান্টকে একটা খালি রুমের চাবিসহ পাঠালেন, তা খুলে দিতে, যেন সেখানে ফারিহা 'সালাত' করতে পারেন।

মেলেনি জনসনের 'হোয়াট ইজ সালাঠ' প্রশ্নটি শুনে ক'বসর আগেকার কথা মনে পড়ল। মেলানি তো খৃষ্টান, ইংরেজ ও কানাডিয়ান। জানে না 'সালাত' কি? আমরা মুসলমানরাই কি তা জানি? জানলে মুসলিম ঘরের সন্তান তুহিন আমাকে প্রশ্ন করত 'হোয়াট ইজ নামাজ?

পাঁচ বসরের তুহিন। দুরন্তপনায় জুড়ি নেই। আমার প্রতিবেশী বাংলাদেশী পরিবারে পর পর চারটা কন্যা সন্তানের পর জন্ম নেয়া একমাত্র পুত্রসন্তান। বাবা-মা'র নয়নের মনি! সংসারে তার দাপট একচেটিয়া। বড় চারটি বোন, মা-বাবা, এমন কেউ নেই, যার উপরে তার জোর চলে না!

আমার সাথে তার দারুণ সম্পর্ক। আমাকে সে 'ফানি আংকেল' বলে ডাকে। কারণ, মাঝে মধ্যেই ওদের বাসায় বেড়াতে বা কোন কাজে গেলেই তার বায়না অনুযায়ি তাকেও দু'একটা মজার মজার গল্প শোনাতে হবে। সেই গল্পগুলো তার কাছে খুবই 'ফানি' মনে হয়, তাই তার বায়নাও বাড়ে, আরও বেশী বেশী গল্প শোনাতে হবে। ওর বায়না না মিটিয়ে উঠে আসাটা রীতিমত অসাধ্য ব্যাপার।

বাংলাদেশের গল্প শুনতে নারাজ। কারণ 'ব্যাংলাডেশ' হলো 'পুওর' 'মাডি এন্ড ডাষ্টি'! ওরকম দেশের গল্প শুনবে না! তুহিন ভেবেই পায় না তার নানা-নানী, দাদা-দাদি, আংকেল-আন্টি, কি করে সেদেশে থাকে?

সে অবাক হয় জেনে যে, তার ড্যাডি-মাম্মী, তার বড় বোনগুলোও সেই 'পুওর' 'মাডি এন্ড ডাষ্টি' দেশেই জন্মেছে, বেড়ে উঠেছে। তুহিন অবাক হয়ে বাবা মা, বড় বোনদের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখে, সে কথা শুনে।

সে নিজেও যে ঐ বাংলাদেশেই জন্মেছে, সে কথা তাকে বিশ্বাস করানোই কষ্টকর! সে যে মাত্র আট মাসের বেবি 'মাডি এন্ড ডাষ্টি ব্যাংলাডেশ'টা ছেড়ে এসেছে, সে কথা বললে তুহিন ক্ষেপে যায়। ভাবে তাকে 'ইনসাল্ট' করছিল! নিশ্চিত হতে সে মা'র কাছে ছোটে। মা'ও যখন একথাটাই জানান, তখন তুহিন নিশ্চুপ, কোন কথা বলে না।

www.pathagar.com

মনে মনে হয়ত ঐ শিশু 'পুওর, মাডি এন্ড ডাষ্টি ব্যাংলাডেশ'এ জন্মেছে বলে হীনমন্যতায় আক্রান্ত হয়! নিজেকে ধিক্কার দেয়!

শিশু তুহিনেরই বা দোষ দেব কী? তার বাবারই এক বাংলাদেশী বন্ধু ও প্রতিবেশীকে আক্ষেপ করতে শুনেছি 'কেন যে তার জন্মটা বাংলাদেশে হয়েছিল'?

পাঁচ বৎসরের তুহিন স্ট্যামিনা আর উদ্যমে ভরা, সে প্রমাণ অনেকবার দেখিয়েছে। ফ্লোরে কার্পেটের উপরে শুয়ে এক দুর্বোধ্য ভঙ্গিমায় চক্রাকারে ঘোরে, একবার পেটে ভর করে মাথা ঘাড় উঁচু করে, আবার পরক্ষণেই বিদ্যুতের গতীতে পাশ ফিরে, বৃত্তাকারে দু'একটা পাক খেয়ে তড়াক করে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ায়! এর পরে মাজা বেঁকিয়ে, হাত, পা এবং চোখ মুখের কিম্ভূতকিমাকার সঞ্চালনে ব্যস্ত হয়! প্রথমদিন আমিতো হতবাক! ভেবেই পাচ্ছিলাম না, ছেলেটা অমন করছে কেন?

অনেকক্ষণ পর হাঁপাতে হাঁপাতে জানান দিল, এটা একটা ড্যান্স, বন্ধুরা কেউ তার সাথে এই ড্যান্সে পাল্লা দিয়ে পারে না! আমাকে স্বীকার করতেই হবে, জীবনেও এরকম ড্যান্স দেখিনি। এটা যে ড্যান্স, তাইতো জানতাম না। 'মাষ্টার ড্যান্সার' তুহিনের ড্যান্সটুকু দেখেও বুঝলাম না, কোন শৈল্পিক সুষমার কারণে শরীরের এহেন দুর্বোধ্য এবং কিম্ভূতকিমাকার সঞ্চালনকে 'ড্যান্স' বলতে হবে?

প্রশ্নটি শুনে সে হেঁসেই খুন। আমি যে নির্বোধ, তা বুঝতে পেরে ছেলেটি আমাকে বুঝিয়ে দিল 'মাইকেল জ্যাকসন' নামের একজন বড় ড্যান্সার এ রকম নাচে! সে তো কেবল তারই অনুকরণ করছিল!!

এবারে উজবুক 'ফানি আংকেল' বুঝল, এতক্ষণ তুহিন যা করছিল সেটা সত্যিই 'ড্যান্স'! অনেক বড় মাপের নাচ! নিছক পাগলামি নয়!! আমাদের তুহিন, শিশু হলেও ভালোই রপ্ত করেছে। মেধা আছে বটে ছেলেটার!

কখনও কখনও দু'একটি সপ্তাহই চলে যায় ব্যস্ততার কারণে, তাদের বাসায় যাওয়া হয়ে ওঠে না। ওর সাথে দেখাও হয় না। তার বাবা-মা মাঝে মধ্যেই বলেন যে, তুহিন নাকি তার 'ফানি আংকেল' এর খোঁজ করে প্রায়ই, জানতে চায় 'ফানি আংকেল' কেন আসে না তাদের বাড়িতে?

গত বড়দিনের আগে তার বাবার সাথে দেখা হলে তিনি চা'র আমন্ত্রণ জানালেন। অবসর থাকায় আমিও গিয়ে উঠলাম তাদের বাড়ীতে। ড্রয়িংরুমে বসে তুহিনের বাবার সাথে আলাপ করছিলাম। এরই মাঝে দোতলা থেকে তুহিন নেমে এল হৈ হৈ করতে

www.pathagar.com

করতে। তার 'ফানি আংকেল'কে পেয়েছে অনেকদিন পরে, আজ দু'টো গল্প না বলে আংকেলের আর মুক্তি নেই! ভাবখানা এমনই! এমনটাই ভেবেছিলাম।

কিন্তু না, আজ সে গল্প নয়, বরং বড় আগ্রহ ভরে 'ফানি আংকেল'কে হাতে ধরা অনেকগুলো গ্রিটিংস কার্ড দেখালো এক এক করে, কোনটা কার জন্য, সে কথাও ব্যাখা করল। সে তার বন্ধু বান্ধবদের গ্রীট করবে বড়দিন উপলক্ষ্যে। কার্ডগুলো বড় আগ্রহভরে দেখালো। তার বাবা'কে, মা'কে কার্ড দেবে, তার বোনদেরও দেবে। সে জন্যই কার্ডগুলো আনিয়েছে জানান দিল। আমাকেও একটা কার্ড দেবে বলে সে নিশ্চিত আশ্বাস দিল, পাছে যেন আমি আবার নিরাশ না হই!

প্রচণ্ড ব্যস্ততার মধ্যেও চেষ্টা করি শুক্রবারকে সাপ্তাহিক ছুটি হিসেবে নেবার। কখনও সফল হই, কখনও বা শত প্রচেষ্টাতেও ম্যানেজ হয় না। শুক্রবার ছুটি পেলে প্রতিবেশী বন্ধু'কে নিয়েই জুম্মা পড়তে যাই মস্‌জিদে। দু'জনে হাঁটতে হাঁটতে মস্‌জিদে যাই, নামাজ শেষে আবার একইভাবে গল্প করতে করতে বাসায় ফিরি।

ভদ্রলোককে বার বার বলেছি তার ছোট্ট ছেলেটা, তুহিনকেও যেন তিনি সাথে নেন মস্‌জিদ পর্যন্ত, কিন্তু তিনি প্রতিবারই সে কথা নাকচ করে দিয়েছেন এই বলে যে;

'একেবারে ছোট, আরও একটু বড় হোক, তখন না হয় সাথে করে নেয়া যাবে।'

বোঝানোর চেষ্টা করেছি, এবয়সে ছেলেটা যদি নামাজ, মস্‌জিদ, এসব মৌলিক ইসলামি বিষয়াদির সাথে পরিচিত না হয়, তবে বড় হলে আর সে পথে তাদের নেয়া যাবে না। কিন্তু তিনি সে কথা খুব একটা কানে না নেয়ায় হাল ছাড়তে হয়েছে, পাছে না আবার তিনি বিরক্ত হন ভেবে! তবে সুযোগ বুঝে তার স্ত্রী, তুহিনের মা'কে বললাম কথাটা। যতটা নরমভাবে বলা সম্ভব, বুঝিয়ে বললাম;

'আপনারা যে মাইকেল জেকসনের অনুকরণে তুহিনের সেই কিম্ভূতকিমাকার নাচ দেখে যারপরণাই প্রীত হন, ছেলে মানুষের নিরেট ছেলেমানুষি ভেবে উপেক্ষা করেন, আসলেই সেটা কি ছেলেমানুষি?

ছেলেটা নিজের অলক্ষ্যেই ভিন্নধর্মী কালচার, সংস্কৃতির প্রভাবে বেড়ে উঠছে, বয়স বাড়ার সাথে সাথে সে ওরকম রক, পপ, ডিস্‌কো নাচে আরও বেশী পারঙ্গম হবে, ততদিন অনেক দেরি হয়ে যাবে। পারবেন কী তাকে সেই জীবন থেকে ফেরাতে? রক, পপ, ডিসকো'র সাথে সাথে এসবের অনিবার্য অনুসঙ্গ হিসেবে যদি ছেলে ড্রাগ্‌স ধরে, সাথে দেখেন গার্লফ্রেন্ড, তখনও কি ছেলেমানুষি ভেবে চুপ থাকতে পারবেন?

www.pathagar.com

যদি না পারেন, যদি তার জীবনাচারে বাধা দেন বাবা-মা'র দ্বায়িত্ব ভেবে, ছেলে কী তখন আপনাদের সেই হস্তক্ষেপকে স্বাভাবিকভাবে মেনে নেবে? যদি তেমনটা না নেয় বা নিতে না চায়, তখন তো সংঘাত অনিবার্য! তার দায় কে নেবে? কি ভাবে তো সামাল দেবেন?

একজন মুসলমান বাবা-মা হিসেবে ছেলের প্রতি যে মৌলিক দ্বায়িত্ব, সেটি যদি এই সময় পালন না করেন, তবে বলুনতো আর কবে তা পালন করবেন? আপনার ছেলে প্রতিদিন স্কুলে যাচ্ছে। ব্রিটেনের ঐ স্কুল কি তাকে ঈমানের মৌলিক পরিচিতি, আল্লাহ, রাসুল, কলেমা শেখাবে বলে মনে করেন? তারা যদি না শেখায়, তবে তাকে তা শেখানোর দ্বায়িত্বটি কার?'

ভদ্রমহিলা আমার কথা গুলো খুব মনযোগ দিয়ে শুনলেও কিছুই বললেন না। আমিও আর কথা বাড়ালাম না। তাদের পারিবারিক ব্যাপার, আমার মত আমি চেষ্টা করেছি। এখন তাদের নিজেদের সিদ্ধান্ত নেবার পালা।

দুই

এক মাস কঠোর সিয়াম শেষে খুশির ঈদ। ঈদ এলেই আমার মন খারাপ হয়। এটা নতুন নয়, গত অন্তত কুড়িটি বসর ধরেই এ সমস্যা আমার। ঈদ আসে খুশির জন্য, কিন্তু অবাক ব্যাপার হলো, আমি খুশি হতে পারি না। অথচ একটা সময় ছিল, ঈদের জন্য কত অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করেছি! কত প্লান করেছি ঈদকে নিয়ে। অপেক্ষায় থাকতাম কবে আসছে আমাদের মাঝে ঈদ?

এখনও তো কত লোকে ঈদের জন্য অপেক্ষা করে থাকেন। আমাদের অনেকের, বিশেষ করে, শিশু কিশোরদেরতো ঘুমই হয় না ঈদের অপেক্ষায়? কিশোরী, তরুণীরা ছোটে মেহেদি জোগাড়ে। আর শিশুরা বাবা-মা'র কাছে নতুন কাপড়ের বায়না, ঈদের বখশিস নেবার অংক মেলাতে! আমরা ছেলে বুড়ো সকলেই ভীড় করে তাকিয়ে থেকেছি আকাশ পানে, ঈদের চাঁদ, খূশীর চাঁদটাকে এক নজর দেখতে।

খূশীর চাঁদ আমাদের মাঝে ঈদ আনে। আমরা পরিবার-পরিজন, আত্বীয়-স্বজন, বন্ধু বান্ধব নিয়ে মেতে উঠেছি ঈদের খুশিতে। সেই ঈদ-ই চলে এল, আবার তা চলেও যাবে। কারো মাঝে তা আবারও আসবে যথা সময়ে, যে ভাবে এসেছিল এর আগের বছর গুলোতেও।

www.pathagar.com

কিন্তু ঈদ এলেই আমার মন খারাপ হয়। হয়ত নিজের ব্যর্থতা, দায়িত্বহীনতাটা আবার মনে পড়ে বলেই এমন হয়। লজ্জা পাই। নিজেকে ছোট মনে হয়, অপরাধী মনে হয়। অথচ এই অনুভূতিটাকে চাপা দিয়েই খুশী'র ভান করতে হয়। খুশী হতেই হয়!

ঈদ মানেই'তো খুশি। মুসলমানদের সবচেয়ে বড় পার্বণ, আনন্দানুষ্ঠান। আবারও চলে এল। আবারও সেদিন নতুন কাপড়ে, নতুন সাজে, আতর, সুগন্ধীর মিষ্টি গন্ধে পথ মাতিয়ে ছুটেবে সবাই ঈদগাহে। বাড়ির আশে পাশে মৌ মৌ করবে পোলাও, বিরিয়ানী, কোরমা, ফিরনী জর্দাসহ নানান রুচীকর খাবারের লোভনীয় গন্ধ। আবারও রাঁধুনীরা সেদিন ব্যস্ত হবেন রান্নায়। ধনাঢ্যরা ছুটবেন বাজারে, আধুনিক শপিংমলগুলোতে। অনেকের আবার এইসব শপিংমলগুলোতে পোশাবে না। তাঁরা ছুটবেন ব্যংকক, কুয়ালালামপুর, দিল্লী, সিংগাপুর, দুবাই, লন্ডন'এ ঈদের বাজার করতে!

ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা, সিংগাপুর, মধ্যপ্রাচ্যের শেখশাসিত আরব ধনী দেশগুলোর মত ঈদ আসবে বাংলাদেশের মত গরীব দেশগুলোতেও। যে সুদান, সোমালিয়া, ইথিওপিয়ায় ক্ষুধা মানুষের নিত্য সঙ্গী, যে নাইজার-এ প্রতিদিন মানুষ না খেয়ে মারা যাচ্ছে, সেই সব 'শ্বশ্মান'এও ঈদ আসবে। আবার চলেও যাবে। যে ইরাক, যে আফগানিস্থানে নিত্যই মৃত্যু আর হত্যার উন্মাদনা, সেখানেও ঈদ আসবে! ঈদ মানেই তো খুশি। অতএব 'ঈদ' আসা মানেই 'খুশি' আসা!

সত্যিই কী তাই? সত্যিই কি ইরাক আর আফগানিস্থানে, যেখানে প্রতি ঘন্টায় ঘন্টায় মুসলমান নারী, পুরুষ, শিশু, আবালবৃদ্ধবনিতার রক্তে রাজপথ ভাসছে, সেখানে ঈদ বা খুশি আসবে?

সত্যিই কি নাইজারের যে মা কোলের শিশুকে এক ফোটা দুধের অভাবে তীলে তীলে মরতে দেখেছেন, যে বাবা সদ্যমৃত সন্তানকে কবরে শুইয়ে এসেছেন অথচ তার বাড়ীর আঙিনায় এখনও লাশ ধোয়ানোর পানিটুকুও শুকোয়নি, তার বাড়ীতেও 'ঈদ' 'খুশি' আসবে কি ?

যেসব তরুণ-তরুণী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, বিনা চিকিৎসায় তিলে তিলে মরছে, খড়পাতার বিছানায় শুয়ে বুকের গভীর থেকে টেনে তুলছে থোকা থোকা রক্ত, নিঃশেষ করে দিচ্ছে তিল তিল করে জীবনীশক্তি, শুধুমাত্র একটু ঔষধের অভাবে, একজন ডাক্তারের অভাবে, তাদের জীবনেও কি ঈদ আসবে?

www.pathagar.com

ফিলিস্তিন, চেচনিয়া, বসনীয়া, কাশ্মীর আর মিন্দানাও এর মুসলমানদের জীবনেও কি ঈদ আসবে? নামবে কি খুশীর ঢল? সত্যিই কি মৃত্যু উপত্যকায় এক সীমাহীন অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মাঝে এইসব হতভাগ্য মুসলমানরা ক'দিন পর আর দশজন মুসলমানের মতই 'ঈদ'এর 'খুশি'তে মেতে উঠবেন?

'ঈদ' ধর্মীয় উৎসব। এর বহুমাত্রিক প্রভাব ও গুরুত্ব রয়েছে প্রাথমিকভাবে মুসলমানদের, এবং চূড়ান্ত বিচারে পুরো মানবসমাজের প্রতিটি সদস্যের মনোজগতে। এর একটি আদর্শিক দিক রয়েছে। রয়েছে নৈতিক শিক্ষা। 'ঈদ' সামাজিক উৎসবও বটে। মুসলমানদের সবচেয়ে বড় সামাজিক উৎসব। কাজেই পুরো সমাজ, পুরো সমাজ ব্যবস্থা, সমাজের ছোট, বড়, ধনী, গরীব প্রত্যেকের উপরে এর প্রভাব এড়ানো যায় না। যাবার কথাও নয়।

এর প্রমাণ দেখতে পাই সেই প্রাথমিক যুগের মুসলিম সমাজের ঈদ অনুষ্ঠানের দিকে নজর দিলে। খোদ রাসুলুল্লাহ (সঃ) এঁর জীবনেই দেখেছি, তিনি ঈদের দিন ক্রন্দনরত এতিমকে কাছে টেনেছেন। নিজের পরিবারেই আশ্রয় দিয়ে তাঁকে সামাজিক, অর্থনৈতিক, মনস্তাত্ত্বিক ও বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে পূনর্বাসিত করেছেন। একজন অখ্যাত, হতভাগা, পথশিশু এতিমকে তুলে এনে সৌভাগ্যবান বানিয়েছেন।

আমরা যারা আজ ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ এবং রাষ্ট্রে সেই মহান মানবসত্তা রাসুলুল্লাহ (সাঃ) কে পূর্ণাঙ্গ অনুসরণের কথা বলি, তার উম্মত হিসেবে তুলে ধরি, তারা মহান রাসুল (সা:) এঁর জীবন থেকে কোন শিক্ষাটুকু নিলাম? তিনি ঈদের দিনে, ঈদের খূশী যেভাবে একজন অনাথ এতিমের সাথে ভাগ করে নিয়েছেন, আমরা ক'জনে তেমনটা করলাম? ক'জনে তেমনটা করব?

আমাদের দেশে ঈদের দিনেও কত এতিম, অনাথ, ভূখা-নাঙ্গা অভূক্ত পড়ে থাকছে রাস্তায়, ষ্টেশনের প্লাটফরমে, লঞ্চঘাটে, পার্কে, গাড়ির বারান্দায়। আমরাতো উল্টো এইসব ঠিকানাহীন শিশুদের মাড়িয়ে, দু'পা এ দলে ছুটেছি 'ঈদ' করতে!

আমাদের দিকে বুকভরা আশা নিয়ে এইসব শিশু, এতিম, অসহায় নারী-পুরুষরা তাকিয়ে আছে, আমাদের দৃষ্টিতে, আমাদের চেতনায় তা ধরা পড়ে না! কারণ আমরা খুব ব্যস্ত ছুটে যেতে, পাছে না আবার গাড়ী ফেল করি! পাছে না আবার জামাত ফেল করি!

সবাই তার নিজ নিজ পরিবার পরিজনদের কাছে ছোটেন। আমরাও ছুটেছি। সেটাই স্বাভাবিক, জীবনের স্বতস্বিদ্ধ দাবীও বটে। দোষের কিছুই নেই। কিন্তু ছোটার পথে

www.pathagar.com

সেইসব হতভাগাদের, যাদের পরিবার পরিজন নেই, যাদের আবাস নেই, ছুটে যাবার জায়গা নেই, তাদের অবজ্ঞা করেছি, ভ্রুক্ষেপও করিনি, চোখ তুলেও চেয়ে দেখিনি! ভাগের সুযোগ আর রসদ থাকায় ঈদের আনন্দমূখর দিকটিকে গ্রহণ করেছি পূর্ণমাত্রায়।

অথচ তার বিপরীতে এর নৈতিক আর সামাজিক দিকটিকে অবজ্ঞা করেছি পুরোপুরিই। মানুষ, বিশেষ করে, একজন মুসলমান হিসেবে নিশ্চয়ই সেটা দ্বায়িত্বহীনতারই পরিচয় নয় কেবল, এটা পাপও বটে। এই পাপবোধই আমাকে কুরে কুরে খায়। নিজেকে যে অপরাধী মনে হয়, সেটা একারণেই। ঈদ এলেই মনে পড়ে যায়, আমরা আমাদের দায়িত্ব পালন করিনি, করছি না।

মনে পড়ে যায়, কত শিশু ঈদের দিনেও একটা ফোটা দুধের জন্য গলা ফাটিয়ে কাঁদবে, কত মা, কত বোন এক টুকরো কাপড়ের অভাবে ঘরের বাইরে বেরুতে পারবে না। কত বনী আদম আশে পাশেই না খেয়ে অভূক্ত থাকবে। তাদের কোন খোঁজ খবর না নেওয়াটা পাপ।

এই পাপের জন্য মুসলমান হিসেবে একদিন আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতেই হবে। কি জবাব দেব সেদিন? কোন মুখ নিয়ে সেদিন দাঁড়াব এই আমি, যে আমি ঈদের নামে আনন্দ-উল্লাসে মজেছি, ভোজনে, উচ্ছ্বাসে মেতেছি। কিন্তু সমাজের এতিম অনাথদের দিকে তাকাইনি, কেবল ক'টা টাকা 'ফেতরা' দিয়েই দায় সেরেছি!

জবাব দিতেই হবে। যাঁর উম্মত হবার দাবীদার আমরা, সেই মহানবী রাসুলুল্লাহ (সা:) এঁর জীবনের 'ঈদ' থেকে আমাদের 'ঈদ' কেন ভিন্নতর হয়েছিল? সে প্রশ্নের। রাসুল (সা:) যদি রাস্তার এতিমকে বাড়ী নিয়ে ঈদের আনন্দ ভাগাভাগি করতে পারেন, তবে তার উম্মত দাবীদার আমরা কেন তা পারলাম না?

রাসুল (সা:) খাবার পরে মিষ্টি খেতে ভালবাসতেন বলে সেই মিষ্টি খাওয়াটাকে যদি আঁকড়ে ধরতে পারলাম, তবে যে রাসুল এতিমকে ধরে নিয়ে তার ভরণ পোষণের, পূনর্বাসনের ব্যবস্থা করতেন, সেই সুন্নতটাকে আমরা কেন গ্রহণ করলাম না? ঈদের আনন্দকে গরীব দু:খীদের মাঝে ভাগাভাগী করে নেওয়াটাকে কেন সুন্নত হিসেবে পালন করলাম না? এর জবাব তার উম্মত হবার দাবীদার প্রতিটি ব্যক্তিকেই দিতে হবে। এড়ানো যাবে না কোনমতেই, কোনভাবেই না।

যে রাসুল (সা:) নিজের খাবারকে তুলে দিতেন অভূক্তের হাতে, নিজে থাকতেন অভুক্ত! তার উম্মত হয়েও কেন আমাদের নিজেদের ভূরি ভোজনের সময় পাড়া পডশী

www.pathagar.com

(অনেকের তো আবার নিজের বাবা-মা, ভাই-বোন পর্যন্ত!) অভূক্ত থাকে, তারও জবাব দিতে হবে বৈকি।

দিতে হবে, কারণ, ঈদ এসেছিল এইসব অসঙ্গতিকে দুর করতে। আজ যখন আমরা ঘটা করে, সাড়ম্বরে ঈদ পালনে ব্যস্ত, তখন সেই ঈদের আর্থসামাজিক, মনস্তাত্বিক, নৈতিক ও আদর্শিক শিক্ষা কেন সমাজে প্রতিফলিত হলো না? তার জবাব দেবার দায়ও আমাদেরই। এ থেকে কোনমতেই নিস্তার নেই।

ভাবনাগুলো প্রতি বসরেই মনে উদয় হয়। ঈদে সেটা আরও তীব্রতর হয়। কিন্তু জীবনের কি নির্মম পরিহাস, বাস্তবতার কি নিষ্ঠুর নিয়ম, সেই আমিও ঈদ আসলে 'ঈদ' পালন করি, করতে বাধ্য হই বুকের মধ্যে একরাশ চাপা ক্ষোভ, একরাশ ব্যর্থতা আর অপরাধবোধকে চেপে রেখে ঈদে ব্যস্ত হয়ে পড়ি!

এরকমই এক ঈদে সকালে বাসা থেকে বের হবার আগে প্রতিবেশী ভদ্রলোককেও ফোন করলাম, একসাথে নামাজে যাবার জন্য। বললেন, তিনিও রেডি হচ্ছেন, আমি বের হলেই তার বাসায় নক করি। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই তার দরজায় কড়া নাড়লে তিনি দরজা খুলে দিলেন, আমি দরজাতেই দাঁড়িয়ে তাঁরই অপেক্ষায়। ড্রইংরুমে তার স্ত্রী শিশু তুহিনকে ঠেলছেন, বাবার সাথে ঈদের নামাজে যেতে।

কিন্তু ছেলেটার চোখ মুখ বলে দিচ্ছে সে খুশী নয়। এক হাতে দশ পাউন্ডের একটা নোট ধরা, অপর হাতটি দিয়ে চোখ ডলছে ঠাঁই দাঁড়িয়ে! পা বাড়াবে বাবার দিকে, তার কোন লক্ষণই নেই। যদিও পেছন থেকে মা বার বার ঠেলছেনই, বাবাও সামনে থেকে ডাকছেন;

'হারি আপ, লেট্স গো, উই আর গোয়িং টু বি লেট '।

তার অবস্থা দেখে করুণা হলো! আমার সাথে ওর দারুণ সম্পর্ক থাকায় এগিয়ে তার হাত ধরে বললাম;

'এসো আমার সাথে, আমরা নামাজ পড়ে দ্রুত চলে আসব। আর এর পরে তোমাকে মজার মজার দুটো গল্প বলব'।

ছেলেটার মুখে তার পরেও হাসি ফুটল না। তবে কথা ফুটল বটে! সকলকে, বিশেষ করে তার বাবা-মা'কে অবাক করে দিয়ে সে প্রশ্ন করে বসল;

'হোয়াট ইজ নামাজ' ?

www.pathagar.com

তার বাবা-মা বিব্রত, আমরা সবাই বিস্ময়ে হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম কিছুক্ষণ! তাইতো! পরিবারে নামাজের প্রাথমিক জ্ঞানটুকুও না পাওয়া এক শিশুকে আমি কোথায় নিয়ে যাচ্ছি? তাকে যে জানানোই হয়নি 'হোয়াট ইজ নামাজ '?

এক আমেরিকান ডেভিড এর কাহিনী শুনলাম ও দেখলাম সেদিন ইন্টরনেটে। টেক্সাসের এই ভদ্রলোক এয়ার ফোর্সে চাকুরি করতেন, এখন অবসরে। ফুটবল, বেসবল তার প্রিয় খেলা। তিনি মুসলমান হয়েছেন ২০০৭ এ। এর পরে আজ পর্যন্ত একটা ওয়াক্ত নামাজও বাদ দেননি। তাঁকে সেদিন দেখলাম স্টেডিয়ামে খেলা চলার সময়ও এক কোণায় দাঁড়িয়ে নামাজ পড়লেন হাজার হাজার দর্শকের সামনেই। উপস্থিত দর্শক, তার সতীর্থ খেলোয়াড়বৃন্দ, আশে পাশে পাহারায় নিয়োজিত পুলিশ'সহ নিরাপত্তাকর্মীরা চেয়ে চেয়ে তা দেখল। দেখল একজন নওমুসলিম আমেরিকানের নিষ্ঠা আর একাগ্রতা!

তার স্ত্রীও একজন শেতাঙ্গিনি টেক্সান। তার স্ত্রীর বান্ধবী, তিনিও একজন শেতাঙ্গিনি নওমুসলিম। এই মহিলা প্রিয় রাসুল সাঃ কে এতটাই ভালবাসেন যে, তিনি কেয়ামতের দিনে প্রিয় রাসুলের নিকটমত স্থানে থাকার প্রার্থনা করেন আল্লাহর কাছে! এটাই তার দৈনন্দিন প্রার্থনা! ডেভিডের স্ত্রী তার দুই বসর বয়সি শিশুপুত্র আব্দুর রহমানকে একটা লোক দেখিয়ে প্রশ্ন করছে, এটা কে বানিয়েছে? আর ঐ শিশুটিও জবাব দিচ্ছে 'আল্লাহ' বলে। চমৎকার দৃশ্য, চোখে পানি এসে যাবার মত অবস্থা!

আমেরিকার মত বিরুদ্ধ পরিবেশে জন্ম নেয়া মাত্র দুই বসর বয়সি শিশুটির জবাবের বিপরীতে যখন মুসলিম পরিবারে জন্ম নিয়ে বেড়ে ওঠা তুহিনের কথা ভাবি, তখন মনে হয়, এ অবস্থাটা আর কিছুই নয়, একটা খন্ডচিত্র মাত্র। তার অবস্থা, তার পরিবারের ভূমিকা দেখেই বুঝি যে, ইসলাম আমাদের কাছে, আমাদের নতুন প্রজন্মের কাছে অপরিচিত হয়ে উঠছে। একথাটাই কি প্রিয় রাসুল (সাঃ) তার এক হাদিসে বলে যাননি?

তিন

প্রিয় রাসুলুল্লাহ (সঃ) একবার বলেছিলেন 'ইসলাম সূচিত হয়েছিল অপরিচিত ও অনাত্মীয় পরিবেশে, এবং সে (ইসলাম) আবারও সেই প্রাথমিক সূচনাকালের অবস্থায় ফিরে আসবে' ।যতটুকু মনে করতে পারি, মুসলি হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে।

www.pathagar.com

একজন সাধারণ মুসলমান হিসেবে হাদিসটির কিছুটা চিত্রই যেন দেখতে পাচ্ছি আমাদের মুসলিম সমাজে।

বিশ্বের ছয়শত কোটি মানুষের কাছে, বিশেষ করে অমুসলিম সম্প্রদায়ের কাছে ইসলাম কতটা পরিচিত সে প্রশ্নটা নয় বরং এই প্রশ্নটিই আলোচনা করে দেখি যে, ইসলাম এই আমাদের মুসলিম সমাজের কাছেই বা কতটুকু পরিচিত? আমরা মুসলমানরাই বা ইসলামকে কতটুকু জানি?

আমরা যদি আমাদের সমাজের দিকে তাকাই, কি দেখব? যে কোন একজন সাধারণ মুসলমান যুবককে পর্যবেক্ষণ করুন, এক এক করে তার চাল-চলন, আচার-আচরণ, কথা-বার্তা, প্রাত্যহিক লেন-দেন দেখুন।

খুব গভীরে যাবার দরকার হবে না, সেটা আমি নিশ্চিত। তার আচার আচরণে ইসলামের শিক্ষা, দর্শন বা চেতনার দূরতম কোন সংশ্লিষ্ঠতা নেই। তার প্রাত্যহিক আচার-আচরণ, লেন-দেন, উঠা-বসা, চলা-ফেরা দেখে আর যাই হোক, অন্তত একজন খাঁটি মুসলমানের আচার-আচরণ, চলা-ফেরা বলে মনে হবে না।

তার পোষাক-আষাক, উঠা-বসা দেখুন, দেখুন খাদ্য-পানীয়, দেখুন তার হাতের বই বা ম্যাগাজিন। (অবশ্য যদি তার হাতে আদৌ কোন বই ম্যাগাজিন থাকে), তার অবসর সময়কাল, খেয়াল করুন তার চিত্ত বিনোদনের উপায়-উপকরণ, পথ-পদ্ধতি। দেখুন তার বন্ধু-বান্ধব কারা, পর্যালোচনা করুন বড়দের সাথে তার ব্যবহার, ছোটদের প্রতি তার আচরণ। এরপরে মিলিয়ে দেখুনতো তার দৈনন্দিন জীবনের কোথায় আপনি ইসলামকে পেলেন? কোনখানেই নয়। তার জীবনে কি পেয়েছেন তাতে আমাদের আগ্রহ নেই। কেবল যে বিষয়টি জানা গেল, সেটা হলো, তার জীবনের কোথাও পূর্ণ ইসলাম নেই।

একইভাবে একজন কিশোর, একজন কিশোরী বা শিশুর জীবন দেখুন। তার প্রাত্যহিক বেড়ে ওঠার মধ্যে ইসলাম নেই! তার প্রতিদিনের জীবন চিত্রে অনেক কিছুই আছে, নেই কেবল ইসলাম। হ্যাঁ সেখানে কোন ইসলাম নেই!

সমাজের একজন ব্যবসায়িকে খেয়াল করুন, তার লেন দেন দেখুন, সেখানেও ইসলাম দূর্লভ। একজন শিক্ষককে দেখুন, দেখুন একজন শিক্ষার্থিকে, তেমনি একজন নারীকে, একজন মুসলিম মা'কেও বিচার করুন, দেখবেন কোথাও পূর্ণাঙ্গ ইসলাম নেই। কদাচিৎ কোথাও আল্লার কোন বান্দাহ ইসলামকে ধরে রাখার চেষ্টা করছেন বটে কিন্তু বিভিন্ন কারণে তাও অসম্পূর্ণ।

www.pathagar.com

প্রশ্ন হলো, এমনটা হলো কেন? অমুসলিমরা না হয় ইসলাম জানে না, কিন্তু আমরা 'মুসলমান', আমাদের চরিত্রে কেন ইসলামের বহি:প্রকাশ ঘটে না? এর একমাত্র উত্তর, আমরা মুসলমানরা ইসলাম জানি না। দু'চারজন হতভাগা এমনও আছে, যারা বলবে, তারা ইসলামকে মানে না! ওদের কথা আলাদা। কিন্তু অধিকাংশের বেলায় এটাই একমাত্র কারণ, আমরা ইসলামকে জানি না, যদিও মানি এবং মানতেও চাই।

হ্যাঁ, আমরা ইসলামকে জানি না, ইসলাম আমাদের কাছে অপরিচিত হয়ে পড়েছে। আমরা ইসলামকে চিনি না। ইসলামের সাথে আমাদের চিন্তা-চেতনা, আদর্শ-বিশ্বাস, শিক্ষা-দীক্ষার কোন সম্পর্ক নেই। ফলে ইসলাম আমাদের কাছে ততটাই অচেনা, যতটা অচেনা সেই শনি বা মঙ্গল গ্রহ!

কেন ইসলামকে জানি না? উত্তর হিসেবে এক একজন এক এক রকম ব্যাখ্যা দেবেন। কেউ হয়ত বা মুসলিম জনমানসে আধুনিক সভ্যতার প্রভাবের কথা, কেউবা বিগত কয়েকশত বসর ধরে উপনিবেশ শাসনের প্রভাবের কথা, কেউ বা শিক্ষা ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মুসলমানদের পশ্চাৎপরতার কথা বলবেন। এরকম অনেক কারণের কথাই উল্লেখ এবং তাঁদের মতের স্বপক্ষে যুক্তিও তুলে ধরবেন। এর কোনটিকেই অস্বীকার কিংবা সেসবের সত্যতা নিয়ে দ্বিমতও পোষণ করি না।

মুসলিম উম্মাহর শোচনীয় অবস্থাটা হয়ত এড়ানো যেত না বিগত কয়েকশ' বসরের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পটপরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে। বিশেষ করে, মুসলিম জনপদসমুহের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব হারানো, বুদ্ধিবৃত্তিক পশ্চাৎপরতার সাথে সাথে অর্থনৈতিক দেউলিয়াত্ব এবং একই সময়ে ইউরোপীয় রেনেঁসার উদ্ভব, সব মিলিয়ে তাদের পশ্চাৎদপরতা একরকম অবধারিত ছিল। এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

কিন্তু এটা বিস্ময়ের কারণ যে, আমাদের অবস্থাটা সচক্ষে দেখেও কেন পরিত্রাণের পথ বের করতে পারলাম না বা এ লক্ষ্যে কোন কার্যকর উদ্যোগ নিলাম না? বিগত চার শতাব্দীর ইতিহাস ঘাঁটলে দেখবেন আমরা আমাদের পতনকে ঠেকাতে পারিনি! সেখান থেকে উঠে আসার কোন কার্যকর ব্যবস্থাও নিতে পারিনি।

ইতিহাসের দিকে নজর দেয়া যক্ষ। চেঙ্গিস খানের নেতৃত্বে বর্বর তাতার'রা আব্বাসীয় খেলাফত তছনছ করেছে। তৎকালিন বিশ্বে জ্ঞান বিজ্ঞানের লীলাভূমি, সভ্যতার পাদপীঠ বাগদাদকে শ্বশ্মানে বানিয়েছে। লক্ষ লক্ষ মুসলমানকে হত্যা করেছে। বাগদাদ যে একসময় মুসলমান অঞ্চল ছিল, সে রকম কোন নিশানাও তারা রাখে নি! নামাজ আদায় কিংবা আযানের মত মৌলিক ঈবাদতও তারা বন্ধ করে দিয়েছিল।

www.pathagar.com

কিন্তু এমনতর দূর্ঘটনারও মাত্র চল্লিশ বৎসরের মধ্যে কেবল বাগদাদেই আবার ইসলামে ফিরেছে তাই নয়! বরং মুসলিম আর ইসলাম উচ্ছেদে আগত তাতার'রাই হল ইসলামের রক্ষক! এর অনুসারী। তারাই ভারতবর্ষে নিল ইসলামকে রাজনৈতিক ক্ষমতা আর কর্তৃত্বসহ। সম্রাট বাবর তাদেরই বংশধর!

কিন্তু কেন এমন হলো? কেউ কি বলতে পারেন তাতার সেনাপতিরা কোন মুসলিম সেনাপতির কাছে যুদ্ধে হেরে ইসলাম কবুল করেছে? কেউ কি ইতিহাসে এমন কোন প্রমাণ দেখাতে পারবেন? ইতিহাস স্বাক্ষী, তাতার'রা কোন মুসলিম বাহিনীর নিকটে নয়, পরাজিত হয়েছে কোমলমতি নারীর কাছে, মুসলিম মা'র কাছে। মুসলিম পরিবারই ছিল তাদের সেই যুদ্ধক্ষেত্র, যেখানে তারা পরাজিত হয়েছে! রূপান্তরিত হয়েছে বর্বর তাতার হতে এক একজন মুসলিম সৈনিক এ!

ইতিহাস ঘাঁটুন, দেখবেন বাগদাদ ধ্বংসকারী তাতার'রা মুসলিম নারীদের বন্দী করে নিয়েছে তাদের অন্দরমহলে। এদের ঔরসে জন্ম নেয়া তাতার সন্তানেরা বেড়ে উঠেছে মুসলিম মা'র সান্নিধ্যে। হোক না বন্দী নারী, কিন্তু সন্তানের জন্য তো তিনি 'মা'! সেই মা'র সান্নিধ্যে যে সন্তান বেড়ে উঠেছে মা'র আদর্শ, শিক্ষা আর চেতনাকে নিজের রক্তে, মন-মননে, চিন্তা-চেতনায় ধারণ করে, চল্লিশ বসর পরে তাদের হাত ধরেই ইসলাম আবার ফিরেছে বাগদাদে!

তার মানে হলো, মাঠে-ময়দানে, সমাজে ইসলাম পরাজিত হয়েও কেবলমাত্র ঘরের কোণে, অন্দরমহলে মা'র আঁচলের নীচে ইসলামের চর্চা থাকার কারণেই, সেখানে ইসলামের সাথে নবপ্রজন্মের পরিচয়ের কারণেই অর্ধশতাব্দীতেই আবার সে দাঁড়িয়েছে! উদ্ধার করেছে তার হারানো মর্যাদা আর অবস্থান!

এরই আলোকে আমাদের অবস্থাটা একটু বিচার করুন। চল্লিশ বসর নয়, চারশত বসর পার হয়ে গেলেও আমরা আমাদের হারানো অবস্থান উদ্ধার করতে পারলাম না! এর কারণ হলো, আমাদের সমাজ, আমাদের দেশ, সে তো অনেক বৃহৎ অঙ্গণ, এমনকি আমাদের ঘরের এই সীমিত পরিসরেও ইসলাম বেঁচে নেই।

আমাদের সন্তানেরা তাদের জন্ম লগ্নের সেই ক্ষুদ্র পরিসর, মা'র আঁচল, সেই জায়গাটুকুতেও ইসলামের সাথে পরিচিত হতে পারছে না। কারণ, আমাদের পারিবারিক পরিবেশে ইসলাম নেই, আমাদের স্ত্রী বা কন্যারা ইসলাম জানে না, তাদের কাছে ইসলাম সেরকমই অপরিচিত, যেরকম অপরিচিত ছিল মক্কার রুক্ষ

www.pathagar.com

মরুভূমিতে, যেরকম অপরিচিত অবস্থার কথা প্রিয় রাসুলুল্লাহ (সঃ) তার পবিত্র হাদিসে উল্লেখ করেছেন।

এ প্রেক্ষাপটে আজ যেটা প্রয়োজন, ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে পারিবারিক জীবন পর্যন্ত ইসলামের পূর্ণ অনুসরণ। এর কোন ব্যতয় মেনে নেবার সুযোগ নেই। অনেক 'পীরে কামেল' 'মুজাদ্দেদী জমান' 'হাদিয়ে মিল্লাত' 'কান্ডারী' 'ভান্ডারী'বাবাকে দেখি ইসলামের নামে চুটিয়ে ব্যবসা করছেন। গড়ে তুলছেন 'খানক্বাহ শরীফ'। এরা মুরীদদের ইসলাম শেখান!

অথচ তাদের জীবনে, তাদের পরিবারেই ইসলাম নেই, নেই এর কোন অনুশাসন। এতে ইসলামের কোন কল্যাণ নেই। কল্যাণ নেই মুসলমানেরও। তবে হ্যাঁ মুসলমানদের জিল্লতি বাড়ে! বাড়ে পীর সাহেবের চেহারার রোশনাই'ও! আরও বাড়ে বিত্তের ঠমক, জৌলুস আর পকেটের ওজনও!

আজ সারা বিশ্ব জুড়ে ইসলাম আর মুসলমানদের যে অবমাননাকর জিল্লতি, সে জিল্লতি হতে পরিত্রাণের উপায় কি? মুসলিম সমাজের অনেকেই বিভিন্নরকম সমাধান বের করেছেন, তা অনুসরণের প্রচেষ্টাও চলছে। সমাধান একটাই, সবার আগে নিজ নিজ পরিবারে ইসলামের চর্চা শুরু করতে হবে।

একটি দেশ বা সমাজকে ইসলামি দেশ বা সমাজ বানানোর স্বপ্ন অনেক পরের কথা, সবার আগে আমাদের প্রত্যেকটি পরিবারকে ইসলামি পরিবার বানাতে হবে। আমাদের পরিবারের প্রত্যেকটি সদস্য, সদস্যার সাথে ইসলামের পরিচয় হতে হবে গভীর ও নিবিড়ভাবে।

ইসলাম বিশ্বের যেখানেই অপরিচিত থাকুক, আমাদের পরিবারে কারো কাছেই ইসলাম অপরিচিত থাকবে না। ইসলামের কোন জ্ঞান, কোন বিধান আর কোন নির্দেশের সাথেই আমাদের পরিবার অপরিচিত, অজানা থাকবে না। এই নিবিড় আর গভীর জানাজানির মধ্যেই রয়েছে মুক্তির পথ। তাই এখন সময়টা হলো জানাজানির! ইসলামকে সত্যিকারভাবে জানার সময় এটা। কিন্তু হায় আমরা মুসলমানরা এ উদ্যোগ নেইনি, নিচ্ছিও না।

একজন নও মুসলিম ফারিহা ঠিকই বুঝেছেন সমস্যাটা কোথায়? তাই তিনি কারও আশায় বসে থাকেন নি, নিজেই নেমেছেন মাঠে। নিজের সীমিত সামর্থ নিয়ে, একেবারে 'নিজের মত' করে নেমে পড়েছেন মাঠে।

www.pathagar.com

তার সাথে আলাপে জেনেছি, তিনি যে সমাজের সদস্যা হয়েছেন, সেই মুসলিম সমাজের প্রতি তাঁরও যে একটা দায়িত্ব আছে, সে কথাটা মাত্র কয়েকদিনেই উপলব্ধি করেছেন! আর তা পালনেই স্কটল্যান্ডে একটি সংস্থাও প্রতিষ্ঠা করেছেন, যার নাম হলো 'আমিনা'।

সংস্থাটি একটি চ্যারিটি সংস্থা। মুসলমান মহিলাদের উন্নয়ন এবং মূল ব্রিটিশ সমাজের সাথে তাঁদের জানাজানি, উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যোগাযোগ, সহযোগিতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে কাজ করে যাচ্ছে। এসাইলুম সিকার, মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে বিপদাপন্না নারীদের আইনি, বৈষয়িক এবং নৈতিক সহযোগিতার সাথে সাথে সংগঠনটি বর্ণবাদ, ধর্মবিদ্বেষ মোকাবেলাতেও ভুমিকা রাখছে। কঠোর আত্মমর্যাদা বোধসম্পন্না নওমুসলিম ফারিহা'র ভাষায়;

'রাস্তায় একজন হিজাব পরিহিতা মুসলমান নারীকে, আমাকে কটুক্তি করে পার পেয়ে যাবে! তা হবে না! এটা কি আমার দেশ নয়? আমি কি এই দেশে জন্মাইনি? এ দেশে কি আমি উড়ে এসে বসেছি যে, তাদের দেখে ভয় করে চলব?'

আত্মপ্রত্যয়ী ফারিহা একটা পত্রিকাও প্রকাশ করছেন, নাম দিয়েছেন 'নিউ ভয়েস'। তার এই ' নিউ ভয়েস' এর একটা কপি ডাক যোগে পাঠিয়েছিলেন আমাকে। ঐ পত্রিকা পড়েই জানলাম তাঁকে আরও বেশী! তিনি সেদিন সাক্ষাতে নিজের যে পরিচয় তুলে ধরেন নি, সেই পরিচয়ই পেলাম তার পত্রিকার মাধ্যমে। এর পর থেকেই তার প্রতি মনটা শ্রদ্ধা আর ভক্তিতে ভরে গেছে!

এর পাশাপাশি আমাদের মুসলিম সমাজের দু:খজনক নিস্পৃহতা দেখে নিজের কাছে নিজেই লজ্জা আর ক্ষোভে কুঁকড়ে থাকি! বৃহত্তর মুসলিম সমাজের কথা বাদ, ব্রিটেনের তিরিশ লক্ষ মুসলমানের মধ্যে পাঁচ লাখেরও বেশী বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত মুসলমানের নিস্পৃহতা দেখে কষ্ট চেপে রাখা সত্যিই কঠিন।

ব্রিটেনে যত বাংলাদেশী ছাত্র ও পেশাজীবি আছেন, সম্ভবত পৃথিবীর আর কোথাও একত্রে এত বাংলাদেশী ছাত্র ও পেশাজীবির সমাবেশ ঘটেনি। এরা এখানে নিজেদের শক্ত অবস্থান গড়েছেন। ব্যবসা বাণিজ্যের পাশাপাশি অফিসে আদালতেও বাংলাদেশী পেশাজীবিদের দৃঢ় পদচারণা।

এদের অনেকেই ব্রিটিশ রাজনীতির সাথে জড়িয়েছেন। এদের মধ্য হতেই রয়েছে প্রথম ব্রিটিশ বাংলাদেশী হাইকমিশনার। লোকাল গভর্মেন্টে বাংলাদেশী মেয়র, কমিশনার আছেন, আছেন এমপি'ও। তাছাড়া অনেকে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়সহ এবং

www.pathagar.com

অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সম্মানজনক অবস্থানে নিজেদের শক্ত ভীত গড়ে নিয়েছেন। অনেকেতো স্থানীয় সংস্কৃতি, কৃষ্টি কালচারেও প্রভাব রাখছেন, সেটাও বেশ লক্ষণীয়। কিন্তু এত কিছুর পরেও আমরা আমাদের আদর্শ, বিশ্বাস, কৃষ্টি কালচারের জন্য কি করলাম? কতটুকু ভূমিকা রাখলাম, রাখতে পারলাম? উত্তরটা সন্দেহাতীতভাবে নেতীবাচকই বটে!

আমাদের মুসলিম সমাজে নারী-পুরুষ, তরুণ-তরুণী, যুবক-যুবতীদের সমস্যাগুলো আমরা অবহিত নই? তাদের মধ্যে অশিক্ষা, অজ্ঞতা আছে, তাদের জীবন ড্রাগ্‌সের ছোবলে বিপর্যস্থ, সেসব জানি না? আমাদের ভাই-ব্রাদার, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবরা বেকারত্বের অভিশাপে পর্যুদস্থ, এসবও অজানা? সমাজে স্বামীর হাতে স্ত্রী, ভাই এর হাতে বোন, ছেলের হাতে মা-বাবা নিগৃহীত হচ্ছে, জানার পরেও কোন দায়িত্ববোধ অনুভব করলাম না! সমাধানের কোন পথও খুঁজলাম না! কেউ উদ্যোগ নিলেও তাতে সাড়া দিলাম না।

আমাদের সন্তানরা বাইরে গিয়েই অসামাজিক কর্মকাণ্ডে জড়াচ্ছে, খবরের কাগজে লজ্জাজনক শিরোণাম হচ্ছে। তবুও তাদের পথ দেখানো, তাদের মন-মননের খোরাক জোগানোর চিন্তা আমাদের নেই! আমরা বোধ হয় জানি-ই না যে,তারা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে! আমরা ভালো-মন্দটুকুও ভুলেছি! আমাদের নেতারাও কোন পদক্ষেপ নিলেন না! অথচ যখন দেখি সম্পূর্ণ বিপরীত আদর্শ হতে আসা নওমুসলিম ফারিহা সীমিত সামর্থ নিয়ে একাই মাঠে নেমেছেন! তখন আমরা লজ্জা পাই!

চার

লজ্জা পাই আমাদের নিস্পৃহতা, অজ্ঞতা, অকর্মণ্যতা আর অলসতা দেখে! প্রশ্ন জাগে, নও মুসলিম ফারিহার মত করে কি আমরা, মুসলমানরা, ইসলামের মানবিক ও সামাজিক দিকটাকে বুঝেছি? এখনও আমাদের আশে পাশের মানুষের মানবেতর দুর্দশা চোখে দেখেও কোন অনুভূতিই নেই মনে। আমাদের হৃদয়ে যেন কোন দাগই কাটে না, আমরা যেন সব অনুভূতিহীন এক একটা রোবট!

জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিস্ময়কর অগ্রগতি যেন মানবতার বিপর্যয় ঘটিয়েছে, মানবিক চেতনা যেন মরে গেছে! অথচ মানব সভ্যতার এই বিস্ময়কর উত্থান আর অগ্রগতির মূল কার্যকরণও কিন্তু জ্ঞান-বিজ্ঞানের গগণচুম্বী উৎকর্ষতাই!

www.pathagar.com

মহাকাশ বিজ্ঞানের উন্নতির কারণে মানুষ সুদুর মঙ্গলগ্রহের খোঁজ রাখছে, সেখানেও কর্মকান্ড চালাচ্ছে। তারা চাঁদেও গেছে, আজ নজর মঙ্গলগ্রহের দিকে। রসায়ন বিজ্ঞানের কারণে আনবিক, নাপাম'সহ আরও কত ধরনের বোমা বানিয়েছে! দুরারোগ্য ব্যাধির ঔষধ তৈরী হয়েছে। প্রকৌশল, তড়িৎ, পদার্থ বিজ্ঞানে উৎকর্ষতার কারণে নানা যন্ত্রপাতি, রাস্তা-ঘাট-পুল-ব্রীজ-কালভার্ট নির্মিত হয়েছে, সহজ হয়েছে মানুষের জীবন। জয় করেছে হিমালয়, আটলান্টিকের গভীরে নেমে সাগর সেঁচে এনেছে মানিক!

পানি বিজ্ঞান, মৃত্তিকা বিজ্ঞান, উদ্ভিদ বিজ্ঞান আর কৃষি বিজ্ঞানে অভাবনীয় উন্নতির কারণে বন্যা, খরা নিয়ন্ত্রণ, সেচকার্য পরিচালনা, অল্প সময়ে বেশী ফসল উৎপাদন, রোগ-বালাই, পোকা-মাকড় নিয়ন্ত্রণ, ফসল কাটা, মাড়াই সবকিছুই সহজ হয়েছে, সরবরাহ ব্যবস্থারও উন্নতি হয়েছে।

কিন্তু তারপরেও বিশ্বে যে কোন সময়ের চেয়ে দুর্ভিক্ষ বেশী, অনাহারী লোকের সংখ্যা বেশী! বিশ্বে প্রতি দিন পঁয়ত্রিশ হাজার শিশু অনাহারে মরছে। বিশ্বের শতকরা চল্লিশ জন মানুষ পুষ্টিহীনতায় ভূগছে! হানাহানী, সংঘাত, দ্বন্দ বেড়েই চলেছে! বাস্তুহারা রিফিউজির সংখ্যাও বিশ্বে যে কোন সময়ের চেয়ে বেশী, বিনা চিকিৎসায় মৃতের সংখ্যা ইতিহাসে সর্বকালের রেকর্ড ভেঙ্গেছে! ফলে এই আধুনিক যুগেও কোথায়ও কোথায়ও মানুষের গড় আয়ু বাড়ার পরিবর্তে ক্রমেই কমছে।

অতি সম্প্রতি প্রকাশিত পরিসংখ্যানে বলা হয়েছে, পূর্ব আফ্রিকান দেশসমুহে ১৯৮৬ সালে মানুষের গড় আয়ু ছিল ৫৭ বসর, আজ ১৫ বসরের ব্যবধানে ২০০০ সালে সেই মানুষেরই গড় আয়ু মাত্র ৪৭ বৎসর! এ এক আতংকজনক বিপর্যয়! রোগ-শোক-ক্ষুধা-জ্বরায় মানুষ তীলে তীলে মরছে! অথচ বিশ্বের মানবতাবাদী, প্রগতিবাদী গোষ্ঠির সেদিকে কোনই খেয়াল নেই।

মানবাধিকার, সাম্য, মৈত্রী, ভাতৃত্ববোধ এসব নাকি বিশ্বে যে কোন সময়ের চেয়ে বেশীমাত্রায় প্রতিষ্ঠিত! তারপরেও কি অবাক কান্ড, শোষণ-বঞ্চনা-জুলুম নিয়ন্ত্রণহীন ভাবে বাড়ছে। জ্ঞান বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রা, মানবাধিকারের উন্নয়ন এইসব বহুকাংক্ষিত বিষয়গুলোর তথাকথিত বিকাশের ফলে ছয়শত কোটি মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদের আশি ভাগই কুক্ষিগত হয়েছে কুড়ি ভাগ লোকের হাতে! অর্থাৎ বিশ্বে জ্ঞান বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রা, উন্নয়ন সম্পদের বন্টনকে অসম করে শোষণের পথকে সুগম করেছে।

www.pathagar.com

ধন-সম্পদ, বিত্ত-বৈভব-প্রাচুর্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান আর দক্ষতার শীর্ষে অবস্থানকারী দেশ সুপার পাওয়ার আমেরিকায় লক্ষ লক্ষ লোক মানবেতর অবস্থায় রাস্তার ফুটপাতে, ষ্টেশনের প্লাটফরমে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস অনিশ্চিত জীবন যাপন করতে বাধ্য হচ্ছে! তাদের থাকার কোন জায়গা নেই, বাড়ী-ঘর নেই! অপরাধ সংঘটনের পরিসংখ্যানে বিশ্বতালিকার শীর্ষে অবস্থানের কথা না হয় বাদই দিলাম!

ভারত নাকি আগামি দিনের সুপার পাওয়ার। সেই ভারতে ষাট ভাগেরও বেশী মানুষ বিশুদ্ধ পানি পায় না পান করতে! কোটি কোটি মানুষ দারিদ্রসীমার নীচে, সম্পদের বৈষম্য রকেটের গতিতে বাড়ছেই, বিশ্বের সর্বাধিক নারী নির্যাতনের দেশগুলোর মধ্যে ভারত সবার শীর্ষে। শিল্প, প্রযুক্তিতে অভাবনীয় উন্নয়ন সত্তেও সেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের জীবন চরম অশান্তিময় হয়ে উঠছে প্রতিদিনই। কিছুদিনের মধ্যে ভারত নাকি বিশ্বের সর্বাধিক কোটিপতির দেশ হতে যাচ্ছে। তাতে গরীব-নিঃস্ব ভারতীয়দের কোন লাভটুকু হবে?

তারাতো তখনও আজকের মতই সূদে রুপী ঋণ নিয়ে ডাক্তারকে ফিস দিয়ে নিজেদের হাত-পা কাটাবে, আর কোন রাস্তার পাশে চট বিছিয়ে বসবে পঙ্গু হিসেবে ভিক্ষার জন্য! স্বামীহারা অসহায় বিধবারা বুড়োবয়সে একটু আশ্রয়ের আশায় উঠবে গয়া, কাশী, বৃন্দাবন, মথুরা'র মন্দিরে মন্দিরে, থাকবে অনাহারে, অনিদ্রায়, বিনা চিকিৎসায়। এইসব কোটিপতিরা কোনদিনও ঘুরে তাকাবে না এদের দিকে।

সেদিনও ভারতীয়রা আজকের মতই কোটি কোটি শিশুকে জন্মের পূর্বেই হত্যা করবে অভাবের তাড়নায়। আজও যেমন বিহার, উত্তর প্রদেশে কন্যা সন্তান জন্মের সাথে সাথেই পিতা সন্তানটির মা'র মাথার এক গোছা চুল কেটে সেই চুলকেই কন্যাটির গলায় ফাঁস বানাবে! জন্মমুহূর্তেই জীবনের পাঠ চুকোবে জন্মদাতা পিতা!! কন্যা হয়ে জন্মানোটাই তার অপরাধ! সেদিনও এমনি করেই এই জঘণ্য, অমানবিক, নিষ্ঠুরতা চলবে 'মানবতাবাদ' রপ্তানীকারক দেশ ভারত, আগামি বিশ্বের সুপার পাওয়ার ভারতে!

পুরো ইউরোপ, এমনকি এই ব্রিটেনেও একই অবস্থা। বাংলাদেশের চেয়ে ব্রিটেনে মাথাপিছু গড় আয় সত্তর গুণ বেশী। তারপরেও ব্রিটেনের কয়েক লক্ষ লোক গৃহহীন! ৩৮ লক্ষ শিশু চরম দারিদ্রতার মধ্যে। এমন হাজার হাজার পরিবার আছে, যারা দিনে মাত্র তিন পাউন্ডের সামান্য কিছু বেশী আয় দিয়ে দিন কাটায়! এমন কথা বিশ্বাস না হলেও এটাই কঠিন বাস্তবতা বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনৈতিক শক্তি রাষ্ট্র ব্রিটেনে!

www.pathagar.com

একই অবস্থা পুরো বিশ্বের অন্যান্য দেশ সমুহেও। কম্বোডিয়া, ভিয়েতনাম'সহ আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে সন্তানের বাবা-মা সন্তানকে বিক্রি করে দিচ্ছে অভাবের তাড়নায়। পূর্ব ইউরোপের কয়েকটি দেশ, প্রাচ্যের ফিলিপিনস এবং ল্যাটিন আমেরিকার দেশসমুহ তাদের তরুণী, যুবতীদের আন্তর্জাতিক বাজারে চড়া মুল্যে বিক্রি করে দিচ্ছে! এসবই প্রমাণ করে যে, জ্ঞান, বিজ্ঞান মানুষের প্রত্যাশিত কল্যাণ সাধনে ব্যর্থ হয়েছে।

বিজ্ঞান যে ইথারকে ভিত্তি করে রেডিও, টিভি বানিয়েছে, তাতে তো সারাক্ষণ মাইকেল জেকসন রুবী উইলিয়ামস'সহ নানান দেশের, নানান ভাঁষার শিল্পীদের কণ্ঠে পপ, রক ভেঁসে বেড়াচ্ছে। ঐ একই ইথারে ফুটপাতে ক্ষুধার জ্বালায় কান্নারত মানুষের বিলাপকে তুলে ধরবে কে? গরীবের হাতে নয়, টিভি, রেডিও থাকে ধনী, সম্পদশালী, বিজ্ঞানময় জ্ঞানী-গুণীদের হাতে! অতএব ঐসব যন্ত্রে থাকে তাদের চিত্তকে প্রশান্তি দিতে রক, পপ কিংবা হলিউড, বলিউডের প্রোডাক্ট!

সেসব পোডাক্টই আমাদের চিত্তকে করে প্রশান্ত! 'ওঁম শান্তি' বলে চোখ মুদে ডুবে দেই মেকী জগতে। কিন্তু যাদের বিবেকে এখনও মরেনি, তাদের বিবেককে বিশ্বের দুরাবস্থা ঠিকই নাড়া দেয়। ভাবায়। তাড়িত করে। এক সাংবাদিককে এতটাই তাড়িত করেছিল যে, তিনি এবিশ্বে আর বাঁচতেই চান নি, একটা দিনের জন্যও নয়। ক্ষুধায় কাতর এক শিশুর দুরাবস্থা দেখে এতটাই বেদনাহত হয়েছিলেন যে, তিনি শেষ পর্যন্ত ডিপ্রেশনে আক্রান্ত হয়ে আত্মহত্যাই করেছেন।

১৯৯৬ সালের সুদানে দূর্ভিক্ষে যত্রতত্র মানুষের লাশ। বিশ্ব সংবাদ মাধ্যমসমুহে শিরোনাম হয়েছিল সে ঘটনা। সারা বিশ্বের মিডিয়ার লোকজন, ফটোগ্রাফার, সাংবাদিকরা ছুটেছিলেন সে খবর সংগ্রহে। গিয়েছিলেন ফটোসাংবাদিক কেভিন কার্টার নিজেও। অনেক ছবি, খবর সংগ্রহ করেছিলেন দূর্ভিক্ষ কবলিত মানুষের। তার একটা ছবি সারা বিশ্বকেই কাঁপিয়েছিল। এক কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত জাতিসংঘের খাদ্য বিতরণ কেন্দ্রের দিকে হামাগুড়ি দিয়ে এগুচ্ছে ক্ষুধায়, অপুষ্টিতে কংকালসার শিশু, একা! পেছনেই অধীর আগ্রহে অপেক্ষমান একটি শকুন! কখন শিশুটি মরবে! মরলেই তাকে খেতে পারে!

এই একটি মাত্র ছবিই তার জীবন বদলে দিয়েছে। তার এই ছবিটি ১৯৯৬ সালে 'পূলিৎজার পুরস্কার' লাভ করেছিল। কিন্তু কেভিন কার্টার ঐ পুরস্কারে আনন্দিত হতে পারেন নি, বরং তিনি আক্রান্ত হয়েছিলেন ডিপ্রেশনে। আর তিন মাসের মধ্যেই আত্মহত্যা করেন। মৃত্যুর পরে পাওয়া তার ডাইরিতে লেখা ছিল;

www.pathagar.com

Dear God, I promise I will never waste my food no matter how bad it can taste and how full I may be. I pray that he will protect this little boy, guide and deliver him away from his misery. I pray that we will be more sensitive towards the world around us and not be blinded by our own selfish nature and interests.

ভাবানুবাদঃ ইশ্বর, প্রতিজ্ঞা করছি, খাবার যতই বাসী পচা হোক, যতই বেস্বাদ ঠেকুক, তা কখনই নষ্ট করব না। প্রার্থনা করি, তিনি (ইশ্বর) ছোট্ট শিশুটিকে রক্ষা করবেন, তাকে তার এই কষ্ট আর দূর্দশা থেকে মুক্তির পথ দেখাবেন। আশা ও প্রার্থনা করি, আমরা নিজেদের ব্যক্তিস্বার্থ ও আত্মকেন্দ্রিকতাকে উপেক্ষা করে আমাদের চারপাশের বিশ্বের প্রতি আরও একটু সহানুভূতিশীল, আরও একটু মনযোগী হব।

কেভিন কার্টারের ছবিটি তোলা, পুলিৎজার পুরষ্কার পাওয়া এবং তার আত্মহত্যার পর যুগ পেরিয়েছে ইতিমধ্যেই। কিন্তু পরিস্থিতি বদলায়নি। বরং হয়েছে চরম অবনতি। বিশ্ব আরও নেমে গেছে মানবিক বিপর্যয়ের ধারায়। ধনী হয়েছে আরও ধনী, আর নিঃস্বের কাতারে বেড়েছে আরও কোটি কোটি মানুষ! সম্পদ ক্রমাগতই কুক্ষিগত হয়েছে ব্যক্তি ও গোষ্ঠিবিশেষের কাছে।

তৃতিয় বিশ্বের ৬০টি দরিদ্র দেশের সম্মিলিত সকল জনগোষ্ঠির হাতে যত সম্পদ আছে, তার চেয়েও বেশী সম্পদ আছে আমেরিকার মাত্র তিনজন শীর্ষ ধনীর হাতে! আমেরিকার জনসংখ্যা বিশ্ব জনসংখ্যার মাত্র ৪ শতাংশ অথচ বিশ্বের মোট সম্পদের ২৫ ভাগেরও বেশী তাদের হাতেই।

সম্পদের এই ব্যাপক পুঞ্জিভূতাবস্থাই আজকের বিশ্বে সাধারণ মানুষের দু:খ, কষ্ট আর সীমাহীন যন্ত্রণার কারণ। এত প্রাচুর্যের দেশ খোদ আমেরিকাও এর বীষময় ফল থেকে নিস্তার পায় নি, তার প্রমাণ, স্বপ্নের দেশ আমেরিকাতেও প্রায় এক কোটি পচিশ লক্ষ শিশু তাদের প্রতিদিনের প্রয়োজনীয় খাবার পায় না খেতে এবং তা একমাত্র দারিদ্রতার কারণেই!

অবিশ্বাস্য কথাটা প্রখ্যত সাংবাদিক মাইকেল মুর 'স্টুপিড হোয়াইট ম্যান' নামক তার বেষ্ট সেলার বইটিতে নির্দ্বিধায় লিখেছেন। খোদ আমেরিকাতেই যদি এই অবস্থা, তাহলে বিশ্বের অন্যান্য স্থানে কি অবস্থা, সেটা সহজেই বোধগম্য। এইসব দু:স্থ মানুষের দিকে তাকানোর কেউ নেই। এদের দু:খ কষ্ট নিয়ে রাজনীতি হচ্ছে অহরহ,

www.pathagar.com

তাদের উন্নয়নের কথা বলে একটি বিশেষ গোষ্ঠির স্বার্থ সংরক্ষণ হলেও এদের অবস্থার কোন পরিবর্ত নেই বরং প্রতিদিনই তাদের সংখ্যা বেড়েই চলেছে অপ্রতিরোধ্যভাবে!

বিশ্বনেতৃবৃন্দ যে যাই বলুন না কেন, বাস্তবতা হলো, এই বিশ্ব মাত্র একটি বৎসরে অস্ত্র উৎপাদন ও ক্রয়ের পেছনে খরচ করে ৫৬১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার! আর এর বিপরীতে দরিদ্র, ক্ষুধার্ত মানুষের ক্ষুন্নীবৃত্তির পেছনে সাহায্য দেয় এর আঠারো ভাগের এক ভাগ মাত্র, শতকরা হিসেবে মাত্র ৫.৭ ভাগ, যার পরিমান হলো মাত্র ৩২ বিলিয়ন ডলার!

আর তারও আবার অর্ধেকেরও বেশী ব্যয় হয় তথাকথিত 'প্রশাসনিক ও বাস্তবায়ন' কাজে! তার মানে উক্ত ৩২ বিলিয়ন ডলারের অর্ধেক, ১৬ বিলিয়ন ডলারও প্রকৃত অভাবী মানুষের হাতে পৌছায় না!

আধুনিক বিশ্বে, একবিংশ শতাব্দীতেও পৃথিবীর এক পঞ্চমাংশ মানুষ, একশত কুড়ি কোটি মানুষ বিশুদ্ধ পানি পায় না পান করতে! অথচ এক আমেরিকা তার 'স্টার ওয়ার্স' নামের নিরাপত্তা খাতে যে পরিমান খরচ করে, তার মাত্র সিকিভাগ খরচ করলেই এই সোয়াশো কোটি মানুষ সারা জীবন ধরে বিশুদ্ধ পানি পান করতে পারে। পানিবাহিত রোগে মৃত্যুর হারও উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যেত।

অঢেল তেল সম্পদের কারণে আরব বিশ্ব অকল্পনীয় বিত্ত-বৈভবের মালিক হলেও তাদের চেতনাতে জাগেনি প্রকৃত মানবতাবোধ। তেল বিক্রির অঢেল টাকায় সমুদ্রে কৃত্রিম দ্বীপ বানিয়ে চলেছে বিলাসি অবসর কাটানোর আয়োজন! ঐ একটি দ্বীপ বানাবার অর্থ দিয়েই এইড্‌স্ এ এতিম হওয়া আফ্রিকা মহাদেশের সকল শিশুকে পূনর্বাসিত করা যেত! কিন্তু সেদিকে কোন ধনুকবেরের খেয়াল নেই।

প্রতি বসর 'জি এইট' কিংবা 'জি সি সি' শীর্ষ সম্মেলনের নামে চোখ ধাঁধাঁনো সব বৈঠকের আয়োজন প্রকৃত দরিদ্র মানুষের কোন কাজেই আসছে না। এইসব রাজনীতিবিদ, বিশ্ব নেতৃবৃন্দ ব্যর্থ হয়েছেন। ব্যর্থ হয়েছে রাষ্ট্রও! বিশ্বের সামষ্টিক ব্যর্থতা মানবতার জন্য লজ্জাজনক। সামিগ্রকভাবে এবং সামষ্টিকভাবে মানুষ এতটা অমানবিক হয়ে যাবে, সেটা কোন কালেই কেউ কল্পনাও করেনি।

ব্যর্থতার এই দায়ভার ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষ সকলের। এর সূচনা কিন্তু হয়েছে ব্যক্তিগত পর্যায়ে। ব্যক্তির চিন্তা, চেতনা থেকে মানবিক মুল্যবোধের নিরন্তর অবক্ষয়ই আজ তাকে এই পর্যায়ে নামিয়েছে। মানুষ আজ আত্মকেন্দ্রিক এবং মহামারীর মত মানব

www.pathagar.com

সভ্যতার প্রতিটি সদস্যকেই গ্রাস করেছে। আমি, আপনি, আমরা কেউই এই রোগ থেকে মুক্ত নই। আমরা সবাই আত্মকেন্দ্রিকতার জিঞ্জিরে বাঁধা।

এক হতাশাজনক অবস্থায় যখন বুকের পাঁজর ভেঙ্গে আসে ঠিক তখনই আবার আশাও জাগে। আশা জাগে, যখন দেখি, চরম আত্মকেন্দ্রীকতার যুগেও কেউ কেউ অতি ক্ষুদ্র অংগণে হলেও এগিয়ে আসছেন মানবতার এই কলংকজনক অবস্থানকে কিছুটা হলেও বদলে দিতে!

আশা জাগে যখন দেখি, এখনও আমাদের মধ্যে কিছু লোক আছেন, যাঁরা নিজেদের সকল সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও সমাজের অভাবী জনগোষ্ঠি, দুঃস্থ, বঞ্চিত জনগণকে নিয়ে ভাবেন! তাদের ভাবনাকে মনের নিভৃতে গহীনে বেঁধে রাখেন না, বরং তা বাস্তবায়নে একরকম খালি হাত পা নিয়েই মাঠে নামেন। বর্তমান যান্ত্রিক, বস্তুবাদী যুগের এই ক্রান্তিলগ্নে এ এক চরম সাহসী পদক্ষেপ!

স্কটল্যান্ডে নওমুসলিম ফারিহার তৈরী সংগঠন 'আমিনা' এরকমই একটা। যদিও সীমিত পরিসরে, যদিও তার বৈশ্বিক মান নেই। তাতে কি? তিনি একজন নওমসুলিম হয়েও যে সমস্যা ও তার প্রতিকারে করণীয় সন্মন্ধে সচেতন, একান্তই একক উদ্যোগ, উদ্যম আর প্রচেষ্টায় একটা সংগঠন করেছেন, পত্রিকা প্রকাশ করে নিজের সময়, মেধা শ্রম দিয়ে তা পরিচালনা করে চলেছেন সেটাই মূখ্য।

পাঁচ

এরকম আশা জাগানিয়া সাহসী আরও একটা ঘটনা দেখলাম কিছুদিন আগে ২১ শে জুলাই, ২০০৭ এ। পুর্ব লন্ডনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে। আমারও উপস্থিত থাকার সৌভাগ্য হয়েছিল। প্রায় শতাধিক সূধীজন, প্রিন্ট-ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার সংবাদিক, ক্যামেরাম্যানদের উপস্থিতিতে আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মপ্রকাশ করল Global Aid Trust নামের একটি চ্যারিটি প্রতিষ্ঠান।

ব্রিটেন প্রবাসী মোট এগারো জন বাংলাদেশী শিক্ষাবীদ, বুদ্ধিজীবি ও পেশাজীবিদের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা এই চ্যারিটি সংস্থাটি পুরো মাত্রায় বাংলাদেশীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হলেও এর রয়েছে বৃহত্তর পরিসরে লক্ষ্যমাত্রা, সূচনাতেই উদ্যোক্তারা বিষয়টি পরিষ্কার করেছেন। বলেছেন, ব্রিটেন এবং বাংলাদেশসহ বিশ্বের যে কোন স্থানের যে কোন দুঃস্থ, দরিদ্র মানুষের পাশে দাঁড়াবেন তাঁরা। লক্ষ্যমাত্রার এই

www.pathagar.com

বহুমাত্রিকতা কারণেই তাদের কোন সমস্যাই হয়নি ব্রিটিশ সরকারের রেজিষ্ট্রেশন পেতে।

'Working for a better globe' শ্লোগাণকে পুঁজি করে শিক্ষা বিস্তার, নারী শিক্ষা, নারীর ক্ষমতায়ন, এতিমদের শিক্ষা, স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি পূনর্বাসনকে প্রাধান্য দিয়েছেন। ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষ সকল শ্রেণীর মানুষের জন্য এ সংগঠন, এমনটাই দাবী। আমাদের দেশে, বিদেশে অনেক ছোট বড় সাহায্য সংস্থা আছে, কিন্তু GAT 'গ্যাট'কেই প্রথম দেখলাম, যাঁরা মানবতার সকল সমস্যার উৎসমূল 'অশিক্ষা' দুর করতে শিক্ষা বিস্তার (নারী শিক্ষা'সহ)টাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। একটা ইতিবাচক দিকই বটে।

এটাই বর্তমান মুসলিম সমাজে দরকার। ঘরের মূল নিয়ন্ত্রণ যাঁর হাতে, যাঁর হাতে থাকে আগামী দিনের বংশধরদের শিক্ষা-দীক্ষার ভার, সেই মা'কেই আগে শিক্ষিত করতে হবে সুশিক্ষায়। তিনিই গড়ে তুলবেন সেই প্রজন্ম, যে প্রজন্ম একদিন বিশ্বকে জানাবে ইসলামের সুমহান আদর্শ নিজেদের আচার-আচরণ, কথা আর কাজ-কর্মে।

বিশ্বকে ইসলাম জানাতে হবে, জানাতে হবে বাস্তব ইন্টার‍্যাকশনের মাধ্যমে। বিশ্বের অমুসলিমদেরকে ওয়াজ মাহফিলে টেনে আনাটা সম্ভব নয়। তাদেরকে দৈনন্দিন জীবনে, কথা বার্তায়, আচার আচরণে যুক্তি আর তথ্যের মাধ্যমে ইসলাম জানিয়ে দিতে হবে। পরিচিত করে তুলতে হবে ইসলামের সাথে।

ইতিমধ্যেই পরিচয়ের সেই ধারাটি শুরুও হয়েছে। সারা বিশ্ব ব্যাপি, বিশেষ করে, উন্নত বিশ্ব বলে পরিচিত ইউরোপ আর আমেরিকার প্রায় প্রতিটি অংগণে অমুসলিম নারী পুরুষ ইসলামকে জানতে উদগ্রীব! দু:খজনকভাবে হলেও সত্য এই জানানোর কাজে মুসলমানরা খুব কমই সম্পৃক্ত। বরং অমুসলিম যাঁরা ইসলাম জানছেন, তাঁরা তা জানছেন নিজ উদ্যোগে, নিজ গরজে।

ইসলাম বিশ্বে সবচেয়ে আলোচিত, সমালোচিত একটা দর্শনে পরিণত হয়েছে। কেউ এর পক্ষে, কেউবা বিপক্ষে বলছে। কিন্তু বলছে। মানুষ যখন কথা বলছে তখন ইসলাম নিয়েই বলছে। মানুষ যখন কথা শুনছে, তখন ইসলাম নিয়েই শুনছে। ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় শুনছে। বুদ্ধিজীবি, লেখক'রা যখন লিখছেন ইসলাম নিয়েই লিখছেন। পক্ষে বা বিপক্ষে লিখছেন। তবে লিখছেন।

আজকের বিশ্বে সবচেয়ে শক্তিশালী যোগাযোগ মাধ্যম ইন্টারনেটে চোখ বুলান, দেখবেন সেখানেও কেবলই ইসলাম নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। বিশ্বের সাধারণ মানুষ

www.pathagar.com

থেকে অসাধারণ মানুষ, খ্যাত থেকে অখ্যাত, সকলেই ইসলাম নিয়ে কিছু বলছেন, কিছু শুনছেন, কিছু ভাবছেন।

এমনকি জাতিসংঘও জড়িয়ে পড়েছে। মাত্র ক'দিন আগে জাতিসংঘের অঙ্গ সংগঠন ইউনেস্কো ২০০৭ সালকে আন্তর্জাতিক 'রুমী বর্ষ' হিসেবে ঘোষণা করেছে এবং বসরব্যাপি বিশ্বময় প্রখ্যাত সূফীসাধক জালালউদ্দীন রুমীর শিক্ষা, জীবন ও দর্শন নিয়ে বিশেষ অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করেছে। তার রচনা নিয়ে বিশেষ প্রকাশনা ছেপেছে। তাঁকে নিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে আয়োজন করেছে আলোচনানুষ্ঠানের!

বিশ্ববাসীকে সচেতন করা হবে মাওলানা রুমীর মানবতাবোধ, ভাতৃত্ব ও ভালবাসার ভাবধারায় উজ্জীবিত হবার জন্য, যেন বিশ্বের বর্তমান হানাহানী, দ্বন্দ, সংঘাতের বদলে তদস্থলে মানুষে মানুষে সহমর্মীতা, সহাবস্থান এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধা বাড়ে। বিশ্বে যেন শান্তি আসে, বিশ্বটা যেন শান্তিময় হয়ে ওঠে!!

ইউনেস্কো কর্তৃক এমন একটি সময়ে মাওলানা রুমীর দর্শন আর শিক্ষা নিয়ে এই বৈশ্বিক আয়োজন করা হলো, যখন দু:খজনকভাবে সেই রুমীরই জন্মস্থান আফগানিস্থান, তার কর্মস্থল ও শিক্ষা কেন্দ্র ইরাকের জনজীবন বিপর্যস্থ করে দেয়া হচ্ছে! যে ভালাবাসা, সহমর্মীতা আর পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের বাণী আহরিত করতে চায় তার জীবন থেকে ইউনেস্কো, সেই ভালাবাসার মানুষটিরই অধস্তন বংশধরদের জীবনে বরবাদী আর ধ্বংস দিয়ে ভরে দিয়েছে তারা!

যে বিশ্বকে রুমীর ভালবাসা, সহমর্মীতা আর ভাতৃত্ব শেখাতে এ আয়োজন, সেই রুমীর দেশবাসীকে বিশ্বমোড়লরা কি ধরনের ভালাবাসা, ভাতৃত্ব ও সহমর্মীতার উদাহারণ দেখালো, তা সারা বিশ্ববাসীই দেখতে পাচ্ছে প্রতিদিন মিডিয়ার বদৌলতে! জাতিসমুহের নিরাপত্তা রক্ষায় যে জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠা, সেই জাতিসংঘই এই বরবাদীর আয়োজক!

'রাজনীতির প্রশ্ন থাকুক' বলে বিষয়টিকে পাশ কাটাতে চাইলেও তা পারি না। কারণ, জীবনের পুরো অংশটাইতো রাজনীতির নিয়ন্ত্রণে। মাওলানা রুমীর জীবন, শিক্ষা নিয়ে যে আয়োজন, তার পেছনে নিছক লোক দেখানো উদ্দেশ্য নয় বরং রয়েছে নিরেট বাস্তবতা। মুসলমানরা বা তাদের কোন সংগঠন বিন্দুমাত্র চেষ্টা না করা সত্তেও বিগত কয়েকটা বসরে মাওলানা রুমীর বই পশ্চিমা বিশ্বে বেস্ট সেলার! দেদারসে বিক্রি হচ্ছে তার সাহিত্য। মানুষ পাগলের মত তার বই পড়ছে।

www.pathagar.com

পুরো সেক্যুলার বিশ্ব জুড়ে মানুষের মনোজগতে এক অস্থিরতার সৃষ্টি হয়েছে। নৈতিকতা বিবর্জিত প্রচণ্ডভাবে আত্মকেন্দ্রিক সমাজব্যবস্থায় মানুষের মনে আবেগের দৈন্যতা দানা বেঁধেছে। ক্রমাগতভাবে বস্তুবাদী চিন্তা চেতনায় লালনে তা প্রতিদিনই জটিলতর হয়ে তাদের মন মগজে ঠাঁই করে নিচ্ছে হাহাকার আর শূন্যতা। এই শূন্যতা আর হাহাকারেই প্রতিষেধক আছে রুমীর রচনায়। রয়েছে আত্মার খোরাক, মানবিকতার আহ্বান। বিশ্বের মানুষ সেই খোরাক পেতেই পাগলের মত তার সাহিত্য হাতড়ে মরছেন।

আফগানিস্থানের বাল্‌খ নগরীতে জন্ম নেয়া এই সাধক পুরুষটি ইসলামের তাসাওফকে সহজ ও সাবলীলভাবে উপস্থাপন করেছেন। তার এই উপস্থাপনাটি কেবলমাত্র মুসলমানদের কাছে সীমাবদ্ধ থাকেনি বরং তিনি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলের কাছেই ইসলামের প্রেম, ভালবাসা, সহমর্মীতা আর আল্লাহর সাথে গভীর একটা সম্পর্ক তৈরীর কথা বলেছেন খুবই সহজ ও প্রাণবন্ত ভাষায়।

তার ভাষায় যেমন একটা সর্বগ্রাহ্য আবেগ আছে, তেমনি রয়েছে সুক্ষ্ণ ও সংবেদনশীল কৌশল, যা অতি সহজেই পাঠককে ভাবাবেগে উদ্দীপ্ত করে। তিনি ইসলামের শিক্ষাকে সর্বগ্রাহ্যরুপে, সার্বজনীন ভাবে তুলে ধরেছেন অত্যন্ত সফলভাবে। এখানেই তার সফলতা। আর এই কারণেই আজ নয়শত বসর পরেও তার সাহিত্য কেবল মুসলমানদেরই নয়, অমুসলিমদেরও টানছে। আর তা দিনে দিনে বেড়েই চলেছে।

তারই প্রমাণ ইউনেস্কো কর্তৃক তাঁকে ২০০৭ সালের প্রতিপাদ্য পুরুষ হিসেবে ঘোষণা। সারা বিশ্বের মানুষ ইতিমধ্যেই তার সাহিত্য নিয়ে চর্চা করছেন। ইউনেস্কোর উদ্যোগে সেই ধারাটিই আরও বাড়বে নিঃসন্দেহে। মাওলানা রুমীর তাসাওফের শিক্ষা, তা মূলত ইসলামেরই শিক্ষা। তাসাওফ নিয়ে এক ধরনের ফকির ও তথাকথিত দরবেশের ভণ্ডামি থাকলেও তাতে মূল শিক্ষার কোন পরিবর্তন হয়নি। রুমীর ভাবশীষ্য খেতাব ললাটে টানিয়ে কিছু ধান্দাবাজ, ভণ্ড, যা করে বেড়ায় তার মধ্যে না আছে ইসলাম, আর না আছে তাসাউফ! বরং যা আছে তা নিরেট ধান্দাবাজী।

এরা সূফীবাদের নামে, তাসাউফের নামে কিম্ভূতকিমাকার পোষাকে সেজে সূফীবাদের দীক্ষা নিয়ে এবং দিয়ে বেড়ায় কেবল মাত্র দুনিয়া কামাতে! বর্তমান তুরস্ক, আফগানিস্থান, ভারত ও ইরানের বেশ কিছু অংশ থেকে এরকম অনেক ভন্ড সুফী'র আবির্ভাব ঘটেছে এবং এরা ইউরোপ, আমেরিকা, ও অস্ট্রেলিয়ায়ও এই তথাকথিত সূফীবাদের ব্যবসা করে দু'পয়সা নগদ নারায়ণ কামাচ্ছে! এদের কর্মকান্ডে ইসলামের কোন শিক্ষা নেই। ইসলামের সাথে দূরতম সম্পর্কও নেই, একমাত্র নামটি ছাড়া।

www.pathagar.com

বাংলাদেশেও ফানাফিল্লাহ'র নামে কিছু ভন্ড গাঁজার কলকে টেনে বুঁদ হয়ে থাকে। ভাবখানা, আরশে মুয়াল্লায় রবের সান্নিধ্যে পৌঁছেছে। তাদের কথা বার্তায় মনে হবে, এরা মারেফাতের খবর নিয়েই ছেড়েছেন আল্লাহ'র কাছ থেকে!

এই সব বুজরুকী। আমরা সাধারণ মানুষরা ইসলাম চিনি না, জানি না। আমরা জানি না তাসাউফ কি জিনিস? ঐ জিনিসটির সাথে আমাদের বর্তমানকালের মুসলমানদের (গুটিকতক ব্যতিক্রম ছাড়া) সংশ্লিষ্ঠতা একেবারে শূন্যের কোঠায়! তাই আমাদের কাছে তাসাউফের নামে যা চালায় ঐ সব ভন্ডরা, তাই চলে দিব্যি! আমরাও ভক্তিতে গদ গদ হই! এ যেন অন্ধকে হাতি দেখানো!

ওদেরই বা দোষ দেই কেমন করে? জমিতে যথাযথ পরিচর্যা না হলে আগাছা জন্মাবেই! আমাদের মন ও মননে ইসলামের চর্চা নেই। আমাদের কাছে ইসলাম আজ 'একটি কালচারাল বিষয়'। কিছু আচার আচরণে, পর্ব পার্বণের মধ্যে ইসলাম আটকে আছে। আমরাই তাকে আটকে রেখেছি। বৎসরের দু'টি ঈদে কিংবা বাবা মা'র মৃত্যুতে, নয়তো বিয়ে শাদীতে খোঁজ পড়ে ইসলামের।

ইসলাম মানে যে শান্তি, তার সূচনা হয় ব্যক্তি, বস্তু ও পারিপার্শ্বিকতাকে জানার মাধ্যমে। এই জানাজানির মাধ্যমেই মানুষে মানুষে সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সেই সম্পর্ক গভীর, প্রগাঢ় ও নিবিড় হলেই তৈরী হয় মানুষে মানুষে সহমর্মীতা আর পারস্পরিক ত্যাগের চেতনা। এভাবেই পরিবার হতে আরম্ভ করে সমাজ আর দেশ এবং সর্বশেষে বিশ্বে আসে শান্তি।

এ কারণেই ইসলাম সবার আগে যে বিষয়টিকে ফরজ করেছে, সেটা হলো জ্ঞান। এই জ্ঞানই ক্ষুদ্র বা বৃহত্তর যেকোন অংগণে শান্তি প্রতিষ্ঠার পুর্বশর্ত। আজ বিশ্বে তো দুরের কথা, আমাদের নিজেদের পরিবারে কোন শান্তি নেই। কারণ শান্তির যে মৌলিক শর্ত, সেই শর্তটি অর্থাৎ 'জ্ঞান' এর কোন চর্চা নেই। একটা কঠিন ও নির্মম বাস্তবতা। অস্বীকার করার উপায় নেই, আর তার কোন প্রয়োজনও নেই।

ফলে 'ইসলাম' 'ইসলাম' করে যতই নাচি, ইসলাম রয়ে গেছে আমাদের জানার বাইরে। আমরা যে যেটুকু ইসলামের সন্ধান পেয়েছি, সেটুকুকেই পরিপূর্ণ ইসলাম ভেবে বসে আছি। এর বাইরে বের হতে পারি নি। তাই আমাদের কাছে নামাজ, রোজার যে খবরটুকু আছে তার কণা পরিমানও নেই তাসাউফের খবর! জানারও চেষ্টা করি নি বিষয়টা, কারণ জ্ঞান চর্চায় আমাদের এলার্জি আছে। আমরা পণ করেছি, আর যাই করি, জ্ঞানচর্চা করব না! তার ধারে কাছেও যাব না।

www.pathagar.com

বিশ্বের সকল মানুষ, অথবা নিদেন পক্ষে বেশীর ভাগ মানুষ যদি মাওলানা রুমীর শিক্ষা, তার ভাব আর আদর্শে অনুপ্রাণিত হতেন, সেটাকে নিজেদের জীবনে আঁকড়ে ধরতেন, এই বিশ্ব হতে হানাহানী, রক্তক্ষয়, যুদ্ধ-সংঘাত খুব সহসাই দুর হত। কারণ, মওলানা রুমী যে দর্শন উপস্থাপন করেছেন তা আর কিছু নয়, বরং খোদ ইসলামেরই দর্শন।

মুসলমানদের জন্য বড়ই লজ্জা আর পরিতাপের বিষয়, মাওলানা রুমী আর তার শিক্ষাকে জানানোর জন্য ইউনেস্কো উদ্যোগ নেয়! আমরা, আমাদের সরকার, বুদ্ধিজীবি মহল কি করলেন? কই তারা তো, কোনদিন এরকম কোন উদ্যোগ নিলেন না বিশ্ববাসীকে রুমীর সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে! এ লজ্জা রাখি কোথায়?

আমাদের রাজনীতিবিদরা ব্যস্ত ক্ষমতার ধান্দায়। কবিরা ব্যস্ত প্রেমের কবিতায় পরকীয়াকে মহিমান্বিত করতে, শিল্পীরা ব্যস্ত নারীর উদাম শরীরের বন্দনাময় ব্যঞ্জনা আঁকতে। বুদ্ধিজীবিরা ব্যস্ত বুদ্ধির ভাড়া খাটতে। আমাদের লেখকরা ব্যস্ত তাদের লেখায় শ্বাশত সত্যের বিকৃত উপস্থাপনায়!

অথচ আমাদেরও লেখক আছেন, আছেন সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবি। আমাদের আছেন শিল্পী, আছেন কবি। যাঁরা লিখতে পারেন, ছড়াতে পারেন জ্ঞান আর শ্বাশত সত্যের বাণী! তাঁরা কি এগিয়ে আসবেন না সে ভাবে, যে ভাবে একসময় ইউরোপের ভল্টেয়ার, কীটস, নিট্‌শে, দান্তে, শেলী, শেক্সপিয়ার, বায়রণ, রজার বেকন, ডারউইন'রা এগিয়ে এসেছিলেন! ইউরোপবাসীর মন মননে, চিন্তা-চেতনায় এক নতুন ধারার সূচনা করেছিলেন, যার ফলশ্রুতীতে সত্য সুন্দরের বিপরিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এক ধ্বংসাত্বক দর্শন, যা আজ পর্যন্ত সভ্যতাকে শাসন করে যাচ্ছে।

তারা কি এগিয়ে আসবেন না ঠিক সে ভাবে, যে ভাবে একদিন ইবনে খালদুন, ফারাবী, ইবনে সীনা, গাজ্জালী, মওলানা রুমী এসব মনীষিরা এগিয়ে এসেছিলেন, হাতে তুলে নিয়েছিলেন কলম, রচনা করে গেছেন অমর সাহিত্য! সেইসব মনীষীরা আজ ইতিহাসের বাসিন্দা। তাদের সেসব সাহিত্য দর্শন, ইতিহাস, আমরা যার চর্চাও করি না আর সে সবের সাথে পরিচিতও নই। ফলে আমাদের লেখক সাহিত্যিকরা উজ্জীবিত হন না এসব মনিষীদের মত কালোত্তীর্ণ সাহিত্য রচনায়।

সারা বিশ্বময় সাহিত্যের অপ্রতিরোধ্য শক্তি, তার প্রভাব প্রতিষ্ঠিত এক বাস্তবতা। এটাকেই ভর করেই বিশ্ব মুসলিম জনমানস তছনছ করেছে। আমাদের যুবক, তরুণদের চিন্তা আর চেতনার জগতকে করেছে বিপর্যস্থ। সে ধারা এখনও

www.pathagar.com

অপ্রতিরোধ্য। অথচ তার বিপরীতে মুসলিম লেখক, দার্শনিক কই যাঁরা সত্যকে তুলে ধরবেন? আমাদের লেখকরাতো ভাড়াতে ফরমায়েশী লেখায় ব্যস্ত, আদর্শকে তুলে ধরার লেখক কই? আজ যেন লেখার উদ্দেশ্যই বদলে গেছে!

ছয়

প্রখাত ইংরেজ সাহিত্যিক, চিন্তাবীদ George Orwell তার লেখা Why I write নামক গ্রন্থে তিনি কেন লেখা লেখি করেন? সে বিষয়ে লিখতে গিয়ে অন্যান্য লেখকরা কেন লেখালেখি করেন, সে বিষয়েও অনেক কথাই লিখেছেন। লেখকের মনস্তাত্বিক বিশ্লেষণ করেছেন নিজের দৃষ্টিভংগীতে। তিনি চারটি কারণ উল্লেখ করে বলেছেন, এই চারটি কারণের যে কোন এক বা একাধিক কারণেই একজন লেখক লেখালেখি করেন। কারণগুলো একান্তই তার নিজের আক্বিদা, বিশ্বাস আর দৃষ্টিভংগীজাত। তিনি একজন লেখকের তৃপ্তি, সফলতা, ব্যর্থতা, তার প্রাপ্তি, এসব নিয়েও কম বেশী লিখেছেন। যাঁরা বইটি পড়েছেন বা নিকট ভবিষ্যতে পড়বেন, তাঁরা বিষয়টি জানবেন।

মনুষ্য সমাজ বিবর্তনের ক্রমপর্যায় পার হতে হতে এমন একটা পর্যায়ে এসেছে যে, এখানে যুক্তি আর বিশ্লেষণ হলো মতাদর্শ তৈরীর বা পরিবর্তিত হবার একমাত্র মাধ্যম। বিশ্বে আজ পর্যন্ত যতগুলো বিপ্লবের কথা আমরা জানি, তার সবগুলো হয়েছে মানুষের মনোজগতে পরিবর্তনের সুত্র ধরে। আর এই পরিবর্তনটা সাধিত হয় কোন একটা বিশেষ মতাদর্শকে কেন্দ্র করেই।

এমনিতেই কোন পরিবর্তন আসে না। মানুষও সহজেই পরিবর্তনকে মানে না, যদি না তার সাথে তার মতাদর্শের মিল, মানসিক সম্পৃক্ততা থাকে। এই মানসিক সম্পৃক্ততাটা তৈরীই হয় চিন্তা আর বিশ্বাসের জগতে পরিবর্তনের মাধ্যমে। এটাই মানুষের সহজাত মানবিক প্রবৃত্তি।

এর কোন ব্যতয় নেই। তবে জোর করে কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠিকে কোন বিশেষ মতাদর্শের প্রতি টেনে নেয়া হলে সে কথা অবশ্য আলাদা। প্রশ্ন হলো, কি ভাবে এই পরির্বতনটা আসবে ব্যাপক জনগোষ্ঠির মনের মাঝে, তাদের চিন্তা আর চেতনায়?

উত্তরটা বোধ হয় কোন সচেতন মানুষ, বিশেষ করে, কোন সচেতন মুসলমানকেই বলে দিতে হবে না। যুগে যুগে নবী, রাসুল ও তাঁদের অনুসারীদের দ্বারা সমাজ

www.pathagar.com

সংস্কারের যে কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে সে ইতিহাসের গতিধারার দিকে একবার নজর বুলিয়ে নিলেই পুরো বিষয়টা পরিষ্কার হয়ে উঠে।

কেবলমাত্র নবী রাসুলদের মত মহান ব্যক্তিদের কথাই বা কেন, যে কোন সমাজ বিপ্লবের গতিধারা খেয়াল করলেই দেখা যাবে, বিপ্লবের গোড়াতেই ছিল একটা জাতিকে বা তার বৃহৎ একটা অংশকে উদ্বুদ্ধ করে বা প্রচার প্রোপাগান্ডায় প্রভাবিত করে বা শক্তি প্রদর্শনের মাধ্যমে জবরদস্তিমুলকভাবে একটি বিশেষ আদর্শের প্রতি ধাবিত করার ঘটনা। তার পরেই এসেছে বিপ্লব, একটা পরিবর্তন।

ইসলামের ইতিহাস যদি আমরা ঘেঁটে দেখি, তা হলে দেখব, এখানে একমাত্র যে পদ্ধতিটি অবলম্বন করা হয়েছে, তা হলো, মানুষের কাছে জ্ঞান, তথ্য, আর যুক্তির মাধ্যমে সত্যটাকে তুলে ধরা। এর পরে তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে তার নিজের জগতে। স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে ভেবে দেখা, বিচার, বিশ্লেষণ করার পরে নিজের মত করে স্বিদ্ধান্ত নেবার।

এর অনিবার্য পরিণতি, দলে দলে মানুষ এই আদর্শের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছে। এর জন্য সে নিজের পরিবার পরিজন, ব্যবসা-বাণিজ্য, ক্ষমতা-সম্মান, প্রভাব-প্রতিপত্তি, সবকিছুই হাসিমুখে বিসর্জন দিয়েছে! যে কোন পিছুটান, প্রলোভনকে অবজ্ঞা করেছে, তুচ্ছ জ্ঞান করেছে! এমনকি নিজের জীবনকেও বিলিয়ে দিয়েছে। সে ইতিহাস আর নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না।

তাঁরা এমনটি পেরেছিলে কারণ, তাঁদের মনোজগতে একটা পরিবর্তন সূচিত হয়েচিল। এই পরিবর্তনটা এমনিতেই হয় নি। এর জন্য কাউকে না কাউকে তাঁদের সামনে তথ্য, জ্ঞান, আর যুক্তি তুলে ধরতে হয়েছিল। আমাদের প্রিয় রাসুলুল্লাহ্ সাঃ কি তার পুরোটা জীবন এই কাজটিই করেন নি? ইসলামি বিপ্লব কি ভাবেই হয় নি? তার প্রতিষ্ঠাও কি এ পথে আসেনি?

এর উত্তর সবারই জানা। এটাই বাস্তবতা। মানুষের মনোজগতে কোন পরিবর্তন আনতে হলে যুক্তি, তথ্য, আর তত্ব দিয়ে তার জ্ঞানের জগতকে সমৃদ্ধ করে ছেড়ে দিতে হয়। ভেবে দেখুক, তার বিবেক কি বলে সংশ্লিষ্ঠ বিষয়ে? তার নিজের ভেতরের সত্তাটা কি বলে? উত্তরটা তাকেই খুজে বের করতে দিতে হবে।

এ ভাবেই আসে ব্যক্তির মানসিক পরিবর্তন। পরিবর্তিত হয় তার চিন্তা আর চেতনার জগত। এই পরিবর্তনটাই তাকে পরিচালিত করে থাকে তার পথে। সে স্বিদ্ধান্ত নেয়,

www.pathagar.com

কোন পথে সে যাবে? কোন পথে সে তার নিজের জীবনকে পরিচালিত করবে? কোন পথে সে তার সমাজকে পরিচালিত করতে চাইবে?

একটা সময় ছিল যখন প্রিন্ট আর ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার প্রচলন ছিল না। আবার কখনও যদিও বা ছিল, তা ছিল সীমিত। আজ পরিস্থিতি এমনটাই দাঁড়িয়েছে যে, প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমই হলো চিন্তা, যুক্তি, তত্ত্ব, আর তথ্যকে সাধারণ মানুষের কাছে দ্রুত তুলে ধরার, তা পৌঁছে দেবার, একমাত্র কার্যকর মাধ্যম ।

এই মাধ্যমকে ভর করেই কার্ল মার্কস আর এঙ্গেল তাদের মতাদর্শকে তুলে ধরেছেন, বিশাল গোষ্ঠিকে উজ্জীবিত করেছেন, তা আমাদের চোখের সামনে। কিভাবে ডারউইনের মানবতা বিধ্বংসী মতবাদ মানব গোষ্ঠির এক বিরাট অংশকে নিজেদের অস্তিত্ব নিয়ে বিভ্রান্তিতে,ফেলেছে, কিভাবে সেই বিভ্রান্ত গোষ্ঠি মতবাদটিকে অবধারিত বিশ্বাসে পরিণত করে নিয়েছে, তাও আমাদের চারিপাশে প্রতিদিনই দেখছি।

ফারাবীর দর্শন চেতনা, রুমী অথবা ইবনে রুশদ'এর অন্তর্ভেদী ভাবনা কি আজও বিশ্বের মানুষকে আলোড়িত করে না? করেনি কি মধ্য যুগের পুরো ইউরোপকেই? গাজ্জালীর চিন্তা কি আজও ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে মানুষকে চিন্তার খোরাক জোগায় না? কিন্তু সে তো অতীত ইতিহাস। আমাদের বর্তমান প্রজন্মের ক'জন এইসব মহান ব্যক্তিদের নাম জানে? ক'জন তাঁদেরকে চেনে?

চিন্তা আর দর্শনের ভূবনে আমরা আমাদের বিচরণ ছেড়েছি বলেই না এ দায়িত্বটা তুলে নিয়েছে অন্য কেউ। আর সেই 'অন্য কেউ' পুরো বিশ্বটাকে কোন পর্যায়ে এনে দাঁড় করিয়েছে, সেটা বলার অপেক্ষা রাখে কি আর? তারা কি বিপ্লবের পর বিপ্লব ঘটিয়ে মানবতাকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে এনে দাঁড় করায় নি?

কোন সচেতন মুসলমান কি এই বাস্তবতাকে অস্বীকার করতে পারবেন? মানবতা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে বটে, তবে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে মুসলমানরা, ইসলামের অনুসারীরা। ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে বললে তো অনেক কমই বলা হয়। বরং বলা চলে, মুসলমানরা আজ ধংসের দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে।

আজ থেকে পঞ্চাশ ষাট বসর আগে যাদের জন্ম, যাঁরা হিন্দু, মুসলমান বা খৃষ্টান যে কোন একটা ধর্মীয় আবহের মধ্যে জন্ম নিয়ে বড় হয়েছেন, বিশ্বটা কি ভাবে দ্রুততার সাথে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ বিচারে অসহিষ্ণু হয়ে উঠল, তা তারা নিজেদের চোখেই দেখেছেন। একদিন যে ইসলামকে সারা বিশ্ববাসী শান্তির ধর্ম হিসেবে জানত, সেই বিশ্ববাসীই আজ তাকে জানে সন্ত্রাসের ধর্ম হিসেবে!

www.pathagar.com

যে ইসলামের আগমনই হলো মানুষকে সকল অশান্তি, সকল পরাধীনতা, সকল ধরনের সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত করতে, যে ইসলামের আগমনই হলো মানুষের ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রিয় এবং আন্তর্জাতিক জীবনেও সাম্য, শান্তি, আর স্থিতি প্রতিষ্ঠার জন্য, আজ সেই ইসলামকেই দেখা হচ্ছে অশান্তির ধর্ম হিসেবে! বিশ্বের কোণে কোণে এমনও দেখা যাচ্ছে যে, মুসলমানরা তাদের স্বকীয়তা বজায় রেখে মুসলিম পরিচয়ে রাস্তা ঘাটেও বের হতে পারছে না। এ এক সর্বনাশা প্রক্রিয়া! একে রুখতে হবে প্রেমে আর বন্ধুত্বে, জ্ঞানে আর যুক্তিতে। আজ এটাই সবচেয়ে বড় জেহাদ!

কিন্তু আজকের মুজাহিদরা দিকে দিকে হোঁচট খেয়ে বেড়াচ্ছে। জেহাদের নামে তারা নিরীহ নর-নারীকে হত্যা করে বেড়াচ্ছে। কলংক এঁকে বেড়াচ্ছে ইসলামের কপালে। তাদেরই বা দোষ দিয়ে লাভ কি? শতাব্দীর অজ্ঞানতার আঁধার যে এখনও কাটেনি, এখনও যে তাদের বেশীরভাগ জনগোষ্ঠির কাছে ইসলামের যথার্থ চিত্রই পরিষ্কার নয়! তারা এখনও জানেই না যে, ইসলাম কেবল মুসলমানের নয়, বরং ইসলাম হলো সকল মানুষের!

তারা জানেই না যে, জেহাদ'তো শুরুই হয় নিজের সত্তার সাথে অহর্নিশ লড়াই করে যাবার মাধ্যমে। তারা এটাও জানে না যে, নিজেকে ইসলামের জ্ঞানে না সাজিয়ে, নিজের চরিত্রটাকে ইসলামের রং এ না রাঙ্গিয়ে জেহাদে নামাটা আর কিছুই নয়, শয়তানেরই একটা প্ররোচনা, একটা উস্কানি মাত্র। যার মাধ্যমে জান্নাত নয়, জাহান্নাম প্রাপ্তিটাই নিশ্চিত হয় কেবল!

চিন্তা আর চেতনার জগতে স্বচ্ছতা ছাড়াই কোন কোন মুসলমান জেহাদে নেমেছে! তাদের কাছে পৌছে দিতে হবে ইসলামের স্বচ্ছ, সলীল জ্ঞান। তুলে ধরতে হবে যুক্তি, তথ্য আর বিশ্লেষণ। কিন্তু কাজটা করবে কে? প্রিন্ট আর ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার যুগে বসে মুসলমানরা ঠিকই পত্র-পত্রিকা, বই, ম্যাগাজিন পড়ে, তবে তা কেবল উপন্যাস আর থ্রিল ভর্তি কল্পকাহিনী মাত্র। যেখানে ইসলামের কোন দিক নির্দেশনাই নেই।

কোথায় সেই লেখক, যারা তাদের লেখায় তুলে ধরবেন মুসলিম জাতিসত্তার পথচলার নির্দেশনা? বিশ্বের এমন কোন অঙ্গন নেই যেখানে একজন মুসলমানকে চিত্রিত করা হচ্ছে না সন্ত্রাসী হিসেবে, এমন কোন স্থান নেই যেখানে মুসলমানকে চিত্রিত করা হচ্ছে না সমাজবিরোধি হিসেবে। এমন কোন দেশ, এমন কোন ভাষা নেই, যে দেশ, আর যে ভাষায় ইসলামকে উপস্থাপন করছে না সন্ত্রাসী ধর্ম হিসেব!

www.pathagar.com

তার পরেও কারো মাথা ব্যাথা নেই। নেই কোন উদ্যোগ। সব যেন গা সওয়া হয়ে গেছে। ইন্টারনেট খুললেই চোখে পড়ে, রাসুলুল্লাহ সাঃ এঁর মহান সাহাবীদের বিরুদ্ধে চলছে বিষোদ্গার। আজও হজরত ওমর রাঃ, হজরত আবু হুরায়রা রাঃ, হযরত আয়েশা রাঃ এঁর মত সাহাবীদের বিরুদ্ধে, ইসলামের বিরুদ্ধে চলছে বিভৎস মিথ্যাচার, তার পরেও কোন প্রতিবাদ নেই। চলছে কুরআনের বিরুদ্ধে জঘণ্য মিথ্যাচার, এই মহাগ্রন্থটা নাকি মানুষকে সন্ত্রাস শেখায়, মানুষে মানুষে বিদ্বেষ, হিংসা ছড়ায়! বলা হচ্ছে, বিশ্ব শান্তির জন্য কুরআনের নাকি সংশোধন দরকার! চেষ্টা করা হচ্ছে প্রিয় হাবীব সা: এর চরিত্রে কলঙ্ক লেপনের!

এসব দেখেও যদি মুসলমানরা কলম হাতে তুলে না নেন, তবে জানতে ইচ্ছে করে, আর কবে তা করবেন তাঁরা? আর কতটা বিপর্যয়ের পরে এসে তাঁরা মাঠে নামবেন? কবে হাতে তুলে নেবেন কলম? তবে কি এরা বসে আছেন কেউ এসে তাদের কাজটা করে দিবেন আর তারা নিজেরা কেবল মৌজ উড়িয়েই দিনাতিপাত করবেন? কিংবা খানক্বাহতে বসে বসে তসবিহ জপে কিংবা মুরিদদের বাড়ি বাড়ি দুধের সর, আর ক্ষীরটুকু খেয়ে বেড়াবেন?

এরা কি বসে আছেন ক্যাট স্টিভেন্স, ইউসুফ ইস্টেস'রা কবে মুসলমান হয়ে বিশ্বময় চষে বেড়াবেন ইসলামের দাওয়াত তুলে ধরে, আর তারা নিজেরা শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে বসে বসে উপভোগ করে যাবেন বিশ্বের সকল উপভোগ্য উপাদানের স্বাদ?

ইউসুফ ইস্টেস একজন সংগীতজ্ঞ, একজন খৃষ্টান্ পাদ্রী একবার এক মুসলমানকে খৃষ্টান বানাবার টার্গেটে তার সাথে সম্পর্ক গড়লেন, দিনের পর দিন লেগে রইলেন কিন্তু অবশেষে নিজেই মুসলমান হলেন। আজ তিনি বিশ্বের এক নাম করা দায়ী ইলাল্লাহ, প্রতিদিনই আমেরকিান, ব্রিটিশ, জার্মান, স্প্যানিশ সব দেশে থেকেই সব ধর্মের মানুষ তার হাতে শাহাদা পড়ে মুসলমান হচ্ছেন। ইন্টারনেটে তার নিজের মুখেই ইসলাম কবুলের কাহিনী শুনুন, দেখুন এ কথার বাস্তবতা কতটা সত্য ও অকাট্য।

তিনি ছিলেন একজন আমেরিকান খৃষ্টান নিবেদিতপ্রাণ পাদ্রী। মুসলমান হওয়ার পর আজ যাঁকে বিশ্ব জানে শেখ ইউসুফ ইস্টেস হিসেবে, নেমে পড়েছেন ইসলাম প্রচারে। একসময় যে আবেগ আর উৎসাহ নিয়ে খৃষ্ট ধর্মপ্রচার করতেন তার শতগুণ বেশী আবেগ আর উৎসাহ আর জ্ঞান নিয়ে মাঠে নেমেছেন, চষে বেড়াচ্ছেন বিশ্বের এক কোণা থেকে আর এক কোণা। মাত্র ক'দিন আগে তার একটা লেকচারে এসে শত

www.pathagar.com

শত শ্রোতা দর্শকের মধ্যে থেকে একই সাথে একশত পঁয়ত্রিশ জন আমেরিকান ইংরেজ খৃষ্টান মুসলমান হলেন।

এঁদের এইসব কর্মতৎপরতা দেখি আর মনে মনে পুলকিত হই। অথচ নিজেরা কিছুই করি না। একজন মুসলমান হিসেবে আমাদের উপরে দায়িত্ব ছিল রাসুলুল্লাহ সাঃ এঁর বাণী, আল কুরআনের বাণী, ইসলামের দাওয়াত মানুষের কাছে তুলে ধরার, সে ব্যাপারে আমাদের কোনই ভাবাবেগ নেই, নেই সচেতনতা। অথচ আল কুরআনের ভাষ্য মতে আমাদের মুসলমান হিসেবে সৃষ্টি করার মূলে একমাত্র উদ্দেশ্যই ছিল সেটি।

আমরা মুসলমান হয়েও দায়িত্বটা পালন করিনি, করছি না, তার পরেও ইসলামের দাওয়াত মানুষের কাছে পৌছানোর কার্যক্রম থেমে নেই। কেউ না কেউ সে দায়িত্বটা ঠিকই পালন করছে। আল্লাহর এই বিশাল দুনিয়ায় ক্যাট স্টিভ্যান্স, ইউসুফ এস্টেস'দের কোন ঘাটতি নেই, ছিল না, এবং কোনদিন হবেও না।

এ বিশ্ব কোনদিনই সত্যিকার মুসলিম শূন্য হবে না। কোন না কোন মানুষের উপরে ভর করে ইসলাম সত্যিকার রুপ নিয়ে টিকে থাকবে। কোন না কোন মানুষ সত্যিকার ভাবেই ইসলামের কাছে নিজেকে সমর্পণ করে এর শিক্ষা আর আদর্শকে গ্রহণ করে নেবেন, হবেন খাঁটি মুসলমান, কেননা ইসলাম মানুষের ধর্ম। বিশ্বের সকল মানুষের জন্য এটি। যেহেতু বিশ্বের শেষ দিনটি পর্যন্ত মানুষ টিকে থাকবে, সেহেতু এই ধর্মটিকেও সঙ্গত কারণেই টিকে থাকতে হবে ততদিন। কাল কেয়ামত পর্যন্ত।

বিশ্বের কোন না কোন মানব গোষ্ঠি ধর্মের মশালটিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। আর যারা বা যে সৌভাগ্যবান গোষ্ঠিটি কাজটি করবে, বা করার সুযোগ পাবে, তাঁরাই পরিচিত হবে মুসলমান হিসেবে। মানবগোষ্ঠির একটা অংশ এর ধারক, বাহক হবে, হবে অনুসারি। এরাই একে টিকে থাকতে সহায়তা করবে। টেনে নিয়ে যাবে এক যুগ থেকে আর এক যুগে, যুগ থেকে যুগান্তরে। এর বিস্তারেও রাখবে ভূমিকা।

আর কেউ যদি এ কাজে অবহেলা করে, তবে তাকে বা তাদের বদলে দিয়ে তদস্থলে আল্লাহ এমন একটা দলকে আনবেন, যাঁরা এই ইসলামকে এগিয়ে নিতে, মানব সম্প্রদায়ের কাছে উপস্থাপন করতে, তাকে তুলে ধরতে এগিয়ে আসবে।

পুরো বিশ্বের মালিক তো আল্লাহ স্বয়ং। তার বিশ্বে কি কোন কিছুর অভাব আছে? ছয়শত কোটি বিশ্ববাসীর দেড়শত কোটিকে তিনি মুসলমান বানিয়েছেন। এই দেড়শত কোটি মুসলমান যদি তাদের উপরে অর্পিত দায়িত্ব পালন না করে, তবে কি তিনি

www.pathagar.com

তাদের উপরে বসনিয়া, চেচনিয়া, ফিলিস্তিন আর কাশ্মীরের মত আজাবে নির্মূল করে তদস্থলে ক্যাট স্টিভান্স'দের ইউসুফ ইসলাম বানিয়ে দাঁড় করিয়ে দিতে পারেন না ইসলামের মশালবাহক হিসেবে?

পারেন কিনা, তার জবাব জানতে হলে আল কুরআনে সুরা মায়েদার ৫৪ নম্বর আয়াতটি আবারও একবার ভালো করে পড়ে এবং বুঝে নিতে পারেন। আল্লাহ ইচ্ছা করলে এরকম লক্ষ লক্ষ ক্যাট স্টিভ্যান্স কে তুলে এনে বানিয়ে দিতে পারেন ইউসুফ ইসলাম। আর এইসব ইউসুফ ইসলাম'রাই নতুন করে বিশ্বময় তুলতে পারেন এক এক শ্রুতী মধুর সূরের মুর্ছনা।

অথচ এটা কি প্রত্যেকটা মুসলমানের মৌলিক ও প্রদান দায়িত্ব নয় যে, তারাই এই দ্বায়িত্বটুকু পালন করে যাবেন? যে সহজ সরল আবেগ ভাব আর ভাষা দিয়ে মওলানা রুমী বিশ্ববাসীর কাছে ইসলাম তুলে ধরেছেন সেই একই ভাবে যদি আজকের মুসলমানরাও ইসলামের শিক্ষা, দর্শন আর ভাবকে তুলে ধরতে পারে বিশ্ববাসীর কাছে, তা হলে বিশ্ব কি শুনবে না সে ডাক? শ্রুতীমধুর ডাক কে না শোনে কান পেতে?

সাত

এভাবেই একবার প্রশ্নটা করেছিলাম মেক্সিকান সুজি গুজম্যান'কে, তার সাথে ছিলেন গ্রীসের মারজুরী কণ্ডাকোস। দু'জনেই নিউক্যাসল ইউনিভার্সিটি থেকে আমাদের এখানে আসতেন। দু'জনেই একটা রিসার্চ প্রজেক্টের ছাত্রী। আসতেন তাদের প্রজেক্টের কাজে।

তারা নাচের উপরে পি এইচ ডি করছেন। সপ্তাহে দু'দিন আসেন আমাদের হাসপাতালে, এখানে কয়েকজন রুগী রুগীনিকে তারা নাচে অংশ নেয়ান। তাদের নিয়ে নাচেন। শুরুর আগে একবার আমাকে এইসব রুগীদের শারিরিক ও মানসিক ফিটনেস টেস্ট করে দিতে হয়েছিল। তার নির্বাচিত কয়েকজনকে গবেষণা প্রজেক্টে অংশ নেবার অযোগ্য বলে বাদ দিয়েছিলাম। সে কারণে বোধ হয় ভদ্রমহিলা মনে মনে একটু ক্ষুণ্নও ছিলেন আমার উপরে।

যাহোক, বিগত বসর খানেক ধরে চলমান প্রজেক্টে এখনও তারা আমার সাথে বসেন মাঝে মাঝে। কারণ নাচের প্রজেক্টে অংশ নেয়া ঐ সব নারী পুরুষদের কি ধরনের

www.pathagar.com

মানসিক, দৈহিক ও আচরণগত পরিবর্তন হচ্ছে বা আদৌ হচ্ছে কি না, সেটা নিরীক্ষণ করার দায়িত্ব আমার। সে কারণেই তারা সপ্তাহের দু'টো দিন আমার কাছে আসেন রিপোর্ট নিতে, আমার মতামত জানতে।

তারা এ্যপয়েন্টমেন্ট করেই আসেন। ব্যস্ততার কারণে সময় দিতে না পারলেও সেক্রেটারির মাধ্যমে খবর পাঠান, তারা বসে আছেন, কয়েক মিনিট সময় চান। কখনও কখনও বিরক্তির কারণ হলেও মুখে কিছুই বলি না। দু'জনই ছাত্রী, আচার-আচরণে মার্জিত। মাঝে মাঝে আমার অফিসে ইসলাম ও মুসলমান নিয়ে জমে ওঠা আলোচনার মনযোগী শ্রোতা। কখনও কখনও দু'একটা প্রশ্ন করে ঐ আলোচনায় অংশও নেন।

একদিন কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, তিনি মেক্সিকো সিটিতে ক'বসর আগে একটা মস্‌জিদ দেখেছেন। তার দেশে ফিলিস্তিনি ও লেবানিজ মুসলমান দেখেছেন, কিন্তু বসর চারেক আগে প্রথমবারের মত রক্ত মাংশে মেক্সিকান দম্পতিকে মুসলমান অবস্থায় দেখে সত্যিকার অর্থেই বিস্মিত হয়েছিলেন।

সেদিন সুজি আমার কাছেই প্রথম শুনেছিলেন, মেক্সিকোর দক্ষিণ অঞ্চল, যেখানে মুলত রোমান ক্যাথলিক মেক্সিকানদের আবাস, সেখানে ইসলাম অনুপ্রবেশ করেছে। ৩০০ মুসলিম জনসংখ্যা নিয়ে গড়ে উঠছে একটা মুসলিম কমিউনিটি। গড়ে তুলেছে নিজেদের স্কুল, রেস্টুরেন্ট, হালাল ফুডের দোকান। প্রতিদিনই নারী পুরুষ ইসলাম গ্রহণ করছে, দ্রুত বাড়ছে সংখায়। তারা কুরআন শিখছে, প্রতিষ্ঠা করেছে মসজিদ এবং ইসলামিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

মেক্সিকান সুজি'র বান্ধবী গ্রীক মারজুরী কন্ডকোস উভয়ের শখ তারা বেড়াতে যাবেন ভারতে। তাদের পি এইচ ডি'টা শেষ হলেই যাবেন তাজমহল দেখতে। তাজমহল দেখার খুবই শখ মারজুরী'র। তিনি মনে করেন, এক তাজমহলই বিশ্বে ভারতকে বিশেষ আসনে আসীন করে রেখেছে। আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন, ভারতে গিয়েছি কি না। গিয়েছি, জানালে জানতে চেয়েছিলেন তাজমহল দেখেছি কি না?

'না, ভারতে গেলেও তাজমহল দেখতে যাইনি। ভবিষ্যতেও তাজমহল দেখতে যাবার কোন ইচ্ছাই নাই' দু'জনেই যুগপৎ বিস্মিত, জানতে চেয়েছিলেন, তাজমহলের উপরে আমার এত ক্ষোভ কেন?। 'বিশ্বের অন্যতম এক সপ্তাশ্চর্য বস্তু। তার উপরে ক্ষোভ নেই। কিন্তু ক্ষোভ আছে এর নির্মাতাদের উপর। সেটা অস্বীকার করি না।'

www.pathagar.com

ভারতীয় নার্সিং এ্যাসিস্ট্যান্ট সুষমা দীক্ষিত, মেক্সিকান সুজি গুজমান, গ্রীক মারজুরি কন্ডাকোস এবং কানাডিয়ান মেলানি জনসন, এদের কৌতুহলি প্রশ্নে বলেছিলাম; তাজমহল সম্রাট শাহজাহানের ভালবাসার গভীরত্ব, তার ভালবাসার ব্যাপকতার প্রতিক।

তাজমহল একজন 'মুসলিম' বাদশাহর আদর্শিক বিচ্যুতির স্মারকও বটে! সেকালে কয়েক লক্ষ কোটি টাকা ব্যয়ে দীর্ঘ দুই যুগের শ্রমে তাজমহলটি বানানো হয়েছে। অথচ কেবল শাহজাহানের সময়কালই নয়, মোগল শাসনামলের দুই শতাব্দীকালে একটা ইউনিভার্সিটি বানানোর প্রমাণ নেই ইতিহাসে।

অথচ মুসলমান হিসেবে তাঁদের দায়িত্বই ছিল ভারত থেকে সকল প্রকার অজ্ঞানতা, মূর্খতা দুর করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া! একজন মুসলমান কি করে কবরের উপরে সৌধ বানায়? বিশেষ করে, সেই মুসলমান যখন একটা দেশের কর্ণধার? তার তো পুরো দেশ আর সমাজের প্রতিটি নারী পুরুষের কল্যাণ চিন্তায় বিভোর থাকার কথা! এটাই ছিল সম্রাট শাহজাহানের জন্য তখনকার যুগে সবচেয়ে বড় জেহাদ!'

বোমা ফাটানো বা গলা কাটার মাধ্যমে মানুষ মারার এ যুগে 'জেহাদ' এর এ ধারণাটা কানে বেমানান লাগায় নিশ্চুপ তাঁরা পরস্পরের চোখ চাওয়া চাওয়ি করেছিলেন সেদিন। পরিবেশটাকে হাল্কা করতেই সেদিন একটা গল্প বলেছিলাম। ইতিহাসের সত্য ঘটনা, গল্পের আকারে বলেছিলাম। ঘটনাটা ছিল ওদের প্রিয় তাজমহল নির্মাতা শাহজাহানেরই বাবা সম্রাট জাহাঙ্গীরকে নিয়ে।

বাদশাহ জাহাঙ্গীর। প্রতাপশালী বাদশাহ আকবরের সন্তান। বাদশাহ আকবর ভারত বর্ষে ইসলাম ও মুসলমানদের সাথে কেমন আচরণ করেছে, তা বিশ্ববাসী জানেন!

তার এইসব ইসলাম বিরোধি কর্মকান্ড ও পরিকল্পনা ভারতীয় মুসলমানরা রুখে দিয়েছেন, নিজেদের জান, মাল বিলিয়ে, শত নির্যাতন সয়েও! মুসলমানদের নেতৃত্বে ছিলেন স্বয়ং হযরত মুজাদ্দেদ আলফেসানী (র:)। যাঁর আল্লাহ্ভীতি আর সাহস ছিল রুপকথার মত! সারা ভারতে হিন্দু-মুসলমান সকলেরই অতি শ্রদ্ধার পাত্র। তার সিংহাসন, সৈন্য বাহিনী বা প্রশাসন ছিল না, নিতান্তই ফকির মানুষ। অথচ তার একটি মাত্র ইশারায় ভারতের কোটি কোটি হিন্দু, মুসলমান নিজেদের জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করতে প্রস্তুত ছিল।

আকবরের পর তার পুত্র জাহাঙ্গীর ক্ষমতায় বসেন যিনি পিতার সাথে এই ফকিরের সংঘাতের কথা খুব ভালো করেই জানতেন। তিনিও এই ফকিরকে শায়েস্তা (!) করতে

www.pathagar.com

তাঁকে কারারুদ্ধ করেন। এবারেও একইভাবে জাহাঙ্গীরের সৈন্যবাহিনীসহ সভাসদরা বিদ্রোহ করে। সম্রাট বাধ্য হয়ে তাঁকে মুক্তি দেন, তদূপরি তিনি নিজেই তার মুরীদ হয়ে স্বীদ্ধান্ত নেন, এখন থেকে তিনি একজন প্রকৃত মুসলমানের ন্যায় দেশ শাসন করবেন। একজন প্রকৃত মুসলমানের মত জীবন কাটাবেন! ঘটনাটি এর পরে।

রাণী নুরজাহান। জাহাঙ্গীরের স্ত্রী। খাস বাঁদী পরিবেষ্ঠিতাবস্থায় অন্দরমহলে বসে বনজ ও ভেষজ অনুষঙ্গের সাথে কস্তুরীর মিশ্রণে তৈরী সৌন্দর্যবর্ধক লোশন গায়ে মাখছিলেন। বাঁদী তার পাশেই নির্দেশ পালনার্থে তৈরী। হঠাৎ এক অপরিচিত যুবক একেবারে অন্দরমহলে, তারই দিকে হা করে তাকিয়ে! অর্ধবসনা রাণী রাগে, ক্ষোভে, অপমানে উঠতেও পারেন না! কারণ পুরো শরীর বিবস্ত্র হয়ে পড়ার উপক্রম! অথচ ব্যাটা অসভ্য আগন্তুক রাণীর ক্ষোভ আর লজ্জাকে উপেক্ষা করে ঠাঁই দাঁড়িয়ে তার সৌন্দর্য দেখছে!

রাণী নুরজাহান এতটাই সুন্দরী ছিলেন যে, জাহাঙ্গীর তার সৌন্দর্যে বিমোহিত হয়ে তাকে নুরজাহান বা 'জগতের আলো' উপাধি দিয়েছিলেন! আর তারই প্রতি এই বেয়াদবী! রাণী তার হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে পাশেই পড়ে থাকা বন্দুকটি তুলে আগন্তুক'কে লক্ষ্য করে চালিয়ে দিলেন গুলি! আর ঐ এক গুলিতেই ছেলেটি মারাও গেল। সারা রাজবাড়ী জুড়ে হৈ চৈ।

জাহাঙ্গীর বিশ্রামে। তার নির্দেশে রাজবাড়ীর ফটকে সর্বসাধারণের জন্য টানিয়ে রাখা ঘন্টায় টান পড়ল এমন সময়। একজন সাধারণ প্রজা জাহাঙ্গীরের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চায়! পেয়াদা মারফত তাকে ডাকিয়ে আনা হলো, বিচার প্রার্থী একজন হিন্দু প্রজা, তার অভিযোগ, মস্তিষ্কবিকৃত তার সন্তানকে রাজবাড়ীর ভেতরেই কেউ গুলি করে মেরেছে। তিনি পুত্র হত্যার বিচার চান। তাৎক্ষণিকভাবেই তদন্তে জানা গেল, স্বয়ং রাণী-ই অনাধিকার প্রবেশের দায়ে ছেলেটিকে গুলি করে মেরেছেন। নিহত ঐ যুবকটিই বৃদ্ধ হিন্দু প্রজার সন্তান।

ঘটনা জেনে জাহাঙ্গীরের হতবিহ্বল! আর সেই বৃদ্ধও কোনমতে পালানোর পথ খুজতে ব্যস্ত। স্বয়ং রাণীর বিরুদ্ধেই অভিযোগ যাবে, জানলে কি সে আসত বিচার চাইতে? এখন বিচারতো দুরের কথা, নিজের জীবন নিয়েই টানাটানি!

জাহাঙ্গীর ঘোষণা করলেন, তিনি হত্যাকান্ডের বিচার করবেন। রাণীকে তলব করা হলে সম্রাটের প্রশ্নের জবাবে তিনি আদ্যোপান্তই জানালেন, হত্যার ঘটনাকে অস্বীকার করলেন না। তবে তিনি জানতেন না, ছেলেটি মস্তিষ্কবিকৃত। রাণীই ছেলেটিকে হত্যা

www.pathagar.com

করেছেন, তা প্রমাণিত। জাহাঙ্গীর চুপচাপ অনেকক্ষণ ভাবার পরে রায় ঘোষণা করলেন;

'রানী, তুমি জানতে বন্দুকে গুলি ভর্তি, এবং জেনে বুঝেই গুলি করেছ, মস্তিস্ক বিকৃত হলেও তাকে খুন করতে পার না। কিন্তু হায়, তুমি খুনী। রাণী তোমাকে মানুষ খুনের দায়ে মৃত্যুদণ্ডাদেশ দিচ্ছি।'

রাণী নুরজাহান ক'দিন ধরেই জাহাঙ্গীরের চরিত্রে একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করছিলেন। আজ এই রায় যে সেই পরিবর্তনেরই বাস্তব প্রকাশ, তা বুঝতে পেরে তার অন্তর কেঁপে উঠল আসন্ন মৃত্যুভয়ে, চোখের সামনে ভেসে উঠল ফাঁসির দড়ি! কেঁপে উঠলেন সভাসদরাও। রাণীর মৃত্যুদণ্ড! এক কোণে দাঁড়িয়ে কাঁপছেন বিচার প্রার্থী বৃদ্ধ! নিহত যুবকের পিতা, জাহাঙ্গীরের হিন্দু প্রজা।

নুরজাহান প্রাণের মায়ায় এগিয়ে এলেন। করজোড়ে জাহাঙ্গীরের কাছে তার প্রাণভিক্ষার আবেদন জানাতে 'মহারাজ, একবার আমার ভালোবাসার কথা, আপনার জন্য আমার ত্যাগ, আর প্রেমের কথা স্মরণ করুন! আমাকে দয়াকরে প্রাণ ভিক্ষা দিন। রাণীর গলা আড়ষ্ঠ, কম্পমান। ঠিকমত কথা বেরুচ্ছে না! চোখে ঝরে চলেছে অশ্রু ধারা। জাহাঙ্গীর নুরজাহানের কথায় মুখ ঘুরিয়ে নিলেন, চোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়া অশ্রু লুকোতে লুকোতে জবাব দিলেন;

'রাণী, ভেবো না আমি তোমাকে ভালোবাসি না, বা তোমার ভালোবাসার কথা ভুলে গেছি! রাণী, একদিকে বার বার তোমার ভালোবাসার কথা মনে করছি, আর একদিকে মনে করেছি মহান আল্লাহর নির্দেশ! প্রতিবারেই আমার মনে আল্লাহ্‌র ভালোবাসাই প্রবল হয়ে উঠছে। তার নির্দেশ অমান্য করতে পারব না।'

জাহাঙ্গীরের গলা ধরে এলো! রাণীর চোখে চোখ রাখতেও যেন সাহস হারিয়ে ফেলেছেন। নিজেকে সামলে নিয়ে আবারও মুখ খুললেন;

'রাণী, হত্যার অপরাধে তোমাকে মৃত্যুদন্ড নিতেই হবে। এখানে আমার করার কিছুই নেই। হ্যাঁ, আমি তোমাকে আজও সেই আগের মতই ভালোবাসি। তোমার অবর্তমানে আমার জীবন মরুভূমি হয়ে যাবে, সে দুঃখটুকুও সইব কিন্তু কিছুতেই ন্যায়বিচারের পথ হতে সরে আসতে পারব না!'

জাহাঙ্গীর এবারে আর নিজেকে সামাল দিতে পারলেন না। তিনি রাণীর আসন্ন বিয়োগ ব্যাথায় বাকরুদ্ধ তিনি। এতক্ষণ রাজসভার এক কোণে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকা সেই বৃদ্ধ

www.pathagar.com

নাটকীয় এসব দৃশ্য দেখছিলেন। নিজের চোখ, কানকেও বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। তিনিও কাঁদছেন। এবারে এগিয়ে এলেন, বললেন;

'মহারাজ, মাফ করবেন। আমি জীবনের শেষ প্রান্তে এসে একি দেখলাম! বিচারক নিজ স্ত্রী'কে মৃত্যুদণ্ডাদেশ শোনাবার সাথে সাথে একথাটিও বলে দেয় 'তোমাকে আগের মতই ভালোবাসি, তোমার অবর্তমানে আমার জীবন মরুভূমি হয়ে যাবে, সে দুঃখও আমি সইব কিন্তু অবিচার করতে পারব না!'

মহারাজ আমার কলিজার টুকরো, সে তো মরেই গেছে, আর কোনদিনও ফিরে পাব না! কিন্তু মহারাজ আমি এমন ন্যায়বিচারক বাদশাহ, এমন রাণীর জীবনকে মরুভূমি হতে দিতে পারি না। মহারাজ, আমি রাণীকে ক্ষমা করে দিলাম! দয়া করে আপনিও তাঁকে ক্ষমা করে দিন, মহারাজ তার প্রাণ ভিক্ষা দিন। ধন্য এমন ধর্ম, যেখানে আসামি আর বিচারক একই সাথে গলা ধরাধরি করে কাঁদে!'

দু:খের বিষয় হলো, জাহাঙ্গীর বেশী দিন তার এই অবস্থানকে ধরে রাখতে পারেন নি। তবে যে স্বল্পকাল তিনি ইসলামের নিষ্ঠাবান অনুসারী ছিলেন, তারই মাঝে ঘটেছিল এই চিত্তাকর্ষক ঘটনাটি!

চমৎকার তো! সুজির বক্তব্য।

'হ্যাঁ চমৎকার। একবার ভাবোতো আমরা সবাই যদি সত্য, ইনসাফ আর সততার এরকম দর্শনের কাছে জাহাঙ্গীরের মত নিজেদেরকে সপে দিতে পারতাম! কতই না ভালো হতো! কল্পনা করে দেখতো, এই বিশ্বের সকল প্রেসিডেন্ট, প্রাইমিনিষ্টার, রাজনীতিবীদসহ সকল স্তরের মানুষই জাহাঙ্গীরের মত সততা ও ন্যায় বিচারের শিক্ষা আর দর্শনের কাছে নিজেদেরকে সমর্পণ করে দিয়েছে! পৃথিবীটা কেমন হবে তখন? তোমরা একে যে নামেই ডাকো, আমরা এটাকেই বলি 'ইসলাম'।

এই ইসলামকেই তুলে ধরে আলকুরআন। কথা ছিল যে, আমরা মুসলমানরা এটা'কে বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরব আমাদের আচার-আচরণে। জানো, আলকুরআান মানুষকে এভাবেই পরিবর্তিত করে। একটু আধটু নয়, একেবারে আমূল পরিবর্তন! পাথরকে বানায় খাঁটি হীরার টুকরো। পতিতকে উন্নত, ভীরু'কে বীর, ছোটকে বড়, হীনকে মহান! ঘৃণিতকে সম্মানিত! আলকুরআন হলো পরশ পাথর, যার সান্নিধ্যে এলেই যাদুকরী পরিবর্তন হয়, সাধিত হয় বিস্ময়! আর বিস্ময়!

www.pathagar.com

আজকাল পেট আর পকেটের তাগিদেই আমাদেরকে ছুটে বেড়াতে হয় সারা বিশ্বময়। যেমন তুমি এসেছ মেক্সিকো থেকে, মারজুরী গ্রীস থেকে, আর সুষমা তুমি এসেছ ভারত থেকে। তেমনি আমি এসেছি আমার দেশ, বাংলাদেশ থেকে। সবাই কিন্তু একই পেট আর পকেটের তাগিদেই এসেছি এখানে।

যারা অঢেল সম্পদের মালিক তারা সখের বশে দেশ দুনিয়া ছুটেন। কিন্তু আমাদের মত সাধারণ মানুষ আমরা দেশ ছেড়ে বিদেশ বিভূঁইয়ে পাড়ি জমিয়েছি নেহায়েৎই পেটের টানে। এটাই বাস্তবতা। যখন অজানা দেশে পাড়ি দেই তখন মনে কত দুশ্চিন্তা! না জানি কেমন জায়গা, কেমন করে, কিভাবে কাটবে সময়? কি ভাবে চলব? পথ ঘাট চিনব তো? মন্দ মানুষের পাল্লায় পড়ে পথের শেষ সম্বলটুকু, এমনকি নিজের জীবনটাও হারিয়ে বসব না তো!

এরকম শত শত দুশ্চিন্তায় মনটা সারাক্ষণ আচ্ছন্ন থাকে। নতুন জায়গার পথ ঘাটও চিনি না, পথ হারাবার আশংকাও থাকে মনের কোণে। তাই আমাদের পকেটে থাকে ট্রাভেল গাইড' একটা রোড ম্যাপ বা এই জাতিয় কিছু! আমরা এরকম একটা রোডম্যাপ রাখি, রাখতে বাধ্য হই নিজেদের প্রয়োজনেই।

তুমি, আমি, আমরা যখন নিউক্যাসল থেকে লন্ডনে যাই, তখন কিংস ক্রস স্টেশনে নেমে আগে একটি 'লন্ডন সিটি গাইড' চোখের সামনে খুলে ধরি। পথ চলতে সবসময় তা হাতে না রাখলে পথ হারাবার একশতভাগ সম্ভাবনা থাকে! আর একবার পথ হারালে স্বল্পতম সময়ের যাত্রাটি পুরোটাই মাটি, পুরোটাই বিফল!

বিষয়টাকে এভাবে ভেবে দেখ, অনেকটাই সহজ হবে বুঝতে। আমরা মানুষ, আমাদের অজানা অচেনা এই বিশ্বে যেমন সাধু থাকেন, তেমনি শয়তানেরও বাস এখানেই। কেমন করে তাদের চিনব? এখানে পথের বাঁকে বাঁকে রয়েছে অজানা, অচেনা ফাঁদ। প্রতি পদে পদেই রয়েছে ফাঁদ। জীবন চলার পথে সেইসব ফাঁদে পড়ে অনেকের জীবনটাই মাটি হয়েছে! এই বিশ্বে 'জীবন' নামের স্বল্প সময়ের যাত্রাবিরতীর পুরো সময়টাই বরবাদ হয়েছে।

স্বল্প সময়ের যাত্রা বিরতি? আমরা কি তাহলে দুনিয়ায় যাত্রা বিরতি করছি? দুনিয়াটা তা হলে আমাদের আসল ঠিকানা নয়? বিশ্বের প্রতিটি সুস্থ মানুষই জানেন, দুনিয়া ছেড়ে মানুষকে চলে যেতে হয়! প্রতিনিয়তই মানুষ জন চলে যাচ্ছে। আমাদের অনেকেরই বাবা-মা, স্বামী-স্ত্রী, পুত্র-কন্যা, ভাই-বোন দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছেন। এটা এমনই এক নিত্যঘটিত বিষয় যে, আস্তিক বা নাস্তিক কেউই তা অস্বীকার করে না।

www.pathagar.com

প্রশ্ন থাকে মরার পরে এরা যায় কোথায়? মৃত্যুর আগে দুনিয়ার এই জীবনে কি ভাবে চললে স্বল্পকালীন এই অবস্থান কালটি সফল এবং বিপদমুক্ত থাকবে সে ব্যাপারে যেমন প্রশ্ন রয়েছে, তেমনি এ প্রশ্নও রয়েছে যে, এখান থেকে মানুষ চলে যায় বটে, তবে যায় কোথায়? কেন যায়? এবং সেখানেও কি কোন জীবন আছে? থাকলে তার রুপ কি? আর পরিধিই বা কতটুকু?

এরকম কত প্রশ্ন মানুষের মনে আনাগোণা করে। দুর্বল মানুষ এসবের উত্তর জানে না। তার নিজের জ্ঞানের উপরে ভিত্তি করে কোন অকাট্য উত্তর সে বের করতে পারে না। সে জানে না বিশ্বের কোন পথে কিভাবে চললে সে নিরাপদ থাকবে, ব্যর্থ হবে না। সে এটাও জানে না যে, বিশ্বের এত লোক, এত বস্তু, কোনটি তার জন্য উপকারী? আর কোনটির মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে তার অকল্যাণ, তার সর্বনাশ!

তাই প্রত্যেকের জন্যই একটি গাইড বুক দরকার, যা কেবল একটি ট্রাভেল গাইডের কাজই করবে না বরং পুরো জীবনের প্রতিটি কর্মকান্ডের ক্ষেত্রে গাইডের কাজ করবে। জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এবং এই জীবনের পরেও যদি কোন জীবন থাকে, সে জীবনেও তাকে সফলতা দেবে। সবারই এমন একটা গাইড বুকের প্রয়োজন কেউই অস্বীকার করে না। আমার বিশ্বাস তোমরাও তা করবে না।

আমার এবং বিশ্বের প্রতিটি মুসলমানের দাবী ও বিশ্বাস, সর্বোপরি আমাদের সৃষ্টিকর্তা, আমরা বলি আল্লাহ, তোমরা বলো গড, আর সুষমা বলেন ভগবান, সেই আল্লাহরও দাবী, আলকুরআন হলো সেই গাইড বুক।

এমনই গাইডবুক, যেটি সাদা-কালো, নারী-পুরুষ সবার জন্যই পরিপূর্ণ নির্দেশক হিসেবে কাজ করার ক্ষমতা, যোগ্যতা রাখে। এটা সর্বকালের জন্য এবং সর্বক্ষেত্রে কার্যকর। এটা যেমন দুনিয়ার জীবনের জন্য, তেমনি মৃত্যুপরবর্তি জীবনের জন্যও একটা গাইড বুক। কখন পুরোনো হবে না, সংশোধনীরও প্রয়োজন পড়ে না। এটা পরিপূর্ণ গাইডবুক যা মানুষকে দিক নির্দেশনা দেয় যুগ যুগান্তর থেকে কাল কালান্তর। যদি কখনও সময় পাও, যদি চাও, তবে এটাকে কি একবার ভালো করে বুঝে বুঝে পড়ে দেখবে না?

একবার কুরআনের বাণীটাকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করে দেখতে পার। এ ব্যাপারে কোন সহযোগিতা বা কুরআনের একটা কপি পেতে চাইলে আমি প্রস্তুত। আর আমি না থাকলেও যে কোন মুসলমানকে বলে দেখ, সে তোমাকে তোমার নিজের ভাষায় কুরআনের কপি বিনে পয়সায় তোমার বাড়ীতে পৌছে দেবে আর নিজেকে কৃতার্থ

www.pathagar.com

ভাববে। বিশ্বাস না হয়, একটাবারের জন্য কোন মুসলমানের কাছে কুরআনের একটা কপি চেয়েই দেখ!

হয়ত বলবে, কুরআন বুঝতে পারবে না। কিন্তু জান, বিশ্বে এই কুরআনটাই বোঝা সবচেয়ে সহজ। এটা মানুষের জন্য তার বোধগম্য ভাষা, ভাব ও আবেগে রচিত, যেন তারা সহজেই বুঝতে পারে। আল্লাহ কুরআন বোঝা সহজ করে দিয়েছেন। বলেছেন; 'লাকাদ্ব ইয়াস্‌সারনাল কুরআনা, ফা হাল মিন মুজ্জাক্কির ? অর্থাৎ: আমি কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি, আছে কি কেউ এ থেকে উপদেশ নেবে? শিক্ষা নেবে?

আট

ছিয়াত্তর বসরের এক আমেরিকান বুড়ি, এ বয়সে তার বসে বসে ঝিমোনোর কথা, অথচ তিনি এই বয়সেও কুরআন শিখছেন! তার এক স্বাক্ষাৎকার শুনে জানলাম, আশে পাশে সবাই মুসলমান হচ্ছেন এক এক করে, তখন তিনি কেন পেছনে পড়ে থাকবেন? কেবল কি এই কারণেই যে, তার বয়স ছিয়াত্তর বসর এবং তিনি একজন নারী?

তা হবে না। তাই বুড়ো বয়সেই জানার চেষ্টা থেকে ইসলাম কবুল করে আজ তিনি মুসলমান। বয়সের ভারে কথা জড়িয়ে যাচ্ছে তার পরেও কি উদ্দিপ্তা তিনি তার নতুন ধর্মের জন্য! এ বয়সেও আরবি শিখছেন! সাক্ষাৎকারে বললেন, মুসলমানরা যেন বুক ফুলিয়ে বিশ্বকে ইসলাম জানায়!

কুরআন বোঝা যে সহজ তার একটা উদাহারণ, ২০০৮ সালে জার্মানির ঘটনা। একজন বখাটে গ্যাংস্টার জার্মান যুবক একটা ইসলামি সেন্টারের পাশ দিয়ে হাটছে। ঐ সেন্টারে তখন কয়েকজন শিশু বসে কুরআন পড়ছিল। হঠাৎ করেই তাদের কুরআন পড়ার দিকে যুবকের দৃষ্টি আকর্ষিত হলে ক্ষণিকের জন্য দাঁড়িয়ে বাচ্চাদের কণ্ঠে এক দূর্বোধ ভাষায় (তার কাছে) কুরআন পড়া শুনতে থাকে।

সেখান থেকে আর তার পা উঠেনি। বখাটে যুবকটি ওখানেই দাঁড়িয়ে কুরআন শুনেছে আর কেঁদেছে। কেন কেঁদেছে? নিজেও জানে না। যুবকটির ইসলাম গ্রহণের কাহিনী ও স্বাক্ষাৎকার জার্মান ডয়েশল্যান্ড টিভি'র বদৌলতে কোটি কোটি দর্শক দেখেছে, আমিও দেখেছি। তার মুখে শুনেছি কুরআন কিভাবে তাকে চলতি পথে আটকে

www.pathagar.com

দিয়েছে! কুরআন শুনে কেঁদেছে! যদিও বোঝেনি কেন কাঁদছে? বড় আবেগঘন স্বাক্ষাৎকার! তোমরাও চাইলে তা দেখতে পার। এখনও ইন্টারনেটে অনুষ্ঠানটি রয়েছে!

ইসলাম কি? সাংবাদিকের এমন প্রশ্নের উত্তরও দিয়েছে দারুণ 'আল্লাহর ইচ্ছা আর নির্দেশের কাছে আমার সকল ইচ্ছা-অনিচ্ছা, সকল চাওয়া-পাওয়াকে সমর্পিত করাটা ইসলাম' এটাই আমার ইসলাম।' কি অবাক কান্ড, একজন বখাটে জার্মান যুবক, যে ক'দিন আগেও বখাটেপনা করে বেড়িয়েছে মদ, মারিজুয়ানা আর মেয়ে নিয়ে। পুলিশের খাতায় যার পরিচয় একজন বখাটে হিসেবে, সে'ও মাত্র ক'দিনেই ইসলাম শিখেছে! জেনেছে আর বুক ফুলিয়ে তা বিশ্বকেও জানাচ্ছে!

অথচ আমরা মুসলমানরাই জানি না, ইসলাম কি? সে আমাদের কাছে কি চায়? আমরা আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণ করেও, অবাধ্য হয়েও এক একজন 'আল্লামা'! এক একজন মুজাদ্দেদ আর হাদিয়ে মিল্লাত! যদিও নিজেরই হেদায়েতের কোন খবর নেই! আসলে কি জান? কুরআন থেকে শিক্ষা নিলে তা ব্যক্তির জীবনকেই বদলে দেয়। বদলেছিল জাহাঙ্গীরকেও। কিন্তু দুর্ভাগ্য, তিনি পরিবর্তনটাকে ধরে রাখতে পারেন নি। পারলে ভালো হত।

ভালো হত নিজের জন্য, ভারতবাসীর এবং বিশ্বমানবতার জন্যও। ভারতের ইতিহাস হতো ভিন্নতর। ভারতের মানুষগুলো এক একজন হয়ে উঠত তাজমহলের মতই বিস্ময়কর। তোমরা ভারতে যেতে চাইছ তাজমহল দেখতে? তখন কিন্তু এই আমাদের কথা-বার্তায়, আচার-আচরণে, কাজ-কর্মেই দেখতে তাজমহলের বিস্ময়। দেখতে কুরআনের বিস্ময়। মানো বা না মানো, কুরআনই হলো বিশ্বের সবচেয়ে বড় বিস্ময়। আমি মুসলমান বলেই কথাটা বলছি না। কথাটা অনেকেই বলেছেন, বলবেনও আগামীতে।

আমাকেও বড় দৃঢ়তার সাথে একজন বলেছিলেন কথাটা। যিনি বলেছিলেন, তিনি তোমাদের মতই একজন অমুসলিম ছিলেন, ছিলেন খৃস্টান পাদ্রী। যখন তিনি জানতে ও বুঝতে পারলেন কুরআনকে, এই বিস্ময়টাকে। তখন তিনি চিরদিনের মত বদলে গেছেন। ওদের বললাম আব্দুল্লাহ স্পিরিটোর কথা। ওরা সকলেই বসে বসে বড় আগ্রহ আর মনযোগের সাথে শুনলেন।

কুয়েতের কেন্দ্রস্থলে মোল্লাহ সালেহ মসজিদের বেসমেন্ট ও ফার্স্ট ফ্লোর জুড়ে ইসলাম প্রেজেন্টেশন কমিটি বা আই পি সি'র অফিস। কুয়েতে বসবাসকারী উৎসাহী অমুসলিম

www.pathagar.com

জনসাধারণের কাছে ইসলাম তুলে ধরার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানটি অত্যন্ত সফল। সমগ্র মধ্যপ্রাচ্য জুড়ে এটি একটি অনন্য শিক্ষাকেন্দ্র।

এখানেই পরিচয় হয়েছিল প্রৌঢ় নওমুসলিম, ইসলাম প্রচারক আব্দুল্লাহ স্পিরিটোর সাথে। একজন পাদ্রী থেকে ধর্মান্তরিত মুসলমান, এখন ফুলটাইম ইসলাম প্রচারক আব্দুল্লাহ'র সাথে বেশ ক'বসর ঘনিষ্ঠতাও ছিল। পরিচয়ের শুরুর দিকে বেসমেন্ট ফ্লোরে তার অফিসে বসে কথা প্রসঙ্গে একবার বলেছিলেন;

'আল কুরআন হলো এই বিশ্বের সবচেয়ে বড় বিস্ময় এবং একমাত্র বিস্ময়!' কুরআনের একটা কপি তুলে ধরে সেদিন তিনি জোর দিয়ে, আত্মপ্রত্যয়ের সাথেই কথাটা বলেছিলেন। তার কথায় ছিল প্রচণ্ড আবেগ আর বিশ্বাস! আজ অনেক দিন পরে এসে তার সেদিনকার সে কথাটা মনে পড়ছে আবারও।

আসলেই তো তাই। পৃথিবীর বড় বড় বিস্ময়গুলো দেখতে মানুষকে বিশ্বের কোণে কোণে ছুটতে হয়। যেমন তাজমহল দেখতে ভারতে, মস্কোর ঘন্টা দেখতে রাশিয়ায়। পিরামিড দেখতে মিশরে, যা সবার পক্ষে সব সময় সম্ভবও নয়। বরং বিশ্বের অধিকাংশ মানুষের পক্ষেই সারা জীবনেও সম্ভব নয় বিস্ময়গুলো চোখে দেখে আসা। অথচ চোখে না দেখেও তারা বিশ্বাস করে ঐগুলো বিশ্বের বিস্ময়! যদিও তাদের পক্ষে প্রমাণ করা সম্ভব নয়!

এসবের কোন একটিও মানুষের সামনে চ্যালেঞ্জও ছুড়ে দেয়নি যে, সেগুলোই সবচেয়ে বড় বিস্ময়, তাদের দ্বিতীয় কোন জুড়ি নেই! তারা চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে বলেনি যে 'যদি বিশ্বাস না করো তবে তোমরা আমার মত একটা বানিয়ে দেখাও দেখি!' এরকম চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেবার মত আত্মবিশ্বাস ওগুলোর সৃষ্টিকর্তা ব্যক্তি, জাতি বা গোষ্ঠির ছিলও না।

কিন্তু এর বিপরিতে আল কুরআন প্রকাশ্যে এবং সর্বকালের সকলের কাছে উন্মুক্ত ঘোষণা দিয়ে রেখেছে, কুরআন একক ও অদ্বিতীয় এবং এর কোন জুড়ি নেই। সমগ্র কুরআন'তো দুরের কথা, এর ছোট একটা সুরার মত সুরা রচনা করে দেখাতে সমগ্র মানব সম্প্রদায়ের কাছে প্রকাশ্যে চ্যালেঞ্জ দিয়ে রেখেছে দেড় হাজার বসর ধরে! আজও তা উন্মুক্তই রয়েছে, বিশ্বের শেষ দিনটি পর্যন্ত তা একইভাবে বহাল থাকবে।

দেশে দেশে কত লেখক, সাহিত্যিক, কবি, প্রাবন্ধিক, ঐতিহাসিক, কলামিষ্ট, ভাষাবীদের জন্ম হলো, এবং তারা গতও হয়ে গেলেন। কতজনে কতরকম সাহিত্য

www.pathagar.com

রচনা করে বিশ্ব ইতিহাসে নিজেদের স্থান করে নিলেন! কত পুরস্কার, যশ খ্যাতি অর্জন করলেন!

কিন্তু অবাক কাণ্ড, কোন একজন সাহিত্যিক, লেখক, ভাষাবিদ, কারুরই সাহস হলো না যে, তারা এগিয়ে এসে কুরআনের চ্যালেঞ্জটুকু গ্রহণ করবেন। সমগ্র আল কুরআনের সবচেয়ে ছোট সুরার মত একটি সুরা রচনা করে দেখাবেন, বিশ্বে অমর হয়ে রইবেন! এটাও একটা বিস্ময়ই বটে!

আল কুরআন এরকম কত বিস্ময়ের জন্ম দিয়েছে! পতিতকে তুলেছে সম্মানের উচ্চ শিখরে। অধ:পতিত, হতদরিদ্র জাতি কুরআনকে আঁকড়ে ধরায় তাদেরকে স্বল্পতম সময়ে তুলেছে সাফল্যের কল্পনাতীত স্তরে। নীচ ও অপমানিতকে করেছে মর্যাদাবান ও মহিমান্বিত! দূর্ভাগাকে করেছে সৌভাগ্যবান! অখ্যাতকে খ্যাত, ভীরুকে করেছে বীর, গরীবকে সম্পদশালী, কৃপণকে দানবীর, রাখালকে বাদশাহ, বাদশাহকে ফকীর! যেন এক যাদুর পরশ! ইতিহাস ঘাটলে দেখবে এমন হাজারো ঘটনা, হাজারো বিস্ময় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে!

ঘর পালানো পারস্যের দাস, হযরত সালমান ফারসী (রা:) কিংবা আবু জেহেলের কৃতদাস আম্মার (রা:) অথবা পাহাড় আর রুক্ষ মরূভূমির প্রান্ত জুড়ে উট চরাণোতে নিয়োজিত রাখাল যুবক ওমর (রা:), অথবা হাবসী ক্রীতদাস বেলাল (রা:) এর কথা ভাব, তৎকালীন সমাজে এসব ব্যক্তিদের এমন কি বৈশিষ্ঠ ছিল যে, তারা সমাজে বিশেষ কোন মর্যাদা আর বৈশিষ্টের দাবী করতে পারতেন? বেশীর ভাগই তো ক্রীতদাস, মনীবদের হুকুম শুনে লাঞ্ছনা, গঞ্জনা সয়েও যাপন করতেন মানবেতর জীবন!

এই তারাই যখন কুরআনের কাছে নিজেদের সমর্পণ করলেন, কুরআনের রং'এ রাঙালেন নিজেদের অন্তর, তখনই ঘটল বিস্ময়! এক বিপ্লব! নিমেষেই তারা হয়ে উঠলেন খ্যতিমান, বিখ্যাত! এইসব অবহেলিত, নিগৃহীতরাই হয়ে উঠলেন সম্মানিত! তাঁরা এমন অবস্থানে উন্নীত হলেন যে, তাদের সে অবস্থানে কোনদিনও কোন মানুষ কখনই, কোনভাবেই পৌছুতে পারবে না!

কেবলই কি তাই? তাদের জীবনাবসানের দেড় হাজার বসর পর আজও বিশ্বের দেড়শত কোটি মুসলমান এইসব সম্মানিত ব্যক্তির নাম শোনার সাথে সাথে তাদের কল্যাণ চেয়ে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে! অথচ তারা কেউ এইসব মুসলমানদের

www.pathagar.com

পরিচিত বা আত্মীয়ও বা পাড়া প্রতিবেশী নন। তার পরেও কি সম্মান! শ্রদ্ধা, ভক্তি, না দেখা মানুষগুলোর জন্য!

মক্কা মদীনায় হজ্জ ওমরাহ'র জন্য বিশ্বের কোণা কোণা থেকে প্রতিদিনই মুসলমানরা যাচ্ছেন, এসব লক্ষ লক্ষ মুসলমান তাদের কাজ শেষে এইসব সম্মানিত সাহাবীদের কবর দেখতে যান, তাদের মাগফেরাত কামনা করেন! আমি নিজের চোখে বদর, ওহদ, খন্দক, খাইবার, জান্নাতুল বাকি কবরস্থানে বিশ্বের বিভিন্নস্থান থেকে আসা মুসলমানদের এদের জন্য দোওয়া করতে, আল্লাহর কাছে কাঁদতে দেখেছি!

'পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে যেখানেই সাহাবীদের কবর রয়েছে, যেমন মিশরের কায়রো, সিরিয়ার দামেস্ক, চীনের ক্যান্টন প্রদেশ, ইরাকের বাগদাদ, কারবালা, তুরস্কের ইস্তাম্বুল, সাইপ্রাস সবখানে' এর পরে মারজুরীর দিকে ফিরে তাকে উদ্দেশ্যে করে বললাম; 'এমনকি তোমাদের গ্রীসেও, যেখানেই প্রফেট মুহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ সঃ এঁর সঙ্গী সাথীদের কবর আছে, সেখানেই একই চিত্র! এ কি কম বিস্ময়কর ঘটনা?

তোমরা যদি এর গ্রহণযোগ্য জবাব খুঁজতে যাও, তবে দেখবে এসবের একটিমাত্র কারণ, তা হলো 'আল কুরআন'। একমাত্র আল কুরআনই! দেড় হাজার বসর পূর্বে গত হয়ে যাওয়া মানুষগুলোর জন্য মুসলমানদের যে ভালাবাসা, যে শ্রদ্ধা, যে ভক্তি, আর সম্মান, তা একমাত্র এই কারণে যে, ঐসব ব্যক্তিবর্গ কুরআনের প্রকৃত ও একনিষ্ঠ অনুসারী ছিলেন।

শুধু অনুসারী নয়, বরং তারা এই বিস্ময়কর গ্রন্থটির ধারকও ছিলেন। এটিকে নিষ্ঠার সাথে ধারণ করার কারণেই তাঁদের এত মর্যাদা, এত সম্মান, তাঁদের প্রতি মানুষের এত ভালবাসা আর শ্রদ্ধা। এটাকে কী বলবে তোমরা? এটি কী কুরআনের বিস্ময় নয়?

আল্লাহর রাসুল (সঃ) যাঁর কাছে এসেছে কুরআন, সেই তিনিই এটিকে তার সবচেয়ে বড় বিস্ময় বলেছেন। আমরা জানি তার জীবনে অনেক বিস্ময়কর ও চিত্তাকর্ষক ঘটনা ঘটেছিল! তার নিজের হাতে ঘটেছে, তিনি ঘটিয়েছেন কিংবা তাঁকে কেন্দ্র করে ঘটেছে। তার সারা জীবন ঘাঁটলে এরকম হাজার হাজার বিস্ময়কর ঘটনা পাওয়া যাবে, সেগুলোর একটাকেও বিস্ময় বলে আখ্যায়িত করলেন না বরং সব বাদ দিয়ে কুরআনকেই তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ বিস্ময় বললেন!

মানুষ হিসেবে জন্ম নিয়ে, মানুষের মাঝে বাস করে, জ্বীন ও মানুষের জন্য সর্বশেষ নবী ও রাসুল নির্বাচিত হয়ে কুরআনকে নিজের চরিত্রে ধারণ ও তা ইন্দ্রীয়গ্রাহ্যভাবে

www.pathagar.com

ফুটিয়ে তোলাটা ছিল এক অনূপম বিস্ময়। রক্ত মাংশে একজন মানুষ হয়েও কুরআনের মডেল হতে পারাটাই ছিল সবচেয় বড় বিস্ময়।

কেবল নিজেই কুরআনের মডেল হননি, বরং অন্যকেও একই মডেলে সাঁজিয়েছেন। তাঁর আহ্বানে, অনুপ্রেরণায় মাঠের রাখাল, মরুভূমির বেদুঈন ডাকাত, শরাবে মাতাল মদ্যপ, পেশাদার খুনী যিনিই কুরআনকে আঁকড়ে ধরেছেন, তিনিই পরিণিত হয়েছেন একজন স্বপ্নপুরুষে! হয়েছেন কালজয়ী বিস্ময়!

কিভাবে, কেন? প্রশ্ন যদি কর, আর নিরপেক্ষ মনে উত্তর খোঁজ, যদি বিবেক আর যুক্তির সাথে প্রতারণা না কর, তবে দেখবে, এর কারণ, কুরআনের শিক্ষা! এই 'গাইড বুকে'র শিক্ষাকে যাঁরা মেনেছেন, তারাই সফল। এমনই সফল যে, প্রত্যেকেই একটা বিস্ময়! একটা ইতিহাস!!

স্বয়ং আল্লাহ পাকই তাঁকে মডেল হিসেবে বাছাই করেছেন, গড়েছেন, পদে পদে গাইড করেছেন। তিনি কুরআনের ধারক, বাহক, এবং সরকারী ব্যাখাদাতা হয়ে সম্মানিত হয়েছেন আকাশে, জমিনে সর্বত্র।

তিনি কুরআন পেয়ে পরিতৃপ্ত ও কৃতজ্ঞ ছিলেন আল্লাহর কাছে। আল্লাহর আনুগত্যের বিষয়ে তাঁর সমকক্ষ হতে পারবে না কেউই! এও এক বিস্ময়, যা সম্ভব হয়েছে আরও বড় বিস্ময় কুরআনের কারণেই। এই বাস্তবতাই ফুটে ওঠেছে কুরআনকে তাঁর সবচেয়ে বড় বিস্ময় বলা এবং এর দ্বারা সম্মানিত হবার মধ্য দিয়ে! কুরআন পাক'এ আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন নিজেই বলেছেন, তাঁর প্রিয় হাবিবের উদ্দেশ্যে;

'মা আনজালনা আলাইকাল কুরআনা লি ত্বাশক্বা অর্থাৎ; আমি এই জন্য তোমার উপরে কুরআন নাজিল করিনি যে, এর কারণে তুমি বিপদে পড়ে যাবে, তোমার জীবন অশান্তিময় হয়ে উঠবে'। কুরআন মূলত এসেছে; **'লি ইউখরিজাকুম মিনাজ জুলামাতি ইলান্ নুর'** অর্থাৎ: তোমাদেরকে (এর অনুসারীদেরকে) অন্ধকার জীবন থেকে উজ্জল জীবনে টেনে আনার জন্যই কুরআন নাজিল করা হয়েছে।

কে না বোঝে যে, এখানে আঁধার অর্থে, অজ্ঞানতা, অভাব-অনটন, অপমান জিল্লতি, দু:খ-কষ্টকে এবং উজ্জলতা বলতে সুখ, স্বাচ্ছন্দ, শান্তি-স্থিতি, নিরাপত্তা-প্রগতি, সম্মান ও উত্তরণ, এক কথায় সার্থক ও সফল জীবনকে বোঝানো হয়েছে! অথচ এই আঁধারই আজ আমাদেরকে, কুরআনের ধারক হওয়া সত্তেও মুসলমানদের সমাজ ও জীবনকেও ঘিরে রেখেছে!

www.pathagar.com

এরকম আঁধারে বাস করেও কেউ যদি কুরআনের শিক্ষাকে মেনে তার কাছে আত্মসমর্পন করে, তবে সে আর আঁধারের বাসিন্দা থাকে না, বরং আলোর জগতে তাঁর উত্তরণ ঘটে, জীবন হয় পরিবর্তিত। আসে স্থিতি, মনোজগতে শান্তি, আর ভূষণে, ভাঁষণে প্রজ্ঞাময় ব্যক্তিত্ব! প্রমাণ তোমাদের সামনেই আছে।

নয়

ফারিহা তোমাদের সামনেই রয়েছেন, তাই তোমরা তাকে দেখছ। কিন্তু এরকম ফারিহা এই ব্রিটেনের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে আছে। তাদের সংখ্যা প্রতিদিনই বাড়ছে, বাড়ছে তোমাদের ধারণারও বাইরের গতিতে। এরা কেউই বাইরের নয়, তোমাদেরই লোক। তোমাদের কারো বোন, কারো বা বাবা, কারো মা, বা ভাই, কিংবা বন্ধু বান্ধব।

গেল বসর ২০০৯ সালে চল্লিশ হাজার ব্রিটিশ ইংরেজ মুসলমান হল, তারা তোমাদের কেউ নয়? লিডস ইউনিভার্সিটির ছাত্রী Lotifa Racher Ford তোমাদেরই একজন, Abdur Rahaman Green এঁরা তোমাদের লোক নন? তোমাদেরই একজন মেরেলিন মরিংটান। নিখাঁদ ইংলিশ। রক্তে মাংশে, মন মননে, চিন্তা-চেতনায় ইংলিশ, ঠিক তোমার মতই একজন নারী, মিসেস মেরেলিন মরিংটন, যিনি 'নারীর প্রতি বৈষম্য ও নির্যাতন প্রতিরোধ' সংক্রান্ত ব্রিটিশ সরকারের বিশেষ কমিটির সম্মানিত সদস্যা ও একজন জেলা জজ, সেই তিনিই সম্প্রতি ইসলাম মুসলমান হয়েছেন।

ইসলাম নারীর প্রতি অবিচার করে, নির্যাতন করে, বৈষম্যপূর্ণ আচরণ করে, তোমরা যারা এমনতর অপপ্রচারে একমত পোষণ কর, তারা ইচ্ছে করলে এই ইংলিশ জজ মিসেস মরিংটনের স্বাক্ষাৎকার থেকে শিক্ষা নিতে পার। মনে রাখতে হবে যে, তিনি নারীর প্রতি বৈষম্য ও নির্যাতন রোধ সংক্রান্ত ব্রিটিশ সরকারের প্রভাবশালী আইন প্রণেতা, রিভিও কমিটিরও সদস্যা। ব্রিটিশ সরকারের অতি উচ্চস্তরেও পরিচিতা!

Rugby Islamic Centre এর প্রতিষ্ঠাতা, পদার্থবিদ ও বৈজ্ঞানিক Omer Dexter কি তোমাদের লোক নন? তারা কি তোমাদের মত ইংলিশ পরিবারে, এই আবহাওয়ায়, এই আলো-বাতাস আর মাটিতে বড় হননি? তোমাদের একজন হয়েও তাদের মধ্যে আজ যে ভিন্নতা, যে বৈচিত্রতা, যে পরিবর্তন, তা কেবল ঐ কুরআনের কারণেই। কুরআনই তাঁদের বদলে দিয়েছে।

www.pathagar.com

মাত্র ১৭ বসরের তরুণ, এক কালের James আজ Omer Farouq লন্ডনের Hyde Park এ সারাদিন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পথচারীদের ইসলামের কথা শোনায়, ইসলামের দিকে ডাকে। তরুণটি এতটাই সাবলীল ও সপ্রতিভ যে, বুক ফুলিয়ে ইসলাম সম্বন্ধে পথচারীদের প্রশ্নের জবাব দিচ্ছে, কুরআন, হাদিস, সাইন্স, ইতিহাস থেকে রেফারেন্স টেনে টেনে বক্তব্য দিচ্ছে ঐ পার্কের মধ্যেই, ঘন্টার পর ঘন্টা!

চেহারায় এখনও শিশুসুলভ একটা ভাব, তাকেই ঘিরে প্রকাশ্যে পার্কের মধ্যে লোকজন ভীড় করে জানছে ইসলাম কি? যার খুশী সে শুনছে, কেউ বা মুখ ফিরিয়ে চলেও যাচ্ছে। কিন্তু তার ভ্রুক্ষেপ নেই। এরা প্রত্যেকে এক একটা বিস্ময়। কুরআনের কারণেই তাঁরা এক একজনে বিস্ময়ে পরিণত হয়েছে। এদেরই একজন ঐ ফারিহা।

আসলেই তো, আমার বলা কথাগুলোর একেবারে স্বাক্ষাৎ ও জলজ্যন্ত প্রমাণ হলেন এক কালের ফিওনা থোমাস, আজকের ফারিহা থোমাস। জেমা ডিকিনসন্স, মেলানি জনসন, ক্যাথরিণ দ্যবরোস্কা আর মারজুরি কণ্ডাকোসদেরই একজন ফারিহা।

পেশায় সোস্যাল ওয়ার্কার। বাবা-মা'সহ তঁর পূর্ব পুরুষরা শত শত বসর ধরে এখানে বসবাস করে আসছেন। মূল ধারার ইংরেজ। তার জন্ম, লেখা-পড়া, শৈশব কৈশোর, বেড়ে ওঠা, চাকুরী এবং নিবাস এখানেই! আর দশজন ইংলিশ ছেলে মেয়ের মতই জীবন কেটেছে! আলাদা কোন বৈশিষ্ট ছিল না! কিন্তু কুরআনের সান্নিধ্য, আর শিক্ষাই ফিওনাকে আজ আলাদা করেছে। করেছে ফিওনা থেকে ফারিহা!

ব্যক্তির মন মানসকে যদি ইসলামি মুল্যবোধে বিচার করতে হয়, তবে প্রথম দেখা দরকার ব্যক্তির মন মানসে কতটা আল্লাহভীতি জায়গা করে নিয়েছে বা আদৌ নিয়েছে কি না, সেটি। পরিবর্তনের ধারা এখান থেকেই শুরু এবং যেকোন অর্থবহ পরিবর্তনের সূচনাও হয় ব্যক্তিমানসে আল্লহভীতি জায়গা করে নেবার মাধ্যমে। ইসলামে এটাকেই বলা হয় 'ত্বাক্বওয়া' এটাই হল পরহেজগারী বা আল্লাহভীতি।

এটা সেই অনূঘটক যা ব্যক্তিজীবনে অন্য সকল পরিবর্তনের সূচনা ঘটায়। তার সকল কাজ-কর্ম, ব্যক্তি, পরিবার,সমাজ, জাতি ও দেশ সকলের সাথে তার সম্পর্ককেও নিয়ন্ত্রণ করে। চাল-চলন, আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে তার ভেতর, বাহির সাজায় নতুন সাজে। এ কারণেই কুরআনে ত্বাকওয়াকে একটি পোষাকের সাথেই কেবল তুলনাই করা হয়নি বরং সর্বোত্তম আচ্ছাদন হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে।

www.pathagar.com

এই ত্বাকওয়া বা আল্লাহভীতিরই উদ্রেক হতে দেখেছ তোমরা সম্রাট জাহাঙ্গীরের মনে। এই ভীতিই তাকে ন্যায় বিচারের মাধ্যমে নিজ স্ত্রীকে প্রাণদন্ডে দন্ডিত করতে বাধ্য করেছে, যদিও নিজেই স্ত্রীর বিয়োগ ব্যাথায় কেঁদেছেন রাত্র ঘোষণার কালে।

এভাবেই বিশ্ব ইতিহাস বার বার প্রমাণ করেছে, যে বা যাঁরাই কুরআনকে আঁকড়ে ধরেছে, কুরআন তাঁকে বা তাঁদেরকেই বদলে দেয় সাফল্য, সুখ আর সমৃদ্ধির পথে। এর নিষ্ঠাবান অনুসারীকে চূড়ান্ত মঞ্জিলে পৌঁছে দেয়! বিশ্বে তাদেরকেই প্রভাবশালী বানিয়ে নেতৃত্বের আসনে বসায়, জীবনের প্রতিটি বাঁকে পথ দেখায় কুরআন। ফলে তাঁরা পুরো মানব সম্প্রদায়কে, পুরো সমাজকে নেতৃত্ব দেবার যোগ্যতা অর্জন করে।

মারজুরী আর সুষমার চোখে একরাশ প্রশ্ন! আমি তাদেরকে কুরআনের ধারক, বাহক হলে সফলতা আর সমৃদ্ধির কথা শুনাচ্ছি, এর অনুসারীদের প্রভাবশালী হবার কথা শোনাচ্ছি! এমন সময়ে, যখন তারা চারিপাশে কুরআনের অনুসারীদের নিগৃহীত, পদদলিত হতে দেখছে! কেমন বেমানান কথা!!

বেমানান, তা জানি। জেমা, মারজুরী আর সুষমা যেন প্রতিবাদে কিছু একটা বলার জন্য মুখিয়ে আছে। একমাত্র মেলেনি জনসনই গভীর মনযোগের সাথে শুনছে কথাগুলো। এরই মাঝে কখন দরজার এক কোণা ঘেষে ফারিহা এসে দাড়িয়েছেন, টেরই পাইনি। ঘরে সোফা থাকতেও তিনি এক কোণে দেয়ালের সাথে হেলান দিয়ে ঠাঁই দাঁড়িয়েই রইলেন। ওরা কেউ মুখ খোলার আগেই আবার শুরু করলাম;

'এ বাস্তবতার আলোকে প্রশ্ন জাগে মনে, বিশ্বের দেড়শত কোটি মুসলমান, যারা কুরআনের ধারক, অনুসারী'র দাবীদার, তারা কেন গঞ্জনা, লাঞ্ছনা আর জিল্লতির গভীরে ডুবে আছে? আজ কেন তারা পথ হারা উদ্ভ্রান্ত, দিশাহীন? বিশ্বজুড়ে কেন নিগৃহীত, পদদলিত ? কেন তারা বিশ্বকে পথ দেখানোর পরিবর্তে নিজেরাই পথহারা? শাসকের আসন হারিয়ে নির্মমভাবে শাসিত হচ্ছে? অথচ আল্লাহ'র ঘোষণাতো এমন ছিল না। এমন হলো কেন?

মৌলিক প্রশ্ন। উত্তরও রয়েছে হাতের কাছেই, কুরআনের প্রথম চ্যাপ্টারে সুরা বাক্বারা'র ৮৫ নাম্বার আয়াতটি পড় এবং ভাব। সত্যিই কুরআনের সাথে মুসলমানদের ব্যক্তিগত বা সামষ্ঠিক, সামাজিক বা রাষ্ট্রিয়, প্রকাশ্য বা পরোক্ষ সংশ্লিষ্ঠতা 'কিছু মানা আর কিছু না মানা' ষ্টাইলের কি না?

www.pathagar.com

আমি নিশ্চিত, তুমি যদি সচেতনভাবে কুরআন পড় এবং নিজের সাথে প্রতারণা না কর, তবে স্বীকার করবে, আমরা মুসলমানরা প্রত্যেকেই একক বা সামষ্টিক, ব্যক্তিগত বা সামাজিক প্রতিটি ক্ষেত্রেই কুরআনের সাথে সুবিধাবাদী ভূমিকা পালন করছি।

এর অনিবার্য পরিণতিতে আমরা মুসলমানরা অপমান, জিল্লতি, লাঞ্ছনা আর গঞ্জনায় নিপতিত শতাব্দী ধরে। কুরআনের নির্দেশ মেনে আল্লাহর দাসত্বে নামিনি বলে পুরো বিশ্বের দাসত্ব করতে হচ্ছে আমাদের! আর আখেরাতে আমাদের অবস্থান? সে জবাবও উক্ত আয়াতেই সুস্পষ্টভাবে দেখে নিতে পার।

খেয়াল করলে দেখবে, আজও যাঁরা কুরআন রুপি এই গাইডবুকের কাছে আশ্রয় নিচ্ছেন নিষ্ঠা আর আন্তরিকতার সাথে, এর বিধানকে মেনে চলছেন, তাঁরা সকলেই এই ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ বিশ্বেও সবচেয়ে সুখি আর সফল। তাঁদের পারিবারিক জীবনের মত সামাজিক জীবনও সম্মানের আর সাফল্যের। তাঁদের বাহ্যিক জীবন যেমন শান্ত, সুবোধ, তেমনি তাঁদের মনোজগতও সুখের। তাঁদের সন্তান, সম্পদ সমাজ আর বিশ্বের ত্রাস না হয়ে হয় আশির্বাদ। এসবকিছুই হয় ঐ 'গাইড বুকটি' কারণে।

তবে আজ আমার স্বীকার করে নিতে কোন দ্বিধা নেই যে, শুধুমাত্র আমাদের অর্থাৎ মুসলমানদের কারণেই 'ইসলাম' বিশ্বজুড়ে অবজ্ঞা আর বিদ্রুপের বিষয়ে পরিণত হয়েছে! আমাদের কারণেই বিশ্বব্যাপি একথা প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে, মুসলমানরা সন্ত্রাসী, ইসলাম মানে সন্ত্রাস। কুরআন মানুষকে পশ্চাৎপদ করে রাখে। বিশ্বকে মুসলমানরা কিছুই দেয়নি! ইসলামের কাছে বিশ্ববাসীর কোন দায়বদ্ধতা নেই!

আছে কি নেই, সে বিষয়ে বিশ্ববাসী খুব ভালো করেই জানে। প্রতিটি বিবেকবান মানুষই জানেন, এই কুরআনের কারণেই সে দিনের মুসলমানরা বিশ্বে গুণে-জ্ঞানে, বিত্ত-বৈভবে, শৌর্যে-বির্যে অতুলনীয় হয়ে উঠেছিলেন।

ইসলাম বিশ্বকে কি দিয়েছে তা জানতে হলে তোমাদের ইউরোপের দিকে তাকাতে হবে। ইতিহাসটা ঘেঁটে দেখলে দেখবে যে, আজকের ইউরোপ তথা পশ্চিমা সভ্যতা, যাকে তোমরা 'আধুনিক সভ্যতা' বল, তার পেছনেও রয়েছে ইসলাম আর মুসলমানদের অবদান। সেই অবদানের উপরে ভিত্তি করেই তোমরা গড়েছ তোমাদের সভ্যতা, যা নিয়ে তোমরা গর্বিত। এটা তোমাদেরই কৃতিত্ব। আমরা মুসলমানরা আমাদের অর্জনকে কদর করিনি, ধরে রাখার চেষ্টাও করিনি, তোমরা সেটা করেছ বলেই আজ এগিয়ে রয়েছ। তাতে বরং মানবতা উপকৃতই হয়েছে।

www.pathagar.com

কর্ডোভা আর সেভিল ছিল আজকের স্পেনের অংশ। সে যখন জ্ঞান-বিজ্ঞান, সফলতা, প্রগতি আর সমৃদ্ধির শিখরে, তখন ইউরোপ আমাবশ্যার আঁধারে ঢাকা ভূখন্ড! সমাজ ছিল সামন্তপ্রভূ আর দস্যু তস্করদের অভয়ারণ্য! মূর্খ পাদ্রীরাই সমাজের হর্তা-কর্তা, কিং মেকার! দু'চারজন বিদোৎসাহী, যাঁদের রক্তে ছিল ভ্রমণের নেশা, কালে ভদ্রে যেতেন ইউরোপের বাইরে! তাদেরই দু'একজন পৌঁছেন মুসলিম স্পেনে। হঠাৎ আঁধার থেকে আলোতে বেরোলে যেমন সারাটা চোখ জুড়ে থাকে অস্পষ্টতা, তেমনি এইসব আগন্তকদের চোখকেও ঝলসে দিয়েছিল কর্ডোভার রুপ! বিস্ময়ে হতবাক এইসব নবাগতরা ঘোরের মধ্যে পড়ে যেতেন স্পেনের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, সমাজব্যবস্থা. প্রশাসন, জ্ঞান-বিজ্ঞানে অগ্রগতি, আর আধুনিক জীবন দেখে!

এই 'আজব দুনিয়া'র কথা কল্প কাহিনীর মত তাদের মুখে মুখেই ছড়িয়ে পড়ে ইউরোপ ব্যাপি! ইউরোপীয় রেনেঁসার সুত্রপাতও এই কর্ডোভা থেকেই। তোমরা তোমাদের এই রেঁনেসার জনক বল রজার বেকন'কে। সেই রজার বেকন ছিলেন কর্ডোভারই ছাত্র।

এ পর্যন্তই বলতেই জেমা ব্যস্ততার কারণে উঠে চলে গেলেন। সেই সাথে সুষমাও। তবে ঠাঁই বসে বসে শুনেছেন মেলেনি জনসন আর নওমুসলিম ফারিহা। ফারিহা স্পেনের আল হামরায় গেছেন মুসলমান হবার আগে। আজ জাহারা গার্ডেন ঘুরে ঘুরে দেখেছেন, সে বর্ণনা দিলেন। আমি আর মেলেনি বসে বসে শুনলাম। স্পেনের বিজ্ঞান যাদুঘরে, এমনকি লন্ডন মিউজিয়ামেও স্পেনের মুসলিম বৈজ্ঞানিকদের আবিস্কৃত অনেক যন্ত্রপাতি রয়েছে, তাও জানালেন। তার কথার রেশ ধরেই বললাম;

'এই স্পেন, এই কর্ডোভা এক সময় বিশ্বের আধুনিকতা, সমৃদ্ধি আর জ্ঞান বিজ্ঞানের কেন্দ্রবিন্দু ছিল। ঠিক আজ যেমন ইংল্যন্ড, আমেরিকা বৈশ্বিক জ্ঞান বিজ্ঞানের কেন্দ্রবিন্দু। মুসলমানদের পতনও শুরু হয়েছিল ঐ কর্ডোভা থেকেই। আমরা ভাবি, ফার্ডিনান্ড আর ইসাবেলার আক্রমণ, আবু আব্দুল্লাহর মত কিছু গাদ্দারের কারণে স্পেনের পতন হয়েছে।

ফার্ডিনান্ড আর ইসাবেলার নেতৃত্বে ইউরোপীয় বাহিনীর কাছে সামরিক ও রাজনৈতিক পরাজয়ের অনেক আগেই কর্ডোভার মৃত্যু শুরু হয়েছে। পতন শুরু সেদিন থেকে, যেদিন থেকে স্পেনের মুসলমানরা জ্ঞান চর্চা ছেড়েছেন, কুরআন ছেড়ে নিজেদের খেয়াল খায়েশ মত দেশ পরিচালনা শুরু করেছে।

www.pathagar.com

একটা পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা ইসলামকে যারা জানেন, তারা ভালো করেই জানেন, কোন বিশেষ ভূখণ্ডে ইসলাম টিকে থাকে কেন ও কিভাবে? কিংবা কোন একটি সমাজ কিভাবে অমরত্ব লাভ করতে বা কতদিন সেই অবস্থায় থাকতে পারে? এর আগের বিশ্বসভ্যতা, যেমন, গ্রীক, রোমান, আর্য সভ্যতা এগুলো ধ্বংস হয়েছে কি কারণে, কিভাবে? সভ্যতা গঠনের উপাদানইবা কি, আর তা ধ্বংসের কারণগুলোই বা কি? (বিষয়টা নিয়ে আমার লেখা **'ইসলাম; সভ্যতার শেষ ঠিকানা'** গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।)

ইসলামের আভ্যন্তরীণ শক্তি ইসলামকে টিকিয়ে রাখে। নিজের অভ্যন্তর হতেই তাকে টিকে থাকার শক্তি জোগায়। সেটি হলো ইজতিহাদ। তোমাদের ভাষায় এর নাম হলো Exposition of thoughts। ইসলাম কেন পুরানো হয় না? এ প্রশ্নের উত্তরও সেটিই। ইজতিহাদ'ই ইসলামের প্রাণশক্তি।

কর্ডোভার সামরিক পতনের আগে সেখানে শুরু হয়েছে, যে মূল প্রাণশক্তির উপরে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়, প্রতিষ্ঠিত থাকে, সেই প্রাণশক্তি, ইজতিহাদের পতন পর্ব। ইসলাম জ্ঞানকে ফরজ করেছে। ইসলাম একজন শিক্ষার্থিকে বিষয়ের গভীরে যেতে, হৃদয় দিয়ে বিষয়টিকে অনুধাবন করতে, এর তাৎপর্য বুঝতে এবং সেই জ্ঞানকে ভিত্তি করে তার মনে নিজস্ব চিন্তাশক্তির বিকাশ ঘটুক, এটা চায়। ইসলামে এ এক অনন্য বৈশিষ্ঠ।

কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় এর পাঠককে, বারংবার চিন্তা করতে উদ্বুদ্ধ করে, বারংবার তাগাদা দেয় 'আফালা ত্বাফাক্কারুন?' 'আফালা তুদ্বাব্বারুন?' 'আফালা ত্বা'ক্বিলুন?' এইসবই হলো ব্যক্তিকে একটি গতিশীল চিন্তাধারার দিকে ধাবিত করে। আর এর ফলও কুরআনের সচেতন পাঠকই হাতে হাতে পান।

এর উদাহারণও রয়েছে ভুরি ভুরি। ইসলামের তৃতীয় খলিফা ওমর (রাঃ) কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও আইন শাস্ত্র পড়েছিলেন যে, তিনি একাধারে বিশ্ববরেণ্য প্রশাসক হয়েছিলেন? কিভাবে তিনি সর্বপ্রথম ফৌজাদারী আইন প্রণয়ন করেছিলেন? তিনি কোন সামরিক একাডেমিতে পড়েছিলেন যে, একজন বিশ্বখ্যাত সামরিক কমান্ডার, সমরবীদ হতে পেরেছিলেন? আইন

হযরত আলী (রা:) কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞান পড়েছিলেন যে, তিনি একজন সফল রাষ্ট্রবিজ্ঞানী হতে পেরেছিলেন? রাষ্ট্র ও প্রশাসন বিষয়ে তাঁর গভীর পান্ডিত্য ছিল, তাঁর জীবনের বিশ্লেষক প্রত্যেকে ভালো করেই জানেন। আর যারা জানেন না, তাঁরা

www.pathagar.com

ভারতের প্রখ্যাত ইসলামি চিন্তাবীদ, মরহুম আবুল হাসান আলী নদভী'র লেখা An Administrative Policy Letter of The Fourth Khaliph of Islam, Hazrat Ali (ra) নামক ছোট্ট পুস্তিকাখানা পড়ে দেখতে পারেন।

আচ্ছা, হজরত আলী, হজরত ওমর রা: এঁদের কথা না হয় তর্কের খাতিরে বাদই দিলাম। কারণ, অনেকে হয়ত বলতে পারেন যে, তাঁরা স্বয়ং আল্লারহ রাসুল সা: এঁর হাতে প্রশিক্ষিত, তাই কোন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রয়োজন তাঁদের ছিল না। যুক্তিটি অকাট্য ঐতিহাসিকভাবে প্রমানিত সত্য।

তবে এরকম কোন যুক্তি খাটে না ইবনে সীনার বেলায়। কুরআনের হাফেজ, ইবনে সীনা কোন মেডিকেল কলেজে পড়েছিলেন যে, তিনি একজন চিকিৎসকই নন, হতে পেরেছিলেন জগৎজোড়া চিকিৎসা বিজ্ঞানী? কোন ইউনিভার্সিটিতে দর্শন পড়েছিলেন যে, একজন দার্শনিক হতে পেরেছিলেন? কোন প্রতিষ্ঠানে জোতির্বিজ্ঞান পড়েছিলেন যে, একজন জোতির্বিজ্ঞানী হতে পেরেছিলেন? গণীতই-বা কোথায় পড়েছিলেন, যে তিনি গণীত শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞ হতে পেরেছিলেন?

তিনি কি ভাবে একজন কবি হলেন? কিভাবে সঙ্গীতজ্ঞ হলেন? কিভাবে তাঁর ভেতরে একই সাথে এত প্রতিভার স্ফুরণ ঘটল? উত্তর একটাই, ইসলাম যে পদ্ধতিতে একজন ব্যক্তির মধ্যে জ্ঞান সঞ্চারণ করতে চায়, ঠিক সে পদ্ধতিতেই তিনি জ্ঞান আহরণ করেছিলেন বলেই, জ্ঞানের মৌলকথা, ইজতিহাদী শক্তি তাঁর ভেতরে তৈরী হয়েছিল। তাই তিনি হতে পেরেছিলেন ইবনে সীনা! ঠিক একইভাবে ইবনে বতুতা, ইবনে খালদুন, রাজী, জাবির, ইবনে হায়সাম, আল ফারাবী, জালালুদ্দীন রুমী'দের আত্মপ্রকাশ!

এইসব মনিষিদের পরে হাজার বসর পার হলেও দ্বিতীয় ইবনে সিনা জন্মাল না! আর একজন ফারাবী কিংবা রাজী, কিংবা জাবির এর দেখা নেই। কুরআন আজও আছে, প্রতিদিনই পড়েন কোটি কোটি মুসলমান, কিন্তু তাদের মধ্যে থেকে একজনও আজ জাওয়াহিরী'র জন্ম হলো না! কারণটা কি?

কারণ, আমরা শিক্ষার জগতকে করেছি সংকীর্ণ, এই সংকীর্ণতার পথ ধরেই এসেছে অজ্ঞতা, আর অজ্ঞতার সাথেই যে হিংষা, বিদ্বেষ, অনৈক্যের বাস, সেটা কে না জানে? সেই হিংষা বিদ্বেষইতো সমাপ্তি ঘটায় সমাজের ভেতরে পরমত সহিষ্ণুতার, সেখানে জন্ম নেয় সামাজিক অনৈক্য। একের ভেতরেই তৈরী হয় বহু, বহু মত, বহু পথ। দল-

www.pathagar.com

উপদল। এর অনিবার্য পরিণতি কোন্দল। প্রমাণ, আজকের মুসলিম বিশ্ব! আমার নিজের দেশ, বাংলাদেশও এ তালিকায়!!

আন্দালুসে মালিকী মাজহাব অনুসরণ করতেন শাসকবর্গ। ঐ মাজহাব ছাড়া অন্যসব মাজহাবের চর্চা করেছিলেন নিষিদ্ধ। ফলে ইসলামের মুল শক্তি Exposition of thoughts বা 'ইজতিহাদ' রুদ্ধ হয়ে পড়ে। মুসলিম জনমানসে চিন্তাশক্তির বিকাশ বন্ধ হয়। কোন জাতির সদস্যদের মননে যখন চিন্তাশক্তির বিকাশ বন্ধ হয়, তখন তাদের পতন কে ঠেকায়? কেউ না। কারো পক্ষেই সম্ভব নয় এ পতন ঠেকানো।

প্রখ্যাত দার্শনিক ইবনে খালদুন তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'মোকাদ্দমা'য় আন্দালুসে তৎকালীন শিক্ষা ব্যবস্থাকে কঠোরভাবে সমালোচনা করেছে কারণ, সেখানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রদের পাঠদানের বেলায় শিক্ষকরা ছাত্রকে 'কোন একটা বিষয় অনুধাবন করানোর চাইতে তা মুখস্থ করার প্রতিই বেশি গুরুত্ব প্রদান করেন'। আজ আমরাও এটাই করি আমাদের দেশে, পুরো মুসলিম বিশ্বেই।

এসবই ইতিহাস। ইতিহাসের চর্চাওতো আমরা করি না। ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে আমাদেরকে একটা কথা মনে রাখতে হবে, আমাদের পূর্ব পুরুষের ইতিহাস চর্চার সময় তাদের প্রতিটি কাজকেই একটা ইতিবাচক ব্যাখা দেবার চেষ্টা করব না, তেমনটা করলে ইতিহাসের শিক্ষা আমাদের দৃষ্টিসীমার আড়ালে রয়ে যাবে।

আমরা বরং যা ঘটেছে, যে প্রেক্ষাপটে ঘটেছে, এবং ঘটনা'র যে প্রভাব সমাজের উপরে পড়েছে, সেটাকেই তুলে ধরব। আমরা যখন ইতিহাসকে বিশ্লেষণ করব, তখন আমাদের দৃষ্টিতে খন্ডিত চিত্র নয়, বরং যে ঘটনাসমুহের পরম্পরায় ঘটনা ঘটেছে, সংশ্লিষ্ট সমাজ ও ব্যক্তি এবং পরবর্তি মানব সম্প্রদায়ের উপরে সে ঘটনা যে প্রভাব রেখেছে, তা তুলে ধরব। এটাই সেই পথ, যে পথে ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেয়া যায়।

একটা ছোট্ট উদাহারণ দেই, গ্রাণাডার শেষ মুসলিম সম্রাট আবু আব্দুল্লাহর দেশপ্রেম আর ঈমানী শক্তি কি ছিল, কতটুকু ছিল, তা আমাদের বিবেচ্য নয়। গ্রাণাডার পতনে আবু আব্দুল্লাহকে এককভাবে দোষারোপ না করেও বলতে পারি, তিনি এর দায়ভার এড়াতে পারেন না কোনমতেই।

www.pathagar.com

তৎকালীন সমাজে আমীর-ওমরাহসহ প্রভাবশালী মহলে যে নৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক ত্রুটি বিচ্যুতির পথ ধরে এই লজ্জাজনক পরাজয় এসেছে, তা রোধে আবু আব্দুল্লাহ বিজ্ঞতার প্রমাণ দেন নি। তিনিও নিজেও তৎকালীন সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের মত একই ত্রুটি বিচ্যুতিতে আক্রান্ত ছিলেন।

এ সত্য আমাদেরকে স্বীকার করতে হবে, বলতে হবে এবং তার বিশ্লেষণও করতে হবে। আমরা জানি, আবু আব্দুল্লাহ গ্রাণাডা, তাঁর প্রিয় 'আল হামরা' ছেড়ে যাবার সময় বার বার পেছন ফিরে তাকাচ্ছিলেন, তাঁর চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরে পড়ছিল। তা দেখে তাঁরই বৃদ্ধা মা আয়েশা ছেলেকে ভৎর্সনা করে বলেছিলেন; 'আবু আব্দুল্লাহ, একজন পুরুষের মত যে শহরকে রক্ষা করতে পারনি, একজন নারীর মত তার জন্য কাঁদছ?'

এখানে প্রাণভয়ে প্রিয় 'আল হামারা' ছেড়ে গ্রাণাডার শাসক আবু আব্দুল্লাহ পরিবার পরিজনসহ পালিয়ে যাচ্ছেন, সেটা ইতিহাস। এটাও ইতিহাস যে, তিনি এ সময় তাঁর রাজ্য, তাঁর সাধের আল হামরার জন্য চোখের অশ্রু ফেলেছেন।

কিন্তু আমরা এই সন্ধিক্ষণে চোখের অশ্রু ফেলার মধ্যে আবু আব্দুল্লাহর দেশ প্রেমকে যদি ফুটিয়ে তুলি, তবে সেটা হবে ইতিহাসের শিক্ষার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা। সেটা হবে সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া মাত্র। বরং ঐ ঘটনায় ইতিহাসের প্রকৃত শিক্ষা হলো, আবু আব্দুল্লাহর বৃদ্ধা মা, আয়েশার মুখে যে কথাটা বেরিয়েছে, তিনি পুত্রের কাপুরুষতার জন্য অল্পকথায় যে ভৎর্সনাটুকু করেছেন, সেটি।

তার মধ্যেই রয়েছে ঐতিহাসিক শিক্ষাটুকু। বিলাসি জীবনের মরীচিকায় যারা তাদের দ্বায়িত্ব পালনে তৎপর না হয়, তাদের কাঁদতেই হয়। নিজেরাই কেবল কাঁদে না, কাঁদে অনাগত বংশধররাও! আজ যেসব মুসলমান নিশ্চুপ বসে নিজ সমাজের জিল্লতি দেখছেন, তারা কি ইতিহাসের এই শিক্ষাটুকু নেবেন? আসলেই কি ইতিহাস থেকে কেউ শেখে না?

দশ

আমার তা মনে হয় না। ইসলামও তা বলে না। ইসলাম বরং ইতিহাস শিক্ষা দেয়। বলে, শেখো। ইসলামের ইতিহাস তো শেখারই ইতিহাস। আমরা কি তার পরেও শিখব না? ইতিহাস যদি না শিখি, এর চর্চা যদি না করি, তা হলে কি করে তৈরী হবে আত্মসচেনতা? কি করে জানব আমাদের অতীত, আমাদের ঐতিহ্য, কি করে জানব

www.pathagar.com

উম্মাহর জীবনে কোন পথে কিভাবে, কখন এসেছে পতন? ইতিহাস যদি না জানি, তা হলে কি করে জানব কোন পথে এবং কিভাবে এসেছিল বিজয়? ইতিহাস মানুষকে আত্মপরিচয় দেয়।

আর এই আত্মপরিচয়ের কারণেই একজন অখ্যাত মাঠের রাখালও প্রায় বারো লক্ষ বর্গমাইলের শাসক হতে পেরেছিলেন! এর কারণেই দেশের একজন শাসক হয়েও রাখালকে উঠে চড়িয়ে নিজে সেই উটের রশি টেনেছিলেন। এরই কারণে হাবসী ক্রীতদাস বেলালও কোটি মানুষের নেতা হতে পেরেছিলেন। এরই কারণে আজও মুসলমানরা এইসব ব্যক্তিদের কবরের পাশে তাঁদের স্মৃতিতে কাঁদেনই না বরং বিশ্বের যে কোন স্থানে তাদের নাম শুনেই ভক্তিতে বিগলিত হয়ে আল্লাহর কাছে তাঁদের কল্যাণ কামনা করেন!

সেদিন আর বেশীদূর এগুনো যায়নি। আলোচনায় ছেদ টানতে হয়েছিল ব্যস্ততার কারণে। উঠার আগে ফারিহা ধন্যবাদ জানালেন, বললেন; 'নিজেদের আত্মসমালোচনা করে আজ কাল আলোচনা কমই শুনি, জিয়া, তোমাকে ধন্যবাদ তুমি খুব সুন্দর করে সত্য কথাগুলো বললে, আমার ভালো লাগল শুনে।' ফারিহাকে ধন্যবাদ জানাব, কিন্তু তার আগেই মেলেনি ফারিহার দিকে তাকিয়ে আমাকে ইংগিত করে বলে উঠল,

'জানো ফারিহা, অফিস আওয়ারে সুযোগ পেলেই জিয়ার কথা শোনার জন্যই মাঝে মাঝে এসে ওর এখানে বসি। ভালো লাগে শুনতে, কিছু শিখতেও পারি। আজ জেমা নেই, থাকলে আরও জমতো, ও খুব জমাতে পারে।' হ্যাঁ, জেমা আলোচনা জমাতে পারে, তবে সে কেবল তর্কের দিকে টেনে নেয়। এমন সব প্রশ্ন করে, এমনভাবে করে যে, তার উত্তর দিতে সাবধান না হলে অনেক সময় নিরর্থক তর্কের সুত্রপাত হয়, তাই সাবধান হতে হয় যেন অযথা তর্ক বাধিয়ে না ফেলি।

কানাডিয়ান মেলেনি জনসন আর ইংলিশ জেমা রিচার্ডসন, দু'জনে সুযোগ পেলেই ইসলাম, মুসলমানের বিষয় টেনে আনতেন। তবে দু'জনের দৃষ্টিভংগীর মধ্যে ছিল বিস্তর ব্যবধান। মেলেনি জনসন প্রশ্ন করতেন তার স্বভাবসিদ্ধ আগ্রহের কারণে, জানার জন্য, সেটা তার প্রশ্নের ধরন, মনযোগ দেখেই বোঝা যেত।

কিন্তু জেমা সব সময়ই বিতর্ক চাইলেও আমি কিছুটা খুশিই হতাম, কারণে, তার সাথে বিতর্কের (বিতর্ক সব সময়ই এড়িয়ে চলার চেষ্টা করেছি) সময় মেলেনি উপস্থিত থাকতেন। মেলেনি'র সাথে ইতোমধ্যেই ফারিহার সম্পর্ক তৈরী হয়েছে, ফলে তিনি

www.pathagar.com

সেখান থেকেও ইসলাম জানছেন, তার অনেক প্রশ্নের উত্তর পাচ্ছেন। তাদের সাথে কখনও কখনও ভারতীয় সুষমা, মেক্সিকান সুজি এবং গ্রীক মারজুরিও থাকতেন।

আজকাল বিশ্বের হট টপিকস ইসলাম, মুসলমান। যে যত বেশী ইসলামকে গালি দেবে, যত বেশী কুরআন ও মুহাম্মদ সাঃ কে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ্য করবে, সে তত আধুনিক, তত বেশী প্রগতশীল! এরকমই একজন প্রগতিশীল জেমা রিচার্ডসন! নিজে সমকামী। লুকোচুরির বালাই নেই, সগৌরবে তা বলেও বেড়ান। মনের কোণে একটা অস্বস্থিভাব থাকলেও সহকর্মী হিসেবে কাজ করতেই হয় তার সাথে। আর তার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে আমার মাথা ব্যাথাও নেই।

আমার না থাকলেও তার আছে। আছে ইসলাম নিয়ে। তিনি প্রায়ই আকারে ইংগিতে বলেন ব্রিটেনে মুসলমান বেড়ে যাওয়া, এখানকার পরিবেশ বদলে যাবার কথা। পত্র পত্রিকা ও মিডিয়া থেকে ইসলাম বিষয়ে নেতীবাচক খবরগুলো নিয়েই তিনি বেশীর ভাগ সময় আলাপ শুরু করতেন। একবার সিরিয়াস আলোচনা জমে উঠেছিল। ছিল মেলেনি জনসনও।

বাইরে তুষারপাতের সাথে হাল্কা দমকা হাওয়ায় ঘরের জানালায় সাদা বরফের কুচিগুলো বাড়ি খাচ্ছে, তাই দেখছিলাম। সামনের টেবিলে মেলেনি বসে প্রয়োজনীয় কিছু তথ্য টুকে নিচ্ছেন। তথ্যগুলো ফারিহার পালক পিতা টমাস গ্রে'র। আজ টমাসের কেয়ার প্যাকেজ অডিট কওে কিছু সংশোধনী দিয়েছি, মেলেনি সেগুলোই নোট করছেন। পরবর্তি বৈঠকের আগেই মেলেনিকে কেয়ার প্লানগুলো সংশোধন করতে হবে তাই ব্যস্ত, আর আমি বাইরের তুষারপাত দেখছি। এমন সময় জেমা এসেই জানতে চাইলেন কফি আছে কি না। কোণার টেবিল থেকে নিজেই আমাদের সকলের জন্য কফি বানালেন। তাকে ধন্যবাদ দিয়ে কফির কাপটা হাতে নিলাম, তিনি সামনের চেয়ারে বসতে বসতে বললেন;

'আচ্ছা জিয়া, ব্রিটেনে শরীয়া আইন চালু হোক, সেটা তুমি চাও?' বোঝাই যায়, হাতে কাজ নেই, মুডে আছেন তর্কের! তাই চলে এসেছেন। আচমকা প্রশ্নটা শুনে বিরক্ত হলেও তা চেপে জানতে চাইলাম, এ প্রশ্ন কেন ? সন্দেহ হচ্ছিল, জেমা হয়ত পাথর ছুঁড়ে হত্যা, চোরের হাত কাটা, খূনীর মৃত্যুদন্ড, এসব কথা তুলবে। সব অমুসলিম দেশেই এগুলো নিয়ে ইসলাম'কে নিষ্ঠুর, অমানবিক, বর্বর হিসেবে চিত্রিত করা হয়। আর আমাদের জন্য পরিবেশ হয়ে ওঠে বৈরী।

www.pathagar.com

ইদানীং সে ধারা বাড়ছে। কেবল ইংল্যন্ডই নয়, বরং সারা বিশ্ব জুড়ে মুসলিম স্থাপনা ও ব্যক্তিদের উপরে নানা কৌশলে আক্রমণ হচ্ছে, হচ্ছে বৈরী প্রচারণা। এই ইংলন্ডেও বিভিন্ন মসজিদ ও ইসলামিক সেন্টারে আক্রমণ হয়েছে। মাত্র সেদিন লন্ডনে বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত এক ইমাম শারীরিকভাবে আক্রান্ত হলেও তিনি অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচেছেন। রাস্তায় চলমান মুসলমানের পাশে গাড়ী থামিয়ে বিশ্রী গালাগাল করে চম্পট দিচ্ছে উশৃংখল যুবক-তরুণরা।

আমার দক্ষিণ ভারতীয় বন্ধু সেদিন সন্ধায় তার আত্মীয়ের বাসায় গেছেন, গাড়ী রেখে যাবার সময় সামনেই চার-পাঁচজন ছেলে তাকে 'গুড ইভনিং' সম্বোধন করে। রাস্তায় কালো চামড়ার এশিয়ান, আফ্রিকানদের সম্বোধন করা! শেতাঙ্গ কিশোর চরিত্রে তা নেই! ফলে ভদ্রলোক যারপরনাই খুশী, পাল্টা 'গুড ইভনিং' জানিয়ে চললেন গন্তব্যে। ঘন্টাখানেক পরে যখন ফিরলেন, তখনই বুঝলেন সেইসব ছেলেদের সম্ভাষণের মাহাত্ম! তার গাড়ীর কাঁচ ভেঙ্গে গুড়িয়ে দিয়েছে। ভদ্রলোকের চোখ চড়ক গাছ! আশে পাশে সেইসব ভদ্র (!) কিশোরদের নাম নিশানাও নেই। সবাই উধাও!

অফিস শেষে বাড়ী ফিরতে রাত নয়টা বাজে, গ্রীষ্মকালে এখানে মাগরিবের নামাজ 'সন্ধা' পৌনে দশটায়। নামাজের সময়টা ধরতে দ্রুত পায়ে বাড়ী ফিরি। পথের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা ছেলে মেয়েরা, বয়স ১২/১৩ 'র বেশী হবে না, প্রায় সময়ই উত্যক্ত করে, আমাকে দেখেই উচ্চস্বরে "সাড্ডাম" "সাড্ডাম" বলে চেঁচায়, কখনও বা ডাকে "বিন লাডেন্"। ত্রস্তপায়ে পথচলা দেখে ভাবে, আমি বোধ হয় ভয় পেয়ে পালাচ্ছি, তাই আরও বেশী চেঁচায়। এভাবে প্রায় প্রতিদিনই রাস্তা ঘাটে মুসলমানরা এবং মুসলমান সন্দেহে এশিয়ানরা বিদ্রুপ আর টিটকারির মুখোমুখি হচ্ছে। মনে হয় রাতারাতি এক হিমালয়'সম বৈরীতা হাজির হয়েছে!

আটলান্টিকের ওপারেও মুসলমান অথবা মুসলমান সন্দেহে এশিয়ানরা হয়রানির শিকার! কিছুদিন আগে লস এনজেলস থেকে লন্ডনের উদ্দেশ্যে ছেড়ে আসা বিমানকে গতীপথ বদলে বোস্টনে নামানো হয়, কারণ সেই বিমানে তিন পাকিস্থানীর গতীবিধিতে ক্রুদের সন্দেহ হলে তারা বিমানের পাইলটকে, আর পাইলট কন্ট্রোল টাওয়ারে, আর তারা এফবিআই'কে জানায়! নির্দেশ আসে বিমানের গতিপথ পরিবর্তনের। বোস্টন এয়াপোর্টে নামার সাথে সাথে এফবিআই সেই তিন পাকিস্তানীকে আটক করে নিয়ে যায় এবং তাদের তল্লাশি জিজ্ঞাসাবাদ শেষে সন্দেহভাজন কিছু না পেয়ে ছেড়ে দেয়।

www.pathagar.com

এর মাত্র ক'দিন পরে এক রোববার নিউইয়র্কে বেড়াতে যাওয়া কয়েকজন শিখ ধর্মালম্বী ব্রিটিশ নাগরিক হেনস্তার শিকার হয়। তারা যখন অন্যান্য টুরিস্টদের সাথে পর্যটনে ব্যস্ত, তখন তাদের অলক্ষ্যেই বাসে কর্মরত টুরিস্ট কোম্পানীর কর্মচারীর মনে সন্দেহ জাগে তাদের চাল চলনে!

ব্যাস্! খবর যায় পুলিশে, চোখের পলকে পুলিশ বাসটি ঘিরে যাত্রীদের নামায়, শিখ ধর্মাবলম্বী ব্রিটিশ পাঁচজনকে নিউইয়র্কের রাস্তা নামিয়ে, দু-হাত পিছমোড়া করে বেঁধে, হাঁটু গেড়ে বসিয়ে দিবালোকে শত শত লোকের সামনেই তাদের দেহ ও লাগেজ তল্লাশি চালায়। কিছু না পেয়ে তাদের ছেড়েও দেয়।

ঐ পাঁচ কালো চামড়ার 'এশিয়ান লুকিং' শিখ ব্রিটিশ এই অপমান, জিল্লতি আর নাজেহাল সইবার পরে সাধের আমেরিকা ঘুরে দেখার শখ এবং মানসিক অবস্থা ছিল কি? তাদের এই অভিজ্ঞতার পরে তাদের নিকাটাত্মীয়, বন্ধু-বান্ধবরা কেউ আমেরিকায় অবকাশ কাটনোর শখ করবেন?

আমার বাসার অনতিদুরেই হাঁটা পথের দুরত্বে মসজিদ, ছুটির দিনে, মসজিদে যাওয়া আসার পথে দেখা হয় উঠতি বয়সের ইংলিশ তরুণ-তরুণীদের। প্রায়ই রাস্তার পার্শ্বে দাঁড়িয়ে নিজেদের মধ্যে হাসি ঠাট্টা করে, সিগারেট ফোঁকে। প্রায়ই তাদের দেখি, তারাও আমাকে দেখে। আমি আমার মত হেঁটে যাই, কোন দিন অসুবিধা হয়নি। কিন্তু সে দিন যখন বরাবরের মত তাদের পাশ দিয়ে হাঁটছি, আজ তারা আমাকে ছেড়ে দিল না। দুই যুবক দাঁড়িয়ে থাকলেও এক তরুণী আমার গা'র রং উল্লেখ করে বিশ্রী একটা গালি দিয়ে বলে উঠল 'তোমার নিজ দেশে চলে যাও, আমাদের একটু আরামে থাকতে দাও!' তাদের দিকে এক নজর তাকিয়ে আবার পা বাড়ালাম। দ্রুতই যেন বদলে গেছে চেনা জানা পরিবেশ! এই প্রবাস! আমাদের এই প্রবাস জীবন বড় বৈরী হয়ে উঠেছে।

বাংলাদেশের বঙ্গভবন, গণভবনে অবাধ যাতায়াত আছে, ক্ষমতাসীনদেরই একজন, এমন এক নেতার সন্তান কিছুদিন আমার ইংল্যান্ডের বাড়ীতে ছিলেন। এক রাতে বাড়ীর সামনের রাস্তায় হাঁটার সময় হঠাৎ করেই ছেলেটা দু'জন ইংরেজ যুবকের হামলার শিকার হয়! পুলিশ তদন্ত করেও হামলাকারীদের ধরতে পারেনি। বাংলাদেশী ছেলেটা সামান্য আহত হলেও আঘাত তেমন ভয়ংকর ছিল না। এই ঘটনা নিয়েই তার বাবার ঢাকার বাড়ীতে বসে কথা হচ্ছিল। তিনিই কথাটা তুললেন, বললেন, এই বিশ্বটা কি মুসলমানদের জন্য বসবাসের অযোগ্য হয়ে উঠছে দিনে দিনে?

www.pathagar.com

প্রশ্নটা আমারও ইদানিং মনে উদয় হয়। বিশ্বময় মুসলিম দেশ ও সমাজের দিকে দেখি আর ভাবি, এরকমতো হবার কোন কথা ছিল না। এমন হলো কেন? কেমন এলোমেলো লক্ষ্যহীন এক অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ এগিয়ে আসছে যেন!

এর কারণটা কি? ভদ্রলোক একজন রাজনীতিবীদ এবং সর্বোচ্চ পর্যায়ে ক্ষমতাসীনদের একজন, তিনি নিজেও দেশ পরিচালনা, আইন রচনা, দিকনির্দেশনায় ব্যস্ত, তাই আলাপচারিতায় প্রশ্নটির একটা উত্তর তুলে ধরেছিলাম নিজের বোধ-বিশ্বাসের বিচারে। যেহেতু তিনি রাজনীতিতে পুরোমাত্রায় সক্রিয়, তাই উত্তরটাও দিয়েছিলাম রাজনীতির ভাষায়।

বলেছিলাম 'এর জন্য আমরা নিজেরাই দায়ী। যেভাবেই বিশ্লেষণ করুন,দেখবেন আমরা মুসলমানরাই দায়ী সর্বোতভাবে। মুসলিম সমাজ আর এর চেতনায় নৈরাজ্যের কারণেই তারা পথ হারা! জানে না কোন পথে চলছে, বা কোন পথে চলা উচিৎ! আর এ কারণেই এমন বিপর্যয়।

তারপরেও ভেবে দেখুন, আমরা কি তাজমহলের মত ভবন বানাতে পেরেছি? আমরা জগদ্বিখ্যাত মসলিন বানাতে পেরেছি? পারলেও কি লাভ হতো? তাজমহল কিংবা মসলিন কি মোগলদের পতনকে ঠেকাতে পেরেছে? লালকেল্লা কী দিতে পেরেছে মুসলমানদের নিরাপত্তা? কুতুবমিনার আজও দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু তা কী নির্মাতা মুসলমানদের মাথা উঁচু রাখতে পেরেছে? আলহামরা কী পেরেছে গ্রানাডার বিপর্যয় ঠেকাতে?

পারেনি। পারেনি যে, তার কোন প্রমাণ প্রয়োজন নেই। কারণ এসবই সত্য । ঐ সূর্যের মত সত্য। সূর্যের কি প্রমাণ দরকার হয়? সুর্য নিজেইতো নিজের প্রমাণ! তেমনি 'আলহামরা' বলুন আর 'তাজমহল' বলুন 'কুতুবমিনার' বলুন আর 'লালকেল্লা' বলুন, এগুলো সবই হলো মুসলমানদের বিচ্যুতির প্রমাণ। তারা যে পথ হারিয়েছিল তার প্রমাণ!

আমরা এত বসর ধরে 'সোনার বাংলা' কিংবা 'নতুন বাংলা' গড়ার প্রচেষ্টার পরেও আবার পথ হাতড়ে বেড়াচ্ছি। কারণ, সেই '৭১ হতে এ পর্যন্ত দেখানো সব পথই ব্যর্থ হয়েছে 'সোনার বাংলা' গড়তে, অতএব আবার নতুন করে পথ খোঁজার পালা। এবারে আর 'সোনার বাংলা' বা 'নতুন বাংলা' নয়। এবারে 'ডিজিটাল বাংলা' গড়তে হবে। তবে কোন পথে? পথ তৈরি আছে, চলা শুরুটাই বাঁকি! দিল্লির সাউথ ব্লকের এ পথ

www.pathagar.com

আর কিছু না পারলেও মুসলিম সমাজের জনগোষ্ঠিকে তার নীতি আদর্শ থেকে বিচ্যুত, তার গন্তব্য থেকে বিভ্রান্ত করতে পরবে, তাতে সন্দেহ নেই।

দিল্লি, মস্কো বা ওয়াশিংটন যে মোকাম থেকেই পথের সন্ধান দেয়া হোক না কেন, তার অনুসরণ দেশ ও সমাজের প্রতিটি নাগরিকের, প্রতিটি মুসলমানের চেতনা থেকে এক এক করে ইসলামী শিক্ষা ও দর্শন'কে সরিয়ে তাদেরকে নিজেদের ধর্ম, আদর্শ, আক্বিদা'র মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেবে। ফলে পুরো মুসলিম বিশ্ব জুড়েই অনিবার্যভাবে সামাজিক অস্থিরতা দেখা দেবে। বাস্তবে তা দিয়েছেও।

আমাদের নিজেদের দেশ ও সমাজে সামাজিক অস্থিরতার ধরনটা কি দখতে পাচ্ছি না? আমাদের দেশে এই ডিজিটাল যুগেও প্রতিদিনই মানুষ বিনা কারণে খুন হচ্ছে? জীবনের কোন নিরাপত্তা নেই। নারীর ইজ্জতের কোন মুল্য নেই, যেখানে সেখানে তা ভুলুণ্ঠিত হচ্ছে, আর সদম্ভে তার প্রচারণাও চলছে, কোন লজ্জাবোধ, অপরাধবোধতো নেই-ই বরং বিকৃত উল্লাস আছে! শোষণ আর অবিচার আছে প্রকাশ্যে! জুলুম নির্যাতন আছে অপ্রতিরোধ্যভাবে!

যারা দেশটাকে সমৃদ্ধি আর শান্তি এনে দিতে চান বলে বলেন, তারা নিজেরাই পথহারা। এই 'পথহারা' নেতারাই ডাক দেন নতুন করে পথ চলার! পথভোলা জাতিও সাড়া দেয় সে ডাকে, সকল অশান্তি, অভাব-অনটন, দু:খ-কষ্ট, শোষণ আর নীপিড়ন থেকে মুক্তি পেতে! সাফল্য আর সমৃদ্ধি, সুখ-শান্তির দিশা পেতে!

আসলেই কি তাই, সত্যিই কি যে পথের দিশা আমাদের সামনে আনা হচ্ছে তাতে এই দেশ, দেশের পনেরো কোটির মানুষের স্বপ্ন পুরণ হবে? পাবে কি তারা প্রকৃত মানুষের মর্যাদা? 'মানুষ' এর জীবন?

আফসোস, এই ব্যগ্রতা, এই ছুটে চলাটাও এই আগের মতই নি:ষ্ফল হবে। এই পথ, এই পথিক আর মুর্শীদ সকলই হবে ব্যর্থতার ইতিহাসে আরও একটি সংযোজন মাত্র! ওরকম বহু পথের সন্ধান ইতিহাসে আছে ভূরি ভূরি। বিশ্বের ৫৭টি মুসলিম দেশ কতবার কত পথচলার কসরৎ করল, আজ তাদের অবস্থান বিপর্যয়ের কোন অতলান্তে, তা দেখতে কি অনুবীক্ষণ যন্ত্রের প্রয়োজন পড়ে ?

মাটির নিচে তেলের সাগর মধ্যপ্রাচ্যকে সুউচ্চ নয়নাভিরাম ভবন দিয়েছে বটে, অকল্পনীয় বিলাসিতাও দিয়েছে কিন্তু তাদের কি নিরাপত্তা, সম্মান দিতে পেরেছে? না পারেনি। নিরাপত্তা দেয়নি, শান্তিও দেয়নি! বরং আবদ্ধ করেছে কঠিন দাসত্বে। মেরুদন্ডহীন এইসব রাষ্ট্রগুলো একটি দিন তো দুরের কথা, একটি ঘন্টাও টিকবে না

www.pathagar.com

তাদের নিজেদের পা'র উপরে। তারা যে পথে এই অবস্থায় এসেছে সেই পথও ধার করা, নিজেদের নয়! প্রশ্ন হল, এমনটা কেন হলো? যে জাতির সৃষ্টিই হয়েছে বিশ্ববাসীকে পথ দেখানোর জন্য, আল্লাহ'র ভাষায়;

'কুনতুম খাইরা উম্মাতিউঁ উখরিজাত লিন্নাস্ তা'মুরুনা বিল মা'রুফ ওয়া তান হাওনা আনিল মুনকার ওয়া তু'মিনুনা বিল্লাহ্' অর্থাৎ: **তোমরাই সর্বোত্তম জাতি, তোমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে সৎ কাজের আদেশ দেবার জন্য, অসৎ কাজ হতে মানুষকে ফিরিয়ে রাখবে আর আনুগত্য করবে আল্লাহ'র।**

যে জাতিকে সৃষ্টিই করা হয়েছে বিশ্ববাসীকে নির্দেশনা দেবার জন্য, কি করতে হবে আর কি করা উচিৎ হবে না, দেখাতে হবে চলার পথ, আজ সেই জাতি-ই কিনা উল্টো পথের দিশা খোঁজে দ্বারে দ্বারে! অধঃপতনের কোন পর্যায়ে এলে এমন দুরবস্থা জোটে?

আজ পুরো মুসলিম উম্মাহ এক মরণ ব্যাধিতে আক্রান্ত। ব্যাধি আরোগ্যপ্রাপ্ত হয়, তবে শর্ত হলো যার রোগ তাকে জানতে হবে, সে রোগাক্রান্ত, চিকিৎসার দরকার! এই সচেতনতা ছাড়া তার রোগমুক্তির কোন উপায় নেই। একটি জাতির বা একটি উম্মাহ্'র ক্ষেত্রেও একই কথা। উম্মাহকে, জাতিকে জানতে হবে যে, সে রোগাক্রান্ত, তার চিকিৎসার দরকার। এই বোধোদয় ছাড়া জাতির আরোগ্য লাভের কোন পথ নেই।

পূরো মুসলিম উম্মাহই আজ রোগাক্রান্ত, বিবশ চেতনাহীন জাতিতে পরিণত হয়েছে। রোগটি কঠিন, তবে দুরারাগ্যে নয়! নিরাময় যোগ্য, তার ব্যবস্থাও আছে। তবে যার রোগ তাকেই তো এগুতে হবে পথ্য সেবনে! মুসলিম উম্মাহর চেতনা আজ অসাড়। কোন বোধ, কোন ব্যগ্রতা নেই! যেন মৃত একটি জাতি। এ জাতিরই ক্ষুদ্র কিন্তু গুরুত্বপুর্ণ অংশ হলাম আমরা, বাংলাদেশীরা।

আমরা বিশ্বের আনাচে কানাচে পথ হাতড়ে বেড়াচ্ছি নিরাপত্তা, সুখ আর সমৃদ্ধি, উন্নতি, প্রগতি, আর প্রবৃদ্ধির পথ সন্ধানে। পথ খোঁজার ব্যগ্রতাই প্রমাণ করে, আমরা মরে যাইনি, বিবশ, নীথর হয়ে যাইনি! আমরা অন্তত এতটুকু জানি যে, আমাদের পথের প্রয়োজন। আজ যখন পুরো মুসলিম উম্মাহই নীথর অসাড় হয়ে পড়ে আছে, তখন আমাদের এই জাগ্রত চেতনাটুকুও বা কম কিসে? এই জন্যই আমাদের মনে আশা আছে, আমরা যখন নিস্তারের পথ, মুক্তির পথ খুঁজছি, তখন মুক্তি আমাদের আসবেই।

www.pathagar.com

সেই মুক্তির পথটি জানতে প্রিয় বাংলাদেশ কি একটাবার চেষ্টা করে দেখবে না? পথের সন্ধান পেতে ব্যস্ত এ জাতি কি বিবেচনা করে দেখবে না সেই পথটি, যার সন্ধান দেয়া হয়েছে আল কুরআন! মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নিজের ভাষায়

'ফা আইনা তাজহাবুন, ইন হুয়া ইলা জিকরুল্লিল আ'লামিন, ফামন শা'আ মিনকুম আঁইয়াসত্বাক্বিম'

ভাবানুবাদ; কোথায় (পথ হারিয়ে) যাচ্ছ তোমরা? (সঠিক পথের দিশা পেতে) এটাই (আল কুরআন) হলো সমগ্র বিশ্ববাসির জন্য নির্দেশনা, অতপর তোমাদের যার খুশী (পথের সন্ধান পেতে) এটাকে আঁকড়ে ধরতে পার!

কুরআনটাকে কি একবারও হাতে তুলে নেবে না এ জাতি, এ দেশ? দেখবে না কি সে আমাদের কোন পথের সন্ধান দেয়? সেদিন অবাক করে দিয়ে উক্ত বাংলাদেশী রাজনীতিবীদ বলেছিলেন 'তার সরকারও সেটাই চায়, তবে তা আরও আধুনিক পথে। জ্ঞান বিজ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে। বিগত চৌদ্দশত বৎসরে বিশ্ব পরিবর্তিত হয়েছে, মানব সভ্যতা এগিয়েছে, কাজেই এটাও সময়েরই দাবী যে, এসব জ্ঞান বিজ্ঞানকে ইসলামি বিধি বিধানের সংস্কারে করে তা কাজে লাগাতে হবে। আর তার সরকার সেই কাজটাই করছে।'

এগারো

বুক ভরা বেদনা নিয়ে সেদিন উঠে এসেছিলাম তার বৈঠকখানা থেকে। একজন মুসলমানের বৈঠকখানা হতে। ভুল বুঝেছিলাম কি? তবে মনে হয়েছিল, তিনি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলতে চাচ্ছিলেন যে, চৌদ্দশত বসরের আল কুরআন এখন আর এককভাবে কোন সভ্যতাকে পথ দেখাতে পারে না, কাজেই পথের সন্ধান পেতে তার সাথে বিশ্বের অন্যান্য জ্ঞান ও মতবাদের সমন্বয় করতে হবে!

অথচ সেই কুরআনই কিন্তু পথের সন্ধান দিয়েছে ফারিহাকে। ভাবিয়েছে তাকে, তার নিজের জীবন নিয়ে, তার চার পাশে আমাদের জীবন নিয়ে। তিনি ভেবেছেন, আর উত্তরও খুঁজে বের করেছেন। তেমনি উত্তরের আশায় প্রশ্ন ছুড়ে দিয়ে সামনে বসে আছে ফারিহার মতই একজন, জেমা ডিকিনসন্স। তবে তার উত্তর খোঁজার ধরনটা ফারিহার মত নয়। নিছক কৌতুহল বশত, কিংবা আমাকে তর্কে নামানোর জন্যই সম্ভবত প্রশ্নটা করেছে।

www.pathagar.com

জেমা যেমন বসে আছে, তেমনি বসে আছে মেলেনিও, হাতের কাজটা ফেলে রেখে। তার দিকে চেয়ে থাকতে দেখে জেমাই আবার মুখ খুলল, বলল-'তোমাকে জিজ্ঞেস করলাম কারণ আমাদের আর্চবিশপ ব্রিটেনে শরীয়া আইন চালুর কথা বলেছেন, তাই'

জেমা জানতে চাইছে কারণ, ব্রিটেনের ধর্মীয় প্রধান, আর্চবিশপ অব ক্যান্টরবেরী এরকম একটা সুপারিশ করেছেন। ব্রিটেনের প্রতিটি পত্র পত্রিকা-নিউজ মিডিয়া টিভি চ্যানেল বিষয়টা নিয়ে উঠে পড়ে লেগেছে, দেখেছি পত্রিকার পাতায়।

আর্চবিশপ অব কেন্টরব্যরী ড. রোয়্যান উইলিয়ামস্ গেল সপ্তাহে ব্রিটেনের 'রেডিও ফোর' এ ব্রিটেনে বসবাসরত মুসলমানদের জন্য শরীয়া আইন চালুর কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, ব্রিটেনে ইতিমধ্যেই কোন কোন শরীয়া আইন চালু আছে। মুসলমানদের বিবাহ ও তালাক সংক্রান্ত বিষয়ে শরীয়া আইন কে বেছে নেওয়াটা তাদের উপরে ছেড়ে দিলে সামাজিক ভারসাম্য রক্ষা হবে। তিনি আরও বলেছেন, শরীয়া আইন প্রবর্তন সংক্রান্ত পরামর্শটি তখনই কেবল ফলপ্রসূ হবে যখন আইন টিকে মিডিয়া কর্তৃক উপস্থাপিত বিকৃত আকারে নয় বরং যথাযথভাবে উপলব্ধি করবে মানুষ।

সাক্ষাৎকারটি যেন মৌচাকে ঢিল ছুড়েছে। পুরো ব্রিটিশ সমাজে হৈ চৈ পড়েছে! কারণ পরামর্শটি স্বয়ং আর্চবিশপ অব কেন্টরব্যরী, চার্চ অব ইংল্যান্ডের প্রধান, ব্রিটিশ সমাজ ও প্রশাসনে অসাধারণ ক্ষমতাধারী মিঃ উইলিয়ামস্ এর কাছ থেকে এসেছে। এই কারণেই, কাল বিলম্ব না করেই স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ারকে বিবৃতি দিয়ে বলতে হয়েছে, ব্রিটেনে আঈনের উৎস হবে ব্রিটিশ মুল্যবোধ বা 'ব্রিটিশ ভ্যালু'।

'ঠিকই তো, প্রধানমন্ত্রী তো সঠিক কথাই বলেছেন'। জেমা'র মন্তব্য। তার কথা শুনলাম মাত্র, কিছুই বললাম না। আর্চবিশপ অব কেন্টরব্যরী ড. রোয়ান অসাধারণ পন্ডিত ব্যক্তি। ব্রিটেনের সমাজে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে তার অবদান ও প্রচেষ্টা সুবিদিত। তিনি এই সময়ে কেন এবং কি উদ্দেশ্যে এই বিষয়টিকে আনলেন, অনেকেই সে প্রশ্নও তুলছেন। আর মিডিয়াতো এ সুযোগে 'শরীয়া আইন' এবং 'সন্ত্রাস' 'বর্বরতা' 'মধ্যযুগীয় নৃশংসতা' এমন অনেক বিষয় টেনে ইসলামের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার ছড়াচ্ছে। জেমার দিকে চেয়ে বললাম;

'জানো জেমা, তোমাদের দেশে আছি বটে, তবে একটা বিষয় এখনও আমার কাছে অস্পষ্ট, তা হলো 'ব্রিটিশ ভ্যালু'। জিনিসটা কি? জানতে পারলে আমার মত এই ব্রিটেনের লক্ষ লক্ষ হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, জৈন, ইহুদী, আর ক্বাদিয়ানী'সহ অন্যান্য

www.pathagar.com

ধর্মাবলম্বীদের সুবিধা হতো। তুমি যদি ভাব, একেবারে নিখাঁদ খৃষ্টিয় দর্শন'ই ব্রিটিশ মুল্যবোধ, তাহলে সেটা ঠিক নয়।

কারণ, ইংল্যণ্ডের ইতিহাস ঘাটলে দেখবে, বিশ্বের অন্যান্য জাতিসত্তার মত এই ব্রিটেনও কালের পরিক্রমায় অনেক দর্শন, অনেক মুল্যবোধের মধ্যে আবর্তিত হয়েছে। তাদের আজকের মুল্যবোধ একদিন এমনটা ছিলনা, বরং ক্রমাগত পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে এসেছে। আর আজও পরিবর্তনের ধারাটি চলমান। এটা কেবলমাত্র ব্রিটেনের বেলাতেই নয় বরং পুরো মানবসমাজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, সমাজবিজ্ঞানীরা তা জানেন।

তোমার পূর্বপুরুষরা একসময় 'পাগান' ধর্মালম্বী ছিলেন, বহু দেব-দেবীর আরাধনা করতেন। খৃষ্টপূর্ব ৫৫ সালে রোমান খৃষ্টানরা এদেশে আসতে শুরু করে, সামরিক আগ্রাসনে। একের পর এক তা চলতে থাকে। প্রায় একশত বসর পরে ৫০ খৃষ্টাব্দে ইংলিশ সেনাপতি Caractacus এর পরাজয়ের মধ্যে দিয়ে ইংরেজ প্রতিরোধ স্তিমিত হয়। তারও প্রায় আড়াইশত বসর পরে এসে রোমান সম্রাট Septimius Severu 'র আমলে পুরো ইংল্যণ্ডের জনগণ রোমান সাম্রাজ্যের নাগরিক হিসেবে পরিগণিত হলেও এরা খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেনি।

এর অনেক পরে এসে পোপ গ্রেগরী কর্তক খৃষ্ট ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে প্রেরিত সেন্ট অগাষ্টিন আজকের কেন্ট এ নামেন সেই ৫৯৭ খৃষ্টাব্দে। তখন কেন্টের রাজা ছিলেন Ethebert আর তার স্ত্রী ফরাসী রাজকুমারী Bertha। ততদিনে ফ্রান্সে খৃষ্টধর্ম প্রতিষ্ঠিত, রাণীর প্রভাবেই রাজা Ethelbert খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। তখনকার নিয়ম অনুযায়ি রাজার ধর্মই ছিল প্রজাদের ধর্ম, প্রজারা রাজার ধর্মের অনুসরণে বাধ্য। রাজা Ethelbert খৃষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত হবার ফলে পুরো কেন্টের অধিবাসীরাই খৃষ্টান বিবেচিত হয়। এভাবেই ইংল্যন্ডে খৃষ্টধর্মের গোড়াপত্তন, সেন্ট অগাষ্টিন হন তোমাদের প্রথম 'আর্চবিশপ অব কেন্টারব্যরী'। এর পরে ইতিহাস বদলেছে আরও দ্রুত। তখন থেকেই এটা 'খৃষ্টান' ইংল্যন্ড।

তার পরেও 'খৃষ্টান' ইংল্যন্ডে মুল্যবোধের পরিবর্তন থেমে থাকেনি। বিশ্বের কোথাও তেমনটা থাকে না। পরিবর্তন, বিবর্তন সময়ের সাথেই চলে। মানুষ চাক বা না চাক, এগুলো ঘটবেই। ব্রিটেনেও ঘটেছে। সবচেয়ে সুদুরপ্রসারী পরিবর্তনটা ঘটেছে ষোড়শ শতাব্দীতে, তোমাদের রাজা অষ্টম হেনরীর হাতে। ব্যক্তিগত কারণে পোপের সাথে তার যে সংঘাত শুরু হয়েছিল (মূলত তার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে অন্য এক স্ত্রীকে বিয়ে করার অনুমতি না দেওয়াতেই পোপের উপরে ক্ষেপেছিলেন) সেই সংঘাতই শেষ

www.pathagar.com

পর্যন্ত এক স্থায়ী পরিবর্তনের সূচনা করে। তিনি ইংল্যন্ডকে পোপের নিয়ন্ত্রণমুক্ত করেন। 'চার্চ অব ইংল্যন্ড' নামে আলাদা এক চার্চই প্রতিষ্ঠা করে ফেলেন।'

জেমা 'হা করে আমার কাছ থেকে তার দেশ ও সমাজ পরিবর্তনের কথা শুনছে, সাথে সাথে খুব মনযোগ দিয়ে মেলেনি জনসনও কথাগুলো গিলছে বলে মনে হলো। ওদের মনযোগ দেখে ভালই লাগল। সব সময় এদের সাথে এদেরই ধর্ম, সমাজ নিয়ে কথা বলা যায় না, সুযোগও নেই! আজ সুযোগ পেয়েছি তাই আবার বলে উঠলাম;

'যা বলতে চেয়েছি তা হলো, ইংল্যণ্ডে খৃষ্টধর্মের ভেতরেও বিবর্তন ঘটেছে। সেটাকেও আমরা 'ব্রিটিশ ভ্যালু' বলতে পারি। তোমরা না বল, কেউ যদি বলে, ব্রিটিশ ভ্যালুতেও পরিবর্তন, বিবর্তন ঘটছে, অস্বীকার করতে পার না। বিবর্তনটা এখনও চলমান।

তবে তা সুক্ষ্ম, কিন্তু এতটা সুক্ষ্ম নয় যে, মানুষ বুঝে উঠতে পারে না। তুমি যাঁর কথা বলছ, সেই ড. উইলিয়ামস্ কোন সাধারণ ব্যক্তি নন, বরং তিনি ইংল্যণ্ডের অসাধারণ একজন বিদগ্ধ, প্রভাবশালী এবং বিচক্ষণ, দ্বায়িত্ববান ব্যক্তি। তিনিই যখন ব্রিটেনে মুসলমানদের জন্য শরীয়া আইন কে বেছে নেবার কথা বলেছেন, তখন সেটা অকারণে নয়। বরং তলে তলে চলমান বিবর্তনের ধারাবাহিকতায় ব্রিটিশ সমাজে একটা পরিবর্তন যে অনিবার্য, অনস্বীকার্য, সে সত্যটাকেই তুলে ধরেছেন মাত্র!

তিনি খুব ভালো করেই জানেন, ব্রিটেনের সমাজে, সরকারের চোখের সামনে তাদের অনুমতিতেই শরীয়া আইন আংশিক চালু আছে। এখানে 'ফেইথ স্কুল' আছে, ইসলামি ব্যংকিং আছে, মুসলমানদের জন্য আলাদা কবরস্থান, হালাল মাংশের আলাদা কসাইখানা, এসবই হলো শরীয়া আইনের অংশবিশেষ। এগুলো সাধারণ মানুষ ভেবে না দেখলেও ডঃ উইলিয়ামস ঠিকই ভাবেন, ঠিকই বোঝেন, তাই তা স্পষ্ট করে বলেছেন।

শরীয়া আইন মুসলমানদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের সাথে জড়িত। একজন মুসলমানের 'জীবন' আর 'শরীয়া আইন ' দুটোকে আলাদা করে দেখার সুযোগ নেই। ইংল্যণ্ডের আনাচে কানাচে যেখানেই চোখ দেবে, সেখানেই একজন মুসলমানের উপস্থিতিটা লক্ষণীয়। তার পোশাক-পরিচ্ছদ, চলা-ফেরা, আচার-আচরণ, উঠা-বসা, লেন-দেন, সব কিছুতেই আলাদা বিশেষ সংস্কৃতির বহিঃপ্রকাশ।

এই যে একজন ব্যক্তি বা গোষ্ঠি ভিন্ন আচার, আচরণ প্রকাশ করছে, তা করছে তার শরীয়া আঈনের কারণেই। এর কারণেই সে ঈদের নামাজ বা জুম্মার জামাতে যাচ্ছে, এর কারণেই তাকে মৃত্যুর পরে আলাদা কবরস্থানে বিশেষ প্রক্রিয়ায় কবরস্থ করা

www.pathagar.com

হচ্ছে। বিশেষভাবে জবাইকৃত পশুর মাংশ কিনতে তিনি 'হালাল' দোকানে ছুটছেন, বাচ্চাদেরকে বিশেষ স্কুলে পড়াচ্ছেন। এসবই শরীয়া আঈনের কারণেই এবং স্বয়ং ব্রিটিশ সরকারের নাকের ডগায়, তাদের অনুমতি সাপেক্ষেই! অতএব বুঝলে যে, ব্রিটেনে শরীয়া আইন চালু আছে। তাহলে বিতর্ক কেন?

তার পরেও বিতর্ক মূলত দুটো কারণে। প্রথম কারণ, অজ্ঞতা। দ্বিতীয়টি হল, একটা বিশেষ মহলের কারসাজিতে 'বিতর্ক' ছড়িয়ে দেবায় এই বিতর্ক। শরীয়া আইন কি? কোন পরিবেশে চালু হয়? কোন পর্যায়ে এর কোন ধারা কতটুকু চালু করা যায়, আবার কখন, কোন কারণে শরীয়া আইন প্রয়োগ থেকে বিরত থাকতে হয়? এসব নিয়ে বিরাট অজ্ঞতা রয়েছে মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষ সকলের মধ্যেই।

তোমরা জান না এই আঈনের বিভিন্ন দিকগুলো, সেটা স্বাভাবিক। কিন্তু আমাদের লজ্জা আর ক্ষোভ হলো, এই মুসলমান জনগোষ্ঠিরও এক বিরাট অংশ এ বিষয়ে নিরেট অন্ধকারে, অজ্ঞ! এই অজ্ঞতাই, মুসলিম বা অমুসলিম, সবার ক্ষেত্রেই আসল কারণ শরীয়া আইন নিয়ে আতংকিত হবার! ব্রিটেনের অন্যতম অহংকার, এখানে সকলেই নিজ নিজ ধর্ম পালনের স্বাধীনতা ভোগ করে, ঘোষণাতেই নয় বরং বাস্তবেও তেমনটাই আছে।

ধর্মীয় স্বাধীনতার ক্ষেত্রে যে ব্যবধানটুকু এখনও ব্রিটিশ সমাজে আছে তা দূরীভূত হবে অনেকটাই, মুসলমানদের সামাজিক ও দৈনন্দিন জীবনে সিভিল 'ল, যেমন বিয়ে-শাদী, তালাক, উত্তরাধিকার ও মিরাস বন্টন এসব ক্ষেত্রে যদি তাদের ধর্মানুসারে সমাধানের অনুমতি দেওয়া হয়। যেমনটা দেওয়া হয়েছে ইসলামি ব্যংকিং ব্যবস্থা ক্ষেত্রে। এমন পদক্ষেপ বিভিন্ন জাতিসত্তার মধ্যে ঐক্যকেই সুদৃড় করবে, সেটাই বলতে চেয়েছেন ড. উইলিয়ামস। আর তোমার প্রশ্নের উত্তর হলো, হ্যাঁ, আমি তার সাথে একমত।

আর একটা কথা, ব্যবস্থাটি ব্রিটেনে পূর্ণাঙ্গ শরীয়া আইন চালু করা, বা না করা, মুসলমানদের ধর্ম পালনে স্বাধীনতা দেওয়া বা না দেওয়া, এ দুয়ের মধ্যবর্তি একটা অবস্থানও নিশ্চিত করে। সেই ষোড়শ শতাব্দীতে 'চার্চ অব ইংল্যন্ড'এর গোড়াপত্তনের সময় `It hath been the wisdom of the church of England, ever since the compiling of her public liturgy, to keep the mean between the two extremes.' বলে মধ্যপন্থা অবলম্বনের যে বিজ্ঞতা দেখানো হয়েছিল, তার সাথেও এটা সঙ্গতিপূর্ণ।

www.pathagar.com

জেমা'র সামনে আর কোন যুক্তি নেই, উত্তরটাও পেয়েছে সেদিন। তথাপি মানসিকতার কোন পরিবর্তন হয়নি। আরও একদিন প্রশ্ন করেছিল, বাদশাহ আকবরের নাকি পাঁচ হাজার পত্নী ছিল? মোগল সব বাদশাহই নাকি শত শত পত্নী রেখেছিলেন এবং তা নাকি ইসলাম ধর্মের বিধান মেনেই করেছিলেন? কথাচ্ছলে তার দাবী, মুসলমানরা ভারতে লক্ষ লক্ষ মন্দির ভেঙ্গেছে, ইত্যাদি ইত্যাদি।

এধরনের অপপ্রচার বড় বিরক্তিকর। যদি কেউ প্রকৃত অর্থেই সত্য জানতে চান, তা হলে তাকে বলা যায়, তার সাথে আলোচনাও চলে । কিন্তু যার মনে সত্য জানার আগ্রহই নেই, সত্যকে স্বীকার করে নেবার মত কোন সাহস নেই, ইচ্ছাও নেই, তার সাথে এ নিয়ে কথা বলা নিছক সময়ক্ষেপণ মাত্র।

আবার কিছু না বললেও এহেন মিথ্যা অপবাদকেই প্রতিষ্ঠিত করে ফেলা হয়। তা ছাড়া অমুসলিম পরিবেশে একজন মুসলমান হিসেবে ইসলামের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অপবাদের জবাব না দিয়ে চুপ থাকাটা কেমন দেখায়? একজন মুসলমান হিসেবে আমিও যদি এ অপবাদের জবাব না দেই, তবে আর কে দেবে?

এরকম একটা চেতনা থেকেই একদিন সুযোগ বুঝে জেমা'র এরকম এক মন্তব্যের ব্যাপারে কথা বলেছিলাম। সেদিন জেমা'র সাথে ছিল ভারতীয় সুষমা দিক্ষিত ও কানাডিয়ান মেলানি জনসনও।

তখন রোজার মাস। ওরা বলে ফাস্টিং। এসময় আমি সকাল ও দুপুরের কোন ব্রেক নেই না। বরং শেষ বেলায় দু'টো ব্রেক একত্রে নিয়ে জোহর আর আসরের নামাজ সামান্য সময়ের ব্যবধানে পড়ে, কিছুটা সময় কুরআন তেলওয়াত করি। বিগত ক'বৎসরে আমার কলিগরা তা জানেন আমার এই রুটিনের প্রতি শ্রদ্ধাশীলও বটে।

তবে হাসপাতাল বলে কথা! কখনও কোন ইমার্জেন্সী অবস্থার উদ্রেক হলে ফ্লোর নার্সরা আমাকে ডাকবেই, সেটা তাদের বলাও আছে। দুটো ব্রেক একত্রে নিলে কারো কোন অসুবিধা হয় না তা নিশ্চিত বলা যাবে না। কোন পেশেন্টের প্রয়োজন হলে কল দিয়ে, বা পেজ করে জানায়, ব্রেক বাদ দিয়ে ছুটে আসি।

আমার ইমিডিয়েট বস, হাসপাতলের ম্যানেজার, ডেভিড বেল, আমি যার ডেপুটি, তিনি আমার প্রতি সহানুভূতিশীল। তার ছোট বোন ধর্মান্তরিত মুসলমান, সে কারণেই কিনা জানি না, তিনি আমার রোজার রুটিন নিয়ে কোন উচ্চবাচ্য বা বিরক্তিও প্রকাশ করেন নি। তবে জেমা'র জন্য বিষয়টা বিরক্তিকর। তার কথা বার্তায় তা স্পষ্ট।

www.pathagar.com

ব্রিটেনে গ্রীষ্ম কালে দিন সতেরো বা আঠারো ঘন্টার মত। রোজার সময় সেহরি খেতে উঠি রাত আড়াইটায়, আর ইফতারীর সন্ধ্যা পৌনে দশটার কাছাকাছি। দীর্ঘ আঠারো ঘন্টা কোন খাবার, এমনকি পানিটুকু পর্যন্ত পান না করে থাকা, জেমা'র কাছে কঠিন ও অবিশ্বাস্য ঠেকে। অবাক হয়ে জানতে চায়, মুসলমানরা কেন এমন করে? কি লাভ নিজেকে এরকম কষ্ট দিয়ে? এও জানান দেয় যে, সে হলে কখনই নিজেকে এমন কষ্ট দিতে পারত না।

ওর কথা শুনে হেসেছিলাম। তা দেখে জেমা পূনরুক্তি করে বলেছিল; 'অনেস্ট টু গড জিয়া, আমি কখনই এতটা কষ্ট করতে পারতাম না! তোমরা মুসলমানরা যে কেমন করে এরকম কর, ভেবে পাই না, ষ্ট্রেঞ্জ! সতিই জেমা অবাক হয়। তা দেখে একদিন প্রশ্ন করেছিলাম, জানতে চাও কেন মুসলমানরা এমনটা করে, কেন নিজেদেরকে এতটা কষ্ট দেয়? জেমা নিশ্চিত করে বলেছিল, সে সত্যিই মূল কারণটা জানতে চায়। সেদিন ওর সাথে সুষমা দিক্ষিতও ছিলেন। ভদ্রমহিলা কথা বলেন কম, মিতভাষী।

এর আগে যে একদিন জেমা মোগল বাদশাহদের ইসলামি বিধান অনুসারেই হাজার হাজার পত্নী রাখার কথা, হিন্দুদের মন্দির ভাঙ্গার কথা তুলেছিল, তা মনেই ছিল। সেদিন সময়াভাবে জবাব দেয়া হয়নি, সে পীড়া মনের মধ্যে তাজাই ছিল। জেমার সাথে সুষমা আছে আজ। আমার সন্দেহ, সুষমাই জেমাকে এসব ভ্রান্ত তথ্য দেয়। তাই দু'জনকে একত্রে পেয়ে আজ আর সুযোগটা হাতছাড়া করলাম না। বললাম, তুমি কি আসলেই জানতে চাও জেমা, কেন আমরা ফাস্টিং করি?

'আই এম বিয়িং অনেষ্ট জিয়া, আই ওয়ান্ট টু নো দ্যা রিজন বিহাইন্ড ইট' জেমার উত্তর। এরপরে জেমাকে যতটা সহজভাবে সম্ভব, ব্যাখা করলাম, কেন রোজা পালন করে মুসলমানরা, কেন তা বাধ্যতামুলক মুসলমানদের জন্য? এর মাধ্যমে একজন মানুষের মানসিকতায় কি ধরনের পরিবর্তনটা কাম্য, ইত্যাদি।

সে মন দিয়ে শুনল, মাঝে মধ্যে মাথাও ঝাঁকাল। শেষে বললাম, প্রতিটি মানুষের মধ্যে একটা ইতিবাচক মানবিক পরিবর্তন সাধন ও তা ধরে রাখার জন্যই রোজা বাধ্যতামুলক। সারা বসর চলতে ফিরতে মানুষের মধ্যে সেই ইতিবাচক মানবিক পরিবর্তনের ধারায় ধ্বস নামতে পারে, তাই সেই ধ্বসটুকু পুষিয়ে নিতে, কিংবা পরিবর্তনটাকে আরও শানীত করতে বসর ঘুরে আবারও সেই রোজা, সেই ফাষ্টিং।

www.pathagar.com

বারো

'জানো জেমা, এরকম পরিবর্তিত মানুষগুলোই প্রকৃত মুসলমান। এরা কেবলমাত্র ইসলামের নয়, পুরো বিশ্বমানবতার সম্পদ। এঁরা ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষ সকলের জন্যই কল্যাণকর। ইচ্ছা করলে এর অনেক উদাহরণ দেয়া যায় বাস্তব ঘটনা থেকে, ইতিহাস থেকে। সুষমা'র দিকে চেয়ে বললাম 'তোমাদের ভারতের একটা ঘটনা বলি শোন' বলেই শুরু করলাম;

'খুব বেশী দিন নয়, আজ থেকে দেড়শত বসর আগেকার ইতিহাস। ব্রিটিশ ভারতের একটা ঘটনা। ভারতের উত্তর প্রদেশ রাজ্যের একটা গ্রাম, 'কাণ্ডারা'। হিন্দু, মুসলমান জনঅধ্যুষিত গ্রাম। আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল নয়। দেড়শত বসর আগের ব্রিটিশ ভারতে আর্থিক অবস্থা কেমন ছিল, সেটা যে কোন সচেতন ব্যক্তিই উপলব্ধি করবেন। গ্রামের বেশীর ভাগই মধ্যবিত্ত বা নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর। হিন্দু, মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাদ ছিল, আবার তারা একত্রে বসবাসও করত। চিরাচরিত নিয়মেই।

হঠাৎ তাদের মধ্যে সংঘাতের সূত্রপাত হলো। গ্রামে পরিত্যক্ত একখণ্ড জমি ছিল। জমিটিতে গ্রামের হিন্দু সম্প্রদায় তাদের উপাসনার জন্য মন্দির বানাতে উদ্যোগী হলে মুসলমান'রা বিরোধিতা করে। তাদের দাবী, এটা মুসলমানদের জমি, এখানে মন্দির হতে পারে না। জনসমর্থন এবং ধর্মীয় আবেগকে কাজে লাগাতে মুসলমানরা ঐ জমিতে মসজিদ বানাবে, ঘোষণা দিয়ে বসে। স্বাভাবিকভাবেই হিন্দু জনসাধারণ এই সিদ্ধান্তের ঘোরতর প্রতিবাদ করে।

মুসলমানরাও তাদের দাবীতে অনড়। উভয় জনগোষ্ঠির মধ্যে সংঘাত অনিবার্য হওয়ায় বিষয়টি আদালতে গড়ায়। এবং উভয় গ্রুপের জন্যই প্রেষ্টিজ ইস্যুতে পরিণত হয়। প্রত্যেক গ্রুপই তাদের সাধ্যমত দলিল, প্রমাণ ও স্বাক্ষী জোগাড়ে ব্যস্ত হলে বাধে বিড়ম্বনা। পুরনো কোন দলিল প্রমাণই নেই সরকারি সেরেস্তায়, যার ভিত্তিতে প্রমাণ হয় জমির প্রকৃত মালিক কে বা কারা? ফলে জমির মালিকানাটা বিতর্কিত বিষয়ই থেকে যায়। আদালত শেষ পর্যন্ত গ্রামের বয়স্ক, বিশ্বাসযোগ্য দু'একজনকে সমন এবং হিন্দু ও মুসলমান উভয়পক্ষের সাক্ষীদের উপরে নির্ভর করে বিচারের সিদ্ধান্ত নেয়।

মজার ব্যপার হলো, হিন্দু সম্প্রদায় গ্রামের মসজিদের বৃদ্ধ ইমামকে সাক্ষী মানেন। হিন্দু হলেও তাদের বিশ্বাস ইমাম সাহেব আর যাই হোক, মিথ্যা সাক্ষ্য দেবেন না, তাকে দিয়ে ন্যায় বিচারের পরিপন্থী কোন কাজ করানো যাবে না। তিনি সত্যের পক্ষেই সাক্ষ্য দেবেন, এ ব্যাপারে পরওয়াই করবেন না।

www.pathagar.com

হিন্দুরা ইমামের নাম সাক্ষী হিসেবে প্রস্তাব করায় বিচারক তাঁকে আদালতে হাজির হতে সমন জারী করে। কিন্তু বৃদ্ধ ইমাম আদালতে হাজির হতে অস্বীকার করে বলেন, তার দেশকে ধ্বংস করে দেয়া কোন ইংরেজের মুখ দেখবেন না বলে পণ করেছেন। যেহেতু আদালতের বিচারক একজন ইংরেজ, তাই তিনি যাবেন না সাক্ষ্য দিতে।

বিচারক ইমামের কথা শুনে বিব্রত, ক্রোধান্বিত হলেও বিচারকার্যের স্বার্থেই বললেন, যদি ইমাম সাহেব সাক্ষ্য দিতে আদালতে আসেন, তবে তার পণ রক্ষার্থে বিচারক উক্ত সময় এজলাসের বাইওে থাকবেন এবং উকিল পেশকাররাই তার সাক্ষ্য রেকর্ড করবে। এই ব্যবস্থায় ইমাম সাহেব আদালতে হাজির হয়ে সাক্ষ্য দিতে সম্মত হলেন।

ইমাম আদালতে সাক্ষী দেবেন শুনে হিন্দু, মুসলমান সবার মধ্যেই উত্তেজনা! হিন্দুরা খুশি, কারণ তাদের বিশ্বাস ইমাম সাহেব আদালতে সত্য বলবেন। আর তা হিন্দুদের পক্ষে যাবে। আর মুসলমানরা ভেবেছিলেন, হিন্দু মুসলমান দ্বন্দে ইমাম নিজ জাতির বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবেন না, কারণ, যে জমি নিয়ে মামলা সেখানেতো আল্লাহর ঘর মসজিদই বানানো হবে! অতএব একজন ইমাম হিসেবে কী করে নিজ জাতির বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবেন?

এরকম উত্তেজনার মধ্যেই ইমাম আদালতে সাক্ষ্য দিলে তা রেকর্ড হলো। তিনি বলিষ্ঠতার সাথে জানিয়ে দিলেন, তার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে উক্ত জমির প্রকৃত মালিক হিন্দু সম্প্রদায়। মুসলমান পক্ষের উকিলের জেরার মুখেও তিনি একই কথা বললেন, তার সাক্ষ্যে অটল রইলেন। দীর্ঘদিনের বিরোধটি এভাবেই সেদিন নিষ্পত্তি হলো ইমাম সাহেবের দেয়া সাক্ষ্যের ভিত্তিতে। মাত্র কয়েক মিনিটের সাক্ষ্য প্রদান শেষে ইমাম সাহেব আদালত থেকে বেরিয়ে এলেন।

কিন্তু তিনি আদালতের সিঁড়ি বেয়ে দু'কদমও নামতে পারলেন না। মামলায় হেরে যাওয়া মুসলিম পক্ষ সকল আক্রোশ আর ক্ষোভ নিয়ে নেকড়ে বাঘের মত করে ঝাপিয়ে পড়ল তার উপরে। তিনি কেন মুসলমানদের বিরুদ্ধে হিন্দুদের পক্ষে সাক্ষ্য দিলেন? কেন নিজ জাতির বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলেন? তার জন্যই মুসলমানদের পরাজয়! কিছু পাষণ্ড ইমাম সাহেবকে 'দালাল' 'গাদ্দার' 'হিন্দুদের পেইড এজেন্ট' 'মীর জাফর' আখ্যা দিয়ে শারিরীকভাবে লাঞ্ছিত করল!

বেচারা ইমাম উত্তেজিত জনতাকে বোঝাতে বলে উঠলেন; 'ভাই সকল, আমি অন্যায় করিনি, একজন মুসলমান হিসেবে আল্লাহ'র নির্দেশ মেনেছি মাত্র। মনে রেখো, আমরা মুসলমান, আল্লাহ পাক আমাদের নির্দেশ করেছেন, এভাবে; ' .... তিনি তোমাদের

www.pathagar.com

নাম রেখেছেন মুসলিম, পূর্বে এবং এই কুরআনেও। যেন রাসূল তোমাদের উপরে সাক্ষী হন, আর তোমরাও সাক্ষ্যদাতা হও মানবগোষ্ঠীর জন্য' (সুরা হাজ্জ -৭৮)।

তিনি আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু পারলেন না! উত্তেজিত জনতা ইমাম সাহেবের উপরে এক এক করে আক্রমণ চালিয়েই যেতে থাকল। আর ইমাম সাহেব সব সহ্য করেও বলে চলেছেন; ' ভাই সকল, আমার কথা শোন, স্মরণ করো, আল্লাহর নির্দেশ প্রতিটি মুসলমানের প্রতি 'আর এভাবেই আমি তোমাদেরকে একটি মধ্যপন্থী গোষ্ঠী বানিয়েছি যেন তোমরা মানুষের জন্য সাক্ষ্যদাতা হও, আর রাসূল হন তোমাদের জন্য সাক্ষ্যদাতা' (বাকারাহ - ১৪৩)

তোমরা কি ভুলে গেলে, কুরআনে আল্লাহ নির্দেশ; 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দেন যে, তোমরা যেন প্রাপ্য আমানত সমূহ প্রাপকদের কাছে পৌছে দাও। আর যখন তোমরা মানুষের মধ্যে কোন মিমাংশা করতে আরম্ভ কর-তখন মিমাংসা কর ন্যায় ভিত্তিক। আল্লাহ তোমাদের সদুপদেশ দান করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু দেখেন ও শোনেন। (সুরা নিসা- ৫৮)'

তোমরা কি আল কুরআনে পড়নি? যেখানে তোমাদের জন্য সুস্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে; 'হে ঈমানদারগণ, তোমরা ন্যায়ের উপরে টিকে থাক, আল্লাহর খাতিরে ন্যায়সঙ্গত সাক্ষ্য দান করো, তাতে তোমার নিজের পিতা মাতা, বা নিকটজন আত্মীয় স্বজনের বিরুদ্ধেও যায়, তবুও। কেহ যদি ধনী বা গরীব হয় তবে তোমাদের চেয়ে আল্লাহই তাদের বেশী শুভাকাঙ্ক্ষী। অতএব বিচার করতে যেয়ে তোমরা নিজেদের কামনা বাসনার অনুসরণ করো না। এবং তোমরা যদি ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে কথা কথা বলো বা পাশ কাটিয়ে যাও তবে (জেনে রাখ) আল্লাহ তোমাদের সকল কাজ কর্ম সম্বন্ধে পূর্ণমাত্রায় অবগত (সুরা নিসা- ১৩৫)'

রক্তাক্ত ইমাম বলে চলেছেন; 'ভাই সকল, তোমাদের ক্ষোভ বুঝি, কিন্তু মিথ্যার মধ্যে কোন কল্যাণ নেই, একজন মুসলমান হিসেবে এর ধারে কাছেও আমি যেতে পারি না, তোমাদেরকেও যেতে দিতে পারি না। মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ে অপরের জমি বাগিয়ে সেখানে মসজিদ বানানোর কথা কোন মুসলমান চিন্তাও করতে পারে না। এটা ইসলাম নয়, পরের জমি অন্যায়ভাবে গ্রাসের সুযোগ ইসলামে নেই। সে চিন্তাও পাপ!'

কিন্তু হায়, ততক্ষণে ইমাম সাহেবের করুণ দশা। আহত, রক্তাক্ত! উত্তেজিত মুসলমানরা তার কোন কথাই শুনতে প্রস্তুত নয়! এমন সময়ে অদূরে দাড়ানো হিন্দুরা, যারা আজকের মামলায় বিজয়ি হয়ে জমির মালিকানা পেয়েছে, তারা এগিয়ে এসে

www.pathagar.com

ইমামকে উদ্ধার ও পরিচর্যা করলেন। এবং সেখানেই তাদের নেতৃস্থানীয় একজনের উদ্যোগে ইমাম সাহেবের কাছে নিবেদন করলেন আদালত থেকে পাওয়া জমির কাগজ পত্র। বললেন;

'হুজুর, আমরা আপনার সততায় মুগ্ধ। আমরা 'আপনার মত' হতে চাই। আপনার উপরে আক্রমণকারী ঐ মুসলমানদের মত নয়, 'আপনার মত' মুসলমান হতে চাই। এই জমি গ্রহণ করুন, এখানে মসজিদ বানান। আর আমাদেরসহ, আমাদের সন্তানদেরকে আপনার মত মুসলমান বানান। আমরা আপনার ধর্মে দীক্ষিত হতে চাই!'

ইমাম সাহেবের উপরে আক্রমণকারী ক্রোধোন্মত্ত মুসলমানরা অবাক বিস্ময়ে দেখল, পুরো গ্রামের কয়েক শত হিন্দু ইমাম সাহেবের সামনে কলেমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেল এক এক করে! বিস্ময়ে হতবাক তাদের মুখে কথা নেই! যে জমিটা পেতে তারা ছল চাতুরীর কমতি করেনি, সেই জমিই হিন্দুরা স্বেচ্ছায় ইমাম সাহেবের হাতে তুলেই দিল না কেবল, বরং সকলেই স্বেচ্ছায় মুসলমান হয়ে গেল!

এভাবেই ভারতে ইসলাম ছড়িয়েছে। এরকমই হয়। ইসলাম আল্লাহ'র মনোনিত ধর্ম। সকল মানুষের, সর্বকালের জন্য নির্ধারিত ধর্ম। এর মাঝে যে ন্যায় বিচার, যে উদারতা, যে ভাতৃত্ববোধ লুকিয়ে আছে তা উপস্থাপন করা গেলে স্থান, কাল, পাত্র, ধর্ম, বর্ণ, নির্বিশেষে সকলকে বিমোহিত করে দেয়। ভেতরের মানবিক সত্তাটিকেই পরাভূত করে।

আসলেই ইসলাম মানুষের মনকে জয় করে, তার অন্তরকে কব্জা করে আগে। আর এভাবেই ইসলাম ছড়িয়েছে পুরো বিশ্বে। খোজ নিলে দেখবে, ফিলিপিনস এ কোন মুসলিম আর্মি যায়নি কোনদিনও। তেমনি ইন্দোনেশিয়াতেও নয়। এসব জায়গাতেও বিশ্বের অন্যান্য জায়গার মতই ইসলাম তার মানবতা, মহানুভবতা, আর উন্নত নৈতিকতার জোরে মানুষের অন্তরকে জয় করেছে।

মানুষ চায় মর্যাদা, সম্মান, শোষণ-অবিচার -জুলুম থেকে মুক্তি, ন্যায্য অধিকার। ইসলাম সেই সম্মান, অধিকার আর মুক্তি দিয়েছে মানুষকে, এভাবেই সে যুগে যুগে তাদের অন্তর জয় করেছে। এর বিস্তারে তরবারীর প্রয়োজন পড়েনি, পড়েও না। অথচ অজ্ঞতা কিংবা বিদ্বেষের কারণে অপপ্রচার ঠিকই চলেছে বিশ্ব জুড়ে, ইসলাম নাকি বল প্রয়োগে বিস্তার লাভ করেছে, ছড়িয়েছে তরবারীর জোরে। তোমার দোষ দেব না জেমা, এমনকি তোমাদের পোপও সেরকম কথাই বলেছিলেন ক'বসর আগে।

www.pathagar.com

আমার কথার মাঝেই আমাকে থামিয়ে দিলেন মেলেনি জনসন, আমাকে অবাক করে দিয়ে তিনি বলে উঠলেন; 'জিয়া, পোপের সেই বক্তব্যের জবাবে তাঁকে লেখা তোমার চমৎকার চিঠিটা আমি পড়েছি।' মেলেনির কথা শুনে অবাক হলাম। ভাবতে থাকলাম তিনি কোথা থেকে আমার লেখা চিঠিটি পেলেন? অবাক হবার ঘোর যেন কাটছেই না, জানতে চাইলাম; 'তুমি সে চিঠি কোথা থেকে পেলে? তখন তো তুমি এখানে ছিলেই না।'

'আমাকে পত্রিকার সেই সংখাটা ফারিহা দিয়েছিলেন পড়তে' মেলেনির জবাব। এতক্ষণে বুঝলাম ফারিহার কাছ থেকেই মেলেনি 'নিউ ভয়েস' এর সেই সংখ্যাটি পেয়েছেন এবং পোপ'কে লেখা আমার চিঠিটা পড়েছেন।

সম্ভবত ২০০৬ সালের দিকে তৎকালীন পোপ হঠাৎ করেই মন্তব্য করে বসেন, ইসলাম সন্ত্রাসের ধর্ম আর সন্ত্রাসের মাধ্যমেই এর বিস্তার। এ নিয়ে তখন সারা বিশ্বময় দারুণ প্রতিক্রিয়া হয়। বিশ্বের মুসলমানরা পোপের সেই মন্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ করে। আমিও লন্ডনের বাংলা পত্রিকায় পোপের উক্ত মন্তব্যের জবাব দিয়ে একটা আর্টিকেল লিখেছিলাম। উক্ত আর্টিকেলটা ফারিহার সাথে কর্মরত এক ব্রিটিশ বাংলাদেশী মহিলা ইংরেজি অনূবাদ করে তা তাদের 'নিউ ভয়েস' র একটা সংখায় ছাপিয়েছিলেন।

বিশ্ব যখন ভীষণ সাম্প্রদায়ীক উত্তেজনা, পারস্পরিক অবিশ্বাস, অনাস্থা এবং সংঘাতময় পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, আটলান্টিকের অপরপাড়ের টাইরান্ট, বুশ গং কর্তৃক সন্ত্রাসবিরোধি যুদ্ধের নামে যে সন্ত্রাস সৃষ্টি করা হয়েছে এবং এই সন্ত্রাসরুপী 'ওয়ার অন টেরর' শুরু আগে বুশ কর্তৃক মুখ ফসকে বলে ফেলা 'ক্রুসেড' অভিধাটি যখন মুসলিম মানসপট হতে মিলিয়ে যায়নি! সেই তখন মহামান্য পোপ কর্তৃক ইসলামের উপরে এই জঘণ্য আক্রমণ অপ্রত্যাশিত, অনাকাংক্ষিত এবং অকল্পনীয় একটি ঘটনা!

তের

মাননীয় পোপ, আপনি কেবলমাত্র ইসলামকে আক্রমণ করেই ক্ষান্ত হননি, বরং প্রশ্ন রেখেছেন মুহাম্মদ (সঃ) এ বিশ্বকে অকল্যাণ আর অমানবিকতা ছাড়া আর কি দিয়েছেন? বলে! অবশ্য আপনি একথাটিও বলে রেখেছেন যে, প্রশ্নটি আপনার নয়, বরং চতুর্দশ শতাব্দীর খৃষ্টীয় সম্রাট দ্বিতীয় ম্যানুয়েল এর! একজন ধর্মীয় নেতা হওয়া

www.pathagar.com

স্বত্তেও এ ক্ষেত্রে আপনি যে রাজনৈতিক চাতুর্যের আশ্রয় নিয়েছেন, তা এ বিশ্বের যে কোন উম্মী লোকও বুঝতে পারে মাননীয় পোপ!

আপনার বক্তব্যে আপনি তরবারীর সাহায্যে ইসলাম বিস্তার লাভ করেছে এমন ধারনাই দেবার চেষ্টা করেছেন। আপনি বলপূর্বক ধর্মান্তকরণের কথা বলেছেন এবং এটা স্পষ্ট যে, একথাটিই বলতে চেয়েছেন যে, ইসলাম শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমেই বিস্তৃতি লাভ করেছে! বলেছেন Violence is incompatible with the nature of God and the nature of the soul. 'সন্ত্রাস মানব চরিত্রের সাথে সঙ্গতীপূর্ণ নয়'

মাননীয় পোপ, আমরা আপনাকে সবিনয়ে জানিয়ে রাখতে চাই যে, আমরা যে ইসলামের অনুসারী, সেই ইসলাম আমাদেরকে 'লা ইকরাহা ফি দ্বীন' বলে এমন অকাট্য নির্দেশ দিয়ে রেখেছে যে, কোনদিন কোন মুসলমান কল্পনাও করতে পারেন না বলপ্রয়োগে ধর্মান্তকরণের বিষয়টি।

ইসলাম যদি শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমেই বিস্তৃতি লাভ করে থাকত, তবে সাতশত বসর ভারত শাসন করেও তারা সেখানে সংখ্যালঘু হত না। বল প্রয়োগের দ্বারা ধর্ম প্রচারের ফলে কি অবস্থা হয় তা বুঝতে হলে পুরো ভারতে হিন্দুদের দ্বারা শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে বৌদ্ধদের কিভাবে ভারত থেকে তাড়িয়ে দেয়া হয়েছে, সে ইতিহাস দেখতে হবে। দেখতে হবে, মুসলিম শাসিত স্পেন কিভাবে মুসলিম শূন্য করা হয়েছে খৃষ্টানদের দ্বারা, সে বিষয়টি।

দেখতে হবে এককালের মুসলিম রাষ্ট্র মারদেকা (বর্তমান ফিলিপিনস)কে কিভাবে ধর্মান্তরিত করে খৃষ্ট রাষ্ট্র করা হয়েছে, সে বিষয়টি! দেখতে হবে তিনশত বৎসরে আফ্রিকায় ঔপনিবেশিক শাসনে কিভাবে মুসলমান সহ স্থানীয় পৌত্তলিক ও অন্যান্যধর্মীদের ধরে ধরে গা'র জোর কিংবা প্রলোভনে ফেলে খৃষ্টান বানানো হয়েছে, সে বিষয়টি!

জনাব পোপ, স্পেন বা জেরুজালেম বা সিরিয়ায় খৃষ্টিয় ক্রুসেডারদের দ্বারা কি আচরণ করা হয়েছে মুসলমান এবং ইহুদিদের প্রতি, সে কথা আপনার নিশ্চয়ই অজানা নয়, তার পরেও আপনার জ্ঞাতার্থে কেবলমাত্র একটি উদাহরণই তুলে ধরব। তার আগে আপনাকে একথাটিও জানিয়ে রাখি যে, কোন মুসলমান ঐতিহাসিকের রচনা হতে উদ্ধৃতি দেব না, পাছে আবার আপনার সন্দেহ হয় তার যথার্থতা নিয়ে! আমি বরং একজন খৃষ্টান, Prof. Hans Ebehard Mayer কর্তৃক রচিত ক্রুসেডের ইতিহাস হতে একটি ছোট্ট উদ্ধৃতি তুলে ধরছি, লক্ষ্য করুন তিনি কি বলতে চান;

www.pathagar.com

.... The governor and his retinue were the only Muslims to escape alive. The intoxication of victory, religious fanaticism and the memory of hard ship bottled up for three years exploded in a horrifying of blood bath in which the crusaders hacked down every one, irrespective of race or religion who was unfortunate enough to come within reach of their sword's. They wedded ankle deep in blood through streets covered with bodies...The Muslim was profoundly shocked by this Christian barbarity. It was a long time before the memory of this massacre began to fade. (The Crusades, Hans Edhered Mayer, page no. 60)

ভাবানূবাদঃ 'গভর্নর ও তার সভাসদবর্গই ছিলেন পালিয়ে বাঁচা একমাত্র জীবিত মুসলমান। বিজয়ের উন্মত্ততা, ধর্মীয় গোড়ামী, এবং তিন বসর ধরে চেপে রাখা কষ্টের স্মৃতি বিস্ফোরতি হলো ভয়ংকর এক রক্তপাতের মধ্য দিয়ে, যাতে ক্রুসেডারগণ টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলল ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষকে, দূর্ভাগ্যক্রমে যারাই তাদের তরবারীর নাগালের মধ্যে এসে পড়ল, তাদের। মৃতদেহে ছেয়ে যাওয়া রাস্তায় পা'র গোড়ালি সমান রক্তের ভেতর দিয়ে অতি কষ্টে তারা হেঁটে যেতে লাগল---। খৃষ্টানদের এ হেন বর্বরতায় গভীরভাবে হতবাক হয়ে গেল মুসলিম দুনিয়া। দীর্ঘ সময় লেগেছিল হত্যাকান্ডের এ স্মৃতি মিলিয়ে যেতে।' (দ্রষ্টব্যঃ The Crusades, Hans Edhered Mayer, পৃষ্ঠাঃ ৬০)

এই বর্বরতা আর নৃশংসতার জন্য আমরা কিন্তু খৃষ্ট ধর্ম'কে যেমন দোষারোপ করি না, তেমনি অবশ্যই যীশু খৃষ্ট হজরত ইসা (আঃ) এর উপরেও এ বর্বরতার দায়িত্ব চাপাই না। কারণ আমরা জানি, তিনি একজন সম্মানিত নবী ছিলেন এবং আমরা তার উপরে বিশ্বাস পোষণকারী মুসলমান!

মাননীয় পোপ, আপনি কি স্মরণ করে দেখতে ও দেখাতে পারেন, বিশ্ব ইতিহাসে কোনদিন মুসলমানরা কোন ইহুদীকে বা খৃষ্টানকে পুড়িয়ে মেরেছে? ইনকুইজিশনের নামে পুড়িয়ে মারাটা মুসলমানদের নয়, বরং আপনাদের, খৃষ্টানদের ইতিহাস, পোপের অনুমোদনেই পুড়িয়ে মারা হয়েছে লক্ষ লক্ষ ইহুদি, মুসলমান আর প্যাগানকে, তা আপনি ভাল করেই জানেন। আপনি কি দেখাতে পারবেন, কোন বিজীত দেশে মুসলমানদের হাতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় তাদের স্বকীয়তা হারিয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে?

www.pathagar.com

আপনি বোধ হয় জানেন যে, আপনাদের হাতে তাড়া খেয়ে স্পেন হতে বিতাড়িত, জান নিয়ে পালিয়ে আসা ইহুদিদের বিগত ছয়শত বসরাধিকাল ধরে আশ্রয় দিয়ে চলেছে মুসলিম বিশ্ব! খোদ মরক্কো আর মিশরে খোঁজ নিলেই তার সত্যতা জানতে পারবেন!

আপনার যৌবনের সময়কালটা স্মরণ করুন মাননীয় পোপ, যখন আপনি ফ্যাসিষ্ট হিটলারের যুবকমান্ডের একজন জাদরেল কর্মী ছিলেন, তখন আপনার আমলেই কিন্তু লক্ষ লক্ষ ইহুদিদের হত্যা করা হয়েছে! নিশ্চয়ই আপনার সেকথা স্মরণ আছে, তা অবশ্য থাকারই কথা! কারণ আপনি নিজেই সেই ঘাতক বাহিনীর একজন কর্মী ছিলেন। আপনার চোখের সামনেই আজ যখন ফিলিস্তিনে ধরে ধরে মুসলমানদের হত্যা করা হলো এবং এখনও হচ্ছে, তখন কিন্তু আপনি বলেন নি; Violence is incompatible with the nature of God and the nature of the soul.

মাত্র ক'টি বসর আগে এই ইউরোপের বুকেই পুরো বিশ্ববাসীর চোখের সামনে, এমনকি আপনার নিজের চোখের সামনেই বসনিয়া, কসোভোতে যে বর্বরতা চালানো হলো! সে কথা নিশ্চয় স্মরণ আছে মাননীয় পোপ, কারা সে বর্বরতা চালিয়েছিল? কেন এবং কোন সম্প্রদায়ের উপরে সেই বর্বরতা চালানো হয়েছিল? সে কথাও নিশ্চয়ই আপনার অজানা নেই! ধর্মবিশ্বাসে তারা কারা ছিল? তাও আপনি খুব ভালো করেই জানেন, তখন আপনি ভ্যাটিক্যানের কার্ডিনাল হিসেবে দ্বায়ীত্ব পালনরত, তখনও আপনি একথাটি আপনার অনুসারীদের কানে তুলে দেননি। দিলে হয়ত কিছু মুসলমানের জীবন বাঁচত!

আজ যখন ইরাক, আফগানিস্থান জুড়ে প্রতিদিন শত শত নীরিহ মানুষ হত্যা করা হচ্ছে তখনও আপনার কোন বক্তব্য নেই, কোন কার্যকর পদক্ষেপ নেই। আপনি আজ আরও অনেক বড় পদে আসীন, কিন্তু একটিবারের জন্যও কি আপনার অনুসারীদের কিংবা বিশ্ববাসীর উদ্দেশ্যে বললেন যে; Violence is incompatible with the nature of God and the nature of the soul.

আপনার মুখে টু শব্দটি নেই সে ব্যাপারে! কেন নেই, তা আপনি না বললেও আমরা খুব ভালো করেই জানি! নেই, কারণ, যারা মরছে তারা মুসলমান, বিশ্বে ঐ আপদ(!) যত কমে ততই বিশ্বের মঙ্গল! তারা বিশ্বের আপদ! কারণ, তারা ইসালামের অনুসারী! আর ইসলামকে যে আপনি সন্ত্রাসের সমার্থক বলে মনে করেন! ২০০১ সালে নিউইয়র্কে সন্ত্রাসী আক্রমণের পরে আপনি নিজেই ভ্যাটিকান রেডিওর সাথে স্বাক্ষাৎকারে বলেছেন "It is important not to attribute simplistically

www.pathagar.com

what happened on 11 September to Islam. "It is true that the history of Islam also contains a tendency to violence, but there are other aspects, too - a real openness to the will of God. "

এখানেও আপনি ইসলামকে সন্ত্রাসের সমার্থক করে দেখেছেন এবং দেখাবার চেষ্টা করেছেন! আমরা আপনার মানসিকতা জানি বলেই যখন জার্মানিতে গেল সপ্তাহে সেই চতুর্দশ শতাব্দীর এক খৃষ্ট সম্রাটের উক্তির আড়ালে আপনার বিবৃতি চালিয়ে দিতে চেয়েছেন, বর্তমান বিশ্ব রাজনৈতিক আবহের প্রেক্ষাপটে একটা বিরাট সুযোগ নিতে চেয়েছেন, তখন আপনার আসল উদ্দেশ্যটুকু বুঝে উঠতে আমাদের এতটুকুও অসুবিধা হয়নি মাননীয় পোপ!

আপনি যতই ইসলামকে সন্ত্রাস আর অকল্যাণের উৎস বলে চালিয়ে দিতে চান না কেন, আপনার অনুসারী মুক্ত চিন্তা, ধর্মীয় সংকীর্ণতামুক্ত ও বিবেকসম্পন্ন মানুষ কিন্তু তা মনে করে না। তার মাত্র একটি প্রমাণ আমি আপনার সদয় অবগতির জন্য এই সংক্ষিপ্ত পরিসরে উপস্থাপন করছি, দেখুন;

"...We may feel certain that if Western Christians, instead of the Saracens and the Turks, had won the dominion over Asia, there would be today not a trace left of the Greek Church, and that they would never have tolerated Muhammadanism as the 'infidels' have tolerated Christianity there. We (Christians) enjoy the fine advantage of being far better versed than others in the art of killing, bombarding and exterminating the Human Race." (Bayle P., Dictionary, 'the article Mahomed', 1850)

ভাবানূবাদ: '--- এ ব্যাপারটা আমরা সুনিশ্চিত ভাবেই উপলব্ধী করতে পারি যে তুর্কীদের পরিবর্তে যদি পশ্চিমা খৃষ্টান (যে সময় ও প্রেক্ষাপটের বিবেচনায় কথাটা বলা হচ্ছে, তখনকার সময়ে পশ্চিমা খৃষ্টান বলতে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও জার্মানীর খৃষ্টান সমাজ, যারা মধ্যযুগীয় ক্রুসেডের আয়োজন ও নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত ছিল, তাদেরকেই বোঝানো হচ্ছে এখানে-লেখক) যদি এশিয়ার উপরে তাদের আধিপত্য বিস্তার করত, তা হলে আজ গ্রীক চার্চের কোন চিহ্নমাত্র অবশিষ্ঠ থাকত না (বিষয়টা বুঝতে হলে গ্রিক অর্থোডক্স, রোমান, প্রোটেষ্টান্ট এংলিকান চার্চের মধ্যে দ্বন্দ, সংঘাত ও বৈরীতার দীর্ঘ ইতিহাসকে বিবেচনায় নিতে হবে–লেখক)। তারা কক্ষণই মুসলমানদের অস্তিত্ব সহ্য করত না, যেমনটা খৃষ্টবাদে অবিশ্বাসীরা (মুসলমানদের বোঝানো হচ্ছে এখানে-

www.pathagar.com

লেখক) খৃষ্টানদের সহ্য করেছে।' আমরা খৃষ্টানরা অন্য যে কোন সম্প্রদায়ের চেয়ে মনুষ্য প্রজাতিকে হত্যা, নির্মূলে অনেক বেশী দক্ষতার দাবী করতে পারি! (এখানে বাইবেলের বিধানের নাম করে, ইশ্বরের ইচ্ছার নাম করে মধ্যযুগীয় ইনকুইজিশন কোর্টের মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ মুসলিম ও অন্যান্য বিরোধি মতাবলম্বীদের জীবন্ত আগুনে পুড়িয়ে হত্যার নৃশংসতম ঘটনাগুলোর দিকে ইংগিত করা হচ্ছে সম্ভবত -লেখক)'

এছাড়া আপনার আরও একটি মন্তব্য ছিল, আপনি বলতে চেয়েছেন এবং বলেছেনও যে, ইসলাম বিস্তার লাভ করেছে তরবারীর জোরে অর্থাৎ বল প্রয়োগে। সে মন্তব্যের জবাব আমি আপনাকে অনেক উদ্ধৃতি দিতে পারি। কিন্তু তা দেব না। আপনার ধৈর্যচ্যুতি ঘটাব না, আপনার মূল্যবান সময়ের অপচয় করাব না। বরং আমি আপনার সামনে কেবল মাত্র একটি উদ্ধৃতিই দেব। এই উদ্ধৃতিটিই আপনাকে বলে দেবে যে, ইসলাম কি? দয়া করে একবার অন্তত চোখ বুলিয়ে নিন;

"Islam appears to me like a perfect work of architecture. All its parts are harmoniously conceived to complement and support each other, nothing lacking, with the result of an absolute balance and solid composure. Everything in the teaching and postulates of Islam is in its proper place." (Islam at the Crossroads, p.5)

ভাবানূবাদঃ 'ইসলাম আমার কাছে একটা নিখূত শিল্পকর্ম বলে মনে হয়। এর প্রতিটি অংশই একে অপরের সহযোগী ও পরিপূরক, কোথাও কোন ঘাটতি নেই, আর এরই কারণে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই সার্বিক সুসামঞ্জস্যতা আর পরিপূর্ণতা। যথাযথ স্বত্বসিদ্ধতায় পূর্ণ ইসলামের প্রতিটি শিক্ষা'

আর সেই সাথে একটি প্রশ্নও রাখব, সেই প্রশ্নের উত্তরটি যদি আপনার জানা হয়, তাহলে আপনি এ কথাটিও জানতে পারবেন যে, ইসলাম কোন কারণে এবং কিভাবে এই বিশ্বের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে পড়েছে।

আজ যখন পুরো বিশ্ব জুড়েই মুসলমানদের সন্ত্রাসী নামে পরিচিত করানো হচ্ছে, মুসলমানদের যখন বিশ্বের আনাচে কানাচে আজ তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ানো হচ্ছে, এমনকি রাস্তা ঘাটে যান বাহন থেকে, প্লেন থেকে টেনে ধরে নামিয়ে দেয়া হচ্ছে! বলা নেই কওয়া নেই, কোন সাক্ষ্য প্রমাণ ছাড়াই ধরে ধরে আটকে রাখা হচ্ছে, মেরে ফেলা হচ্ছে, সেই তখন খোদ আমেরিকার বুকেই যে চলতি বৎসরের এই ক'মাসে (২০০৬ সালে এই চিঠিটি লেখার সময়কাল পর্যন্ত) প্রায় কুড়ি হাজার শেতাঙ্গ খৃষ্টান (আপনার

www.pathagar.com

অনুসারী!) ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে মুসলমান হয়ে গেল, কোন কারণে তারা এই বোকামি(!)টা করল?

২০০১ সালে নিউইয়র্কের টুইন টাওয়ারে সেই কুখ্যাত দূর্ঘটনার জন্য যে ইসলামকে দায়ী করে আপনি রেডিওতে বিবৃতি দিলেন, বুশ, ডিক চেনী, রাম্‌সফেল্ডসহ বিশ্বের আর সকল নেতা নেত্রী ও মিডিয়ার সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে, সেই দুর্ঘটনার মাত্র একটি বৎসরের মধ্যেই ঐ আমেরিকাতেই চৌত্রিশ হাজার খৃষ্টান (মাননীয় পোপ, আপনার চৌত্রিশ হাজার অনুসারী!) তাদের পৈত্রিক ধর্ম বিসর্জন দিয়ে ইসলাম (আপনার ভাষায় 'সন্ত্রাস'এর ধর্ম) গ্রহণ করে নিল! কেন তারা হঠকারিতা করতে গেল? কোন তরবারীর ভয়ে তারা এমন কাজটা করতে গেল বলে আপনি মনে করেন মাননীয় পোপ!

এই প্রশ্নের জবাবটি জানতে পারলেই আপনি জানতে পারবেন, কোন সেই তরবারী, যে তরবারীর তাড়া খেয়ে মানুষ দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করে? কোন সে শক্তি, যে শক্তির ভয়ে (!) মানুষ ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে যুগে যুগে এবং আজও তারা তা সাদরে, সাগ্রহে কবুল করে নিচ্ছে! জীবনের সব প্রলোভন ছেড়ে! মাননীয় পোপ, এ প্রশ্নের জবাবটা আপনার জানা হলে দয়া করে বিশ্বকেও তা জানিয়ে দেবেন, সে অনুরোধ থাকল।'

সংক্ষেপে এই ছিল সেই চিঠি। বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের প্রচন্ড প্রতিবাদের মূখে পোপ শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়েই তার বক্তব্যের জন্য ক্ষমা চেয়েছিলেন মুসলমানদের কাছে। তার পক্ষ থেকে ভ্যাটিকান সে বিবৃতি সারা বিশ্বময় প্রচারও করেছিল। সে জন্য তাকে পুরো মুসলিম কমিউনিটির পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

কিছুদিন আগ পর্যন্ত খোদ আমেরিকান সরকারই বলে এসেছেন যে, আমেরিকাতে বসরে প্রায় কুড়ি হাজার মত আমেরিকান ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়ে থাকেন। আর গেল কয়েক বসরে ইসলাম নিয়ে আকাশচুম্বী নেতীবাচক প্রচারণা চলছে, চালানো হচ্ছে। বলা হচ্ছে, ইসলাম নাকি নারীদের সবচেয়ে বেশী নির্যাতন করে, তাদের পরাধীন করে রাখে, যথাযথ মানবিক অধিকার দেয় না, তাদের স্বাধীনতা খর্ব করে। ইত্যাদি ইত্যাদি।

কিন্তু এতরকম নেতীবাচক প্রচারণা চালানো সত্ত্বেও মুসলমান হিসেবে জীবন যাপন করাটা কঠিন করে ফেলা সত্ত্বেও, বসরে সেই কুড়ি হাজার ধর্মান্তকরণের হার বেড়ে এখন প্রায় সত্তর হাজারে পৌছেছে। আর সারা বিশ্বকে অবাক করে দিয়ে সেই সংখাটিও অতীতের সকল সংখ্যাকে ছাড়িয়ে গেল গত বৎসর, অর্থাৎ ২০০৯ এ, এক

www.pathagar.com

লক্ষ ষোল হাজারে গিয়ে ঠেকেছে। অর্থাৎ এক ২০০৯ সালেই আমেরিকাতে এক লক্ষ ষোল হাজার (অবশ্য অন্য একটি হিসেবে এ সংখাটিকে নব্বুই হাজার হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে) আমেরিকান ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হয়েছেন।

সমাজের প্রতিটি স্তর থেকে নারী পুরুষ, সাধারণ শ্রমজীবি মানুষ, কিংবা সিনেমার নায়ক নায়িকা, খেলা ধুলার জগত থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রী, শিক্ষক, বৈজ্ঞানিক, গবেষক, পাদ্রী, ধর্ম যাজক, নাসার বিজ্ঞানী, আর্মির সৈনিক, সকল স্তরের মানুষ ইসলাম গ্রহণ করছে। আর এরা প্রত্যেকেই ইসলাম গ্রহণ করেই লেগে পড়ছে তাকে আরও ভালভাবে জানতে, শিখতে। তারা পড়া শোনা করছে, কেবল নিজে ইসলাম পালন করার জন্যই নয়, বরং তা তাদের আশে পাশের মানুষের কাছে তা তুলে ধরতে!

তারা মুসলমান হয়ে নিজেরাই লেগে পড়েছে আশে পাশের মানুষের কাছে তা তুলে ধরতে! হাজার হাজার নও মুসলিমরা ইসলাম তুলে ধরছে। তাদেরই ক'জন নিউইয়র্কের ব্যস্ত রাস্তায় প্রকাশ্য দিবালোকে ফুটপাতেরই এক কোণায় দাঁড়িয়েছেন, নামাজ এ। চলমান হাজারো নারী পুরুষ চেয়ে চেয়ে দেখছে চমৎকার দৃশ্যটি! নামাজ শেষে যার যার পথে পা বাড়াল। কোন জড়তা, হীনমন্যতা নেই। ডকুমেন্টারী ফিল্ম বানাতে পাশেই ছিল টিভি সাংবাদিক'সহ ক্যামেরা ক্রু'র দল। তারা সে ঘটনাকে ক্যামেরাবন্দী করে ফেলল এরই মধ্যে! তাদের বদৌলতে বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ দেখল আমেরিকার রাস্তায় বিস্ময়কর দৃশ্যটি। আমিও দেখেছি বিস্মিত দু'চোখে চেয়ে!

হাভার্ড ইউনিভার্সিটির ধর্মতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক Dr. Jerald f Dirk ধর্মতত্ত্ব, খৃষ্টবাদ, এসব বিষয়ে অগাধ পান্ডিত্য নিয়েই মুসলমান হয়েছেন বৃদ্ধ বয়সে। আমেরিকান জনগণ আর গণমাধ্যমে তিনি অতি পরিচিত একটা মুখ, পুরো আমেরিকা চষে বেড়াচ্ছেন, সভা সেমিনারে ভাষণ দিচ্ছেন বাইবেল, কুরআন আর তাওরাত নিয়ে, আর তা শুনে শত শত আমেরিকান প্রতিদিনই মুসলমান হচ্ছেন! কে ঠেকাবে তাঁকে আজ? কোন অধিকারে এবং কি ভাবে?

একজন নামকরা সংগীত শিল্পী, অতি পরিচিত মডেল, Nichole Queen কে আমেরিকান কোন যুবক যুবতী, তরুণ তরুণী চেনে না বলতে পার? কেবল আমেরিকাই'বা বলি কেন? কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, ইউকে, ইংরেজীভাষী কোন জনপদের লোকজন তাকে চেনে না, বল দেখি? তোমরাও তার গান, নাচ, দেখেছ টিভিতে, হয়ত তার গানের সিডিও থেকে থাকবে তোমাদের সংগ্রহে।

www.pathagar.com

এই সুন্দরী মডেল শিল্পীর কিসের অভাব ছিল? Dallas নগরীর এই যুবতী আজ সকল বন্ধণকে স্বেচ্ছায় ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। নিজের একটা ব্লগও তৈরী করেছেন। বিশ্বময় তাঁর লক্ষ লক্ষ ভক্ত সেই ব্লগে গিয়ে প্রশ্ন করে জেনে নিচ্ছে ইসলাম। কেউ বা তার ব্লগে তাকে গালাগালও করছে, কেউবা নিছক কৌতুহলী হয়েই জানতে চাচ্ছে ইসলাম নিয়ে, কিংবা ধর্মান্তরীত হবার কারণ।

Angela Collen নামের এক আমেরিকান নারী। আরও হাজার হাজার নারীর মত তিনিও মুসলমান হয়েছেন। এখানেই থেমে থাকেন নি। আরবি ভাষা শিখেছেন, শিখেছেন কুরআন হাদীস, আর আজ তিনি নিজেই নেমে পড়েছেন ইসলাম প্রচারে! প্রতিষ্ঠা করেছেন Los Angels এ Islamic School | তা আজ বিখ্যাত একটা ইসলামি শিক্ষা কেন্দ্র। শিশু কিশোর থেকে শুরু করে ছিয়াত্তর বসরের বুড়িও সেখানে ইসলাম শিখছেন।

আমেরিকান সেই বুড়ি মুসলমান হয়ে আক্ষেপে কাঁদলেন, আরও আগে কেন কুরআনের সংস্পর্শে আসেন নি? আরও আগে কেন কেউ তাঁকে কুরআনের খবরটি দিল না? সে আক্ষেপেই কাঁদলেন! এই কান্নার দৃশ্য প্রত্যেক মুসলমানের জন্যই লজ্জার। সে লজ্জায় আমাদেরকে একদিন কাঁদতেই হবে। কাঁদতে হবে বিশ্ববাসীর কাছে ইসলামের আহ্বান কেন তুলে ধরলাম না, এর জবাব দিতে গিয়ে।

আমাদের প্রধান দায়িত্বই ছিল এটা। মুসলমানদের সৃষ্টিই এই একটামাত্র কারণে, তাদের সার্বক্ষণিক দায়িত্বই হলো, তোমাদের সামনে, তুমি জেমা, মেলেনি কিংবা তোমার পাশে মারজুরী, সুষমা, তোমাদের কাছে কথা-কাজ, আচার-আচরণের মাধ্যমে ইসলাম তুলে ধরবে। কিন্তু তারা তা করছে না, পারছেও না।

এ কারণেই মুসলমানদের জিল্লতি। স্বীকার করি বা না করি, এটাই বস্তবতা। এই জিল্লতিই আজকের মুসলমানরা ব্যাক্তি, পারিবারিক, সামাজিক ও সামষ্ঠিক জীবনে বয়ে বেড়াচ্ছি। বিশ্বের যেদিকেই তাকাবে, দেখবে মুসলমানরা অভাবে-অনটনে, ক্ষুধা-তৃষ্ণায়, অজ্ঞানতার অভিশাপে জর্জরিত, বিপর্যস্থ।

এখানেই শেষ নয় বরং আরও আছে। ওপারের জীবনে অপেক্ষা করছে আরও বড়, ব্যাপক শাস্তি। সে শাস্তির মুখোমুখি হয়ে আমাদেরকে আক্ষেপে, অনুতাপে কাঁদতে হবে সন্দেহ নেই। হায়, তার আগেই যদি সময়মত কাঁদতে পারতাম! একদিন কাঁদতে হবেই, সেই চেতনায়, সেই ভয়ে যদি কাঁদতে পারতাম! কাঁদতে যদি পারতাম আমার রবের কাছে প্রাণ খুলে! গোপনে-নিভৃতে!

www.pathagar.com

চৌদ্দ

কান্না। ছোট্ট শব্দ। জীবনের সাথে জড়িয়ে আছে কান্না। মানুষ হিসেবে জন্মের সাথে সাথেই কান্না দিয়েই বিশ্বকে জানান দিয়েছিলাম, আমি এসেছি, আমি উপস্থিত তোমাদের মাঝে! জন্মের পরমহুর্তে আমি কেঁদেছি বলেই না আমার মমতাময়ী মা, আত্মীয় স্বজন সেদিন তৃপ্তির হাসি হেসেছিলেন! আনন্দের হাসি!

কবি কত সুন্দর করে সে চিত্র এঁকেছেন কাব্যে। দুর্বল স্মৃতিশক্তির কারণে সেই বিখ্যাত পংক্তিটি হুবহু মনে নেই, তবে খুব সম্ভবত এরকমই হবে,

এ ভবে প্রথম তুমি এসেছিলে যবে;

কেঁদেছিলে তুমি একা, হেসেছিল সবে।

এমন জীবন তুমি করিবে গঠন

মরণে হাসিবে একা, কাঁদিবে ভুবন।

উদ্ধৃতিতে কোন ভুল হলে হতেও পারে। তবে পংক্তিটির মর্মবাণী বুঝতে ভুল হয়নি। সম্ভবত করোরই ভুল হবার কথা নয়।

আমরা কাঁদি, মানুষই কাঁদে। ছোটকালে এই কান্না'ই ছিল সবচেয়ে মোক্ষম, কার্যকর অস্ত্র! অস্বস্তি বিরক্তি, ক্ষুধা-তৃষ্ণা, ব্যথা-বেদনা, যন্ত্রণা সব ঐ একটি অস্ফুট কিন্তু বলাই বাহুল্য, অতি পরিচিত শব্দ 'কান্না' দ্বারা প্রকাশ করলেই বাবা-মা, ভাই-বোন, দাদা-দাদী, নানা-নানী সবাই কাজ ছেড়ে ত্বড়িৎ ক্ষিপ্রতায় ছুটে এসেছেন আমাদের অসুবিধা দুর করতে! কান্নার কারণ খুঁজে দেখতে! মা-বাবাতো ভেবেই অস্থির, যতক্ষণ না কান্না থামিয়েছি, তাঁদের স্বস্তি নেই! আর দাদা-দাদী, নানা-নানীরা উঠোন পারের ওঘর হতে হাঁক ছেড়েছেন 'আরে হলোটা কি? ও কাঁদছে কেন? ওকে তোমরা দেখছ না কেন? ইত্যাদি ইত্যাদি।

ছোটকালে মা-বাবার কাছে খেলনার বায়না ধরে না পেলে, বন্ধুদের সাথে পিকনিকে যাব, মা তার টাকা না দিলে, ক্রিকেট খেলার ব্যাট কিনব, তার টাকাটা না পেলে কিংবা ঈদের বায়না মনমত না মেটানো হলে আমরা ক্ষোভে, অভিমানে কেঁদেছি। এই কান্না দিয়েই বাবা মা'র মন গলিয়ে সব আদায় করেছি। এই দৃশ্য আমাদের জীবনেই

www.pathagar.com

এতটাই পরিচিত যে, এগুলোকে আর অস্বাভাবিক বলে মনে হয় না। কান্না আমাদের সাথী. আমরা ছাড়তে চাইলেও সে আমাদের ছাড়ে না। ফলে দুঃখ-কষ্টে, অভাবে-অনটনে, ব্যাথা-বেদনায় বা লাঞ্ছনা-গঞ্জনায় আমাদেরকে কাঁদতেই হয় ।

আমরা আনন্দেও কাঁদি! অপ্রত্যাশিতভাবে আশাভীত সাফল্যে হাসার বদলে আগে কাঁদি! স্কুল কলেজ বা ভার্সিটিতে ধারণাভীত ফলাফলে আমরা আবেগে-আনন্দে কাঁদি, কান্না দিয়েই সুখানুভূতি প্রকাশ করি। দীর্ঘ বিরহের অবসানে, দেশে দেশে, যুগে যুগে গুলাগ, গুয়ানতানামো, বেলমারশ বা আবুগারীব থেকে মুক্তির আনন্দে মানুষ কাঁদে! স্ত্রী-পুত্র-কন্যা, বাবা-মা, ভাই-বোনের সাথে মিলনে কাঁদে! সুখে, আনন্দে মুখের কোণে হাঁসি থাকলেও চোখে নামে আষাঢ়ের ঢল!

ক্ষুদ্র বা বৃহত্তর পরিসরে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক নিষ্পেষণে জর্জরিত জনগোষ্ঠি যখন মুক্তির সুনিশ্চিত আলো দেখে, তখন আসন্ন সে মুক্তির আনন্দে তারা হাঁসার বদলে আগে কাঁদে! এমনটাই সেদিন দেখলাম, বিয়াল্লিশ জন চাইনিজ পুরুষ, একত্রে ইসলাম কবুল করলেন, তাদের কয়েকজনকে দেখলাম আনন্দে কাঁদছেন। তারও ক'দিন পরে জার্মানিতে, কয়েকজন জার্মানকে দেখলাম ইসলাম কবুল করছেন, তাদেরই একজন শাহাদা উচ্চারণের সময় আবেগে, আনন্দে কাঁদছেন।

বিবিসি টেলিভিশনের এক মহিলা সাংবাদিককে তার সউদি বন্ধু সন্ধার সময় এক উঁচু ভবনের ছাদে নিয়ে জেদ্দা শহর দেখাচ্ছিলেন। এক ডকুমেন্টারী ফিল্মের জন্য জেদ্দা'র ছবি ধারণ চলছিল। সেটা ছিল মাগরিবের সময়। ক্যামেরা ক্রু'সহ তাঁরা ছাদের উপরে থাকতেই থাকতেই শত শত মসজিদ থেকে ভেসে আসল আজান, তা শুনে সেই মহিলা সাংবাদিক, যিনি ব্রিটেন থেকে গেছেন সংবাদ কভার করতে, হতভম্ব হয়ে গেলে সউদি বন্ধু জানালেন এটা আজান, মসজিদ থেকে ভেসে আসছে। আশে পাশের মুসলমানদের জানাতে যে, নামাজের সময় হলো।

ব্যাখা শুনে পাগলের মত চেয়ে দেখতে দেখতে ক্যমেরার সামনেই কেদে ফেললেন। আজান শোনার সাথে সাথে আশে পাশের বাড়ী, দোকান-পাট থেকে দলে দলে মানুষ বেরিয়ে মসজিদে ছুটছে, নামাজের জন্য। দৃশ্যটি ক্যামেরাবন্দী করলেন কিন্তু ক্যমোরার সামনে নিজের কান্নাকে লুকোতে পারলেন না। আবেগে কেঁদে ফেলার কারণে ক্ষমাও চাইলেন। দৃশ্যটি দেখে আমার নিজেরই যেন কান্না পাচ্ছিল। জীবনে কতবার আজান শুনেছি কিন্তু এরকম অভিব্যক্তি কখনও হয়নি!

www.pathagar.com

সম্প্রতি সোভিয়েত রাশিয়ার পতনের পর সেখানে সাত দশক আগে বন্ধ হওয়া মসজিদে যখন পুনরায় আজান ধ্বনিত হলো, সত্তর বসর কম্যুনিষ্ট যাতাকলে নিষ্পেষিত মুসলমানদের আনন্দে সেদিন কাঁদতে দেখেছি! সুদীর্ঘ পাঁচশ বৎসরের ব্যবধানে অনেক আঈনি লড়াই শেষে স্পেনের মাটিতে সেদিন মুসলমানরা যখন নতুন মসজিদ উদ্বোধন ও তাতে নামাজ পড়লেন, সেদিনও তাঁদের অনেককেই কাঁদতে দেখেছি আবেগে, আনন্দে। অতএব আমাদেরকে কাঁদতেই হয়। আনন্দ-উল্লাসে বা দুঃখে-কষ্টে আমরা কাঁদি!

মুরুব্বীরা অনেক সময় দোয়া করেন, আমাদের জীবনটা যেন সুখের হয়, সারাটা জীবন যেন হেঁসে খেলে কাটাই। কেঁদে কেঁদে জীবন কাটাতে কেউই চানও না। কিন্তু না চাইলেই কি হয়? চাই বা না চাই, আমাদের কাঁদতে হয়ই। চারপাশের জানা-শোনা লোকজনের দিকে একবার চেয়ে দেখ, ভালো করে খেয়াল করে দেখলে দেখবে, তাদের সবার চেহারাতেই কান্না কান্না ভাব! দুর্দিনের বাজারে জীবনের ঘানী টানতে আর যেন পেরে উঠছেন না! 'ছেড়ে দে মা, কেঁদে বাঁচি' অবস্থা!

যাদের অঢেল আছে বলে জানি, সেই তাদের জীবনেও সুখ নেই। তাদেরও বুক ভরা কান্না! আরও হলো না, আরও পেলাম না, সে হাহাকারে বুক ভরা! কারো বা ছেলে-মেয়ে উচ্ছন্নে গেছে প্রাচুর্যে ভেসে, পসরা সাজিয়েছে হেরোইন আর মারিজুয়ানা সহ আরও নানা আসরে! মরফিন আর পেথেডিনের নীল ছোঁয়ায় আদরের সন্তানেরা মরীয়া হয়ে চেষ্টা করে যাচ্ছে 'হেসে খেলে জীবনটা যদি চলে যায়' গেয়ে গেয়ে।

না, হেসে খেলে জীবন যাচ্ছে না! তছনছ হচ্ছে সংসার, ব্যবসা-বাণিজ্য, প্রভাব-প্রতিপত্তি সব। সুখের কপাল এখন গড়ের মাঠ! সন্তানদের তো বটেই, বাবা-মা'সহ সকলের বুকেই জমাট বাধা চাপাকান্না! টোকা দিলেই প্রলয়ংকারি ঢেউ হয়ে বেরিয়ে আসবে কান্না আর কান্না! সে কান্না'ই চাপা আছে কড়া মেকআপ আর মেকি হাসির আড়ালে। চেয়ে দেখ তোমার চেনাজানা স্বজন, কিংবা সমাজে ভি আই পি'দের দিকে, সবারই ঐ একই অবস্থা। হাসি হাসি

আমরা বোধ হয় ভুলেই গেছি যে, আমাদের সেই অনাহুত অতিথি যেকোন মুহূর্তে এসে দাঁড়াবে সামনে। আমরা মুসলমান, আলহামদুলিল্লাহ! সে কারণেই জানি, এ অতিথি এসে দাঁড়ালে আর এক মুহূর্ত সময় দেবে না। একমুহূর্ত সময় হবে না কাজ গুছিয়ে নেবার!

www.pathagar.com

কুরআনের ভাষায়ঃ 'লাওলা আক্ষারত্বানী ঈলা আজালীন ক্বারীব? ফা আস্‌সাদ্দাকা ওয়াকুনা মিনাস্‌ছলিহিন' ' আয় আল্লাহ্‌ আর একটু সময় দিলে না কেন, তোমার উপরে ঈমানও আনতাম আর নেক আমলকারীদের মধ্যে শামীলও হতাম! বলে যতই নিবেদনই করি না কেন সেদিন, লাভ হবে না। মুহূর্ত সময়ও পাওয়া যাবে না। তখনও বাকি পেনশনের পাওনা, বাকি ব্যাংকের সর্বশেষ স্টেটমেন্ট! তখনও হয়ত সাজানো হয়নি বাড়ীর আঙ্গিনা! স্ত্রীকে দেয়া হয়নি লেটেস্ট মডেলের গহনা, মেয়ে জামাইকে দেয়া হয়নি প্রতিশ্রুতিমত বাড়ী, ছেলের বিয়ে দেয়া হলো না! সবই অপূর্ণ রইল! এত অপূর্ণতা নিয়েই যেতে হবে? এই অসময়েই?

হ্যাঁ, এরকম অসময়েই আসে অনাহুত অতিথি! নিয়ে যায়, জীবন ব্যাপি লেন-দেন, দেনা-পাওনার ফাইনাল অডিটে! এত অপূর্ণতা নিয়ে কি ফাইনাল অডিটে হাসিমুখে যাওয়া যায়? অতএব, ওপারে ফাইনাল হিসাবে নিশ্চিত ফেলের সুনিশ্চিত আশংকায় শেষ মুহূর্তেও কাঁদতে কাঁদতেই রওয়ানা দিতে হয়! এ জীবনতো মুসলমানের নয়। একজন মুসলমান আর সকল মানুষের মতই কাঁদতে কাঁদতে বিশ্বে আসলেও যাবার সময় যায় হাসতে হাসতে, কাঁদিয়ে যায় বিশ্বকে। তার বিয়োগব্যথ্যায় মানুষ কাঁদে। কবিতার সেই দ্বিতীয় চরণের মত।

আমরা যাঁর অনুসারী, যাঁর নিখাঁদ অনুসরণের মাঝেই মুক্তি, সেই প্রিয় হাবীব, মুহাম্মদ(সঃ) পরম নিশ্চিন্তে যাবার সময়ে বলে উঠেছিলেন 'আমি আমার পরম বন্ধুর সাথে মিলিত হতে চাই'। আহা কি ব্যগ্রতা! কি ব্যকুলতা! তার হাতে গড়া সম্মানিত সাহাবা (রাঃ) গণও সেই একইভাবে গেছেন। জীবনে তাঁরাও কেঁদেছেন, এতিম বালক মুহাম্মদ(সঃ) তাঁর বাবা, মা'র স্মরণে কেঁদেছেন, প্রৌঢ় বয়সেও আমাদের মা খাদিজা (রাঃ) এঁর কথা মনে হলে তাঁর চোখ ভিজেছে! প্রিয় পুত্রের মৃত্যুতেও কেঁদেছেন। তাঁর সাহাবীরাও জীবনের বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতে, সুখে-উল্লাসে কেঁদেছেন।

আমাদের মত হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ, আবেগে-উল্লাসে তাঁরাও কেঁদেছেন। কিন্তু অনাহুত অতিথির ডাকে সাড়া দিয়ে যাবার সময় তাঁরা প্রশান্তির সাথে হাঁসতে হাঁসতে গেছেন। এভাবে যেতে পারাটাই সফল জীবনের প্রতীক, সফল জীবনের মডেল। জীবনের এরকম পরিসমাপ্তিই একজন মুসলমানের চাওয়া, তাঁর লক্ষ্যও হওয়া উচিৎ এটিকে পাওয়া, ইসলাম এটিকেই বলে 'খাতেমা বিল খাইর'। এই পাওয়াটা তাঁকে অফুরন্ত পাবার পথ করে দেবে।

অফুরন্ত পাবার পথটি তাঁরা পেয়েছেন কেঁদে কেঁদে। তাঁদের কান্নাটা ছিল ব্যতিক্রমধর্মী। তাঁরা আল্লাহর ভয়ে একা একা কাঁদতেন! ভুল ভ্রান্তির কথা, পাপের

www.pathagar.com

কথা ভেবে জায়নামাজে কেঁদে কেঁদে বিনিদ্র রাত কাটাতেন! এই কান্নাই তাঁদেরকে শেষ মহূর্তে হাসিমুখে যাবার পথ করে দিয়েছে।

আজ আমরাও যদি ওরকম সফল জীবন চাই, তাহলে আমাদেরকেও রাতের আঁধারে জায়নামাজে দাঁড়িয়ে রবের দরবারে কাঁদতে হবে, যিনি তাঁর অনুতপ্ত বান্দার রাতজাগা চোখ হতে একফোটা অশ্রু গড়িয়ে মাটিতে পড়ার আগেই তার সকল গুনাহ মাফ করে দেন!

আমরা মুসলমানরা, মুসলিম বাবা মা'র ঘরে জন্ম নিয়ে, মুসলিম পরিবার ও সমাজে বেড়ে উঠেও ইসলামের মুলোৎপাটনে নিয়োজিত! জেনে বা না জেনে, বুঝে বা না বুঝে! অথচ আমাদেরকে পেছনে ফেলে ইসলামকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন সেইসব নও মুসলিমরা। বিশ্বের কোণায় কোণায় তা দেখছি আমরা। এদেরই একজন Omer Dexter তিনি কেবল মুসলমানই হননি, বরং Texas এ প্রতিষ্ঠা করেছেন ইসলামিক সেন্টার যেটি আজ টেক্সাসের সকলের কাছেই এক প্রিয় প্রতিষ্ঠান।

আর Yousef Estes এর কথা তো সারা বিশ্বই জানে, এক নামে চেনে। এই বুড়ো ঘর থেকে বের হন, সভা সমিতিতে ভাষণ দিতে, হামলে পড়ে সেখানে আমেরিকানরা তা শুনতে। দিন শেষে ঘরে ফেরার আগে শত শত আমেরিকান অমুসলিম তার হাতে শাহাদা পড়ে মুসলমান হন। সেদিন দেখলাম এরকমই একটা ভাষণের পরে ঐ বৈঠকেই একত্রে একশত পঁয়ত্রিশ'জন আমেরিকান মুসলমান হল। মাত্র একটা লেকচার শুনেই!

পরিবর্তনের এধারাকে কিভাবে ব্যাখা করবে? এগুলো তো ঘটছে তোমাদের চোখের সামনে। কোন তরবারী এইসব পরিবর্তন করছে বলে মনে করো? এত কুৎসা, অপপ্রচারের পরেও কিসের ভয়ে, কার ভয়ে দলে দলে এসব মানুষ ইসলাম গ্রহণ করছে?

কেবল কি আটলান্টিকের ওপারেই নয় বরং বিশ্বের প্রতিটি দেশেই এ অবস্থা। এমন কোন দেশ, এমন কোন অঞ্চল নেই যেখানে এমনটা ঘটছে না। এমনকি ব্রিটেনেও গেল ২০০৯ সালে চল্লিশ হাজার ইংরেজ মুসলমান হল। বলতে পার কারা এসব মানুষদের ভয় ভীতি দেখিয়ে ইসলামে ধর্মান্তরিত করছে? বলতো, কারা ক্যাট ষ্টিভেন্সকে ভয় দেখিয়েছিল? কারা ভয় দেখিয়েছিল তোমাদেরই Marrylin Moryngton'কে? ক'মাস আগে মুসলমান হলেন তিনি। একজন জেলা জজ, নারী

www.pathagar.com

ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ সংক্রান্ত ব্রিটিশ পরামর্শক কমিটি এবং আইন প্রণয়ন ও রিভিও কমিটির সদস্যা।

তিনি মুসলমান হলেন এমন সময়ে, যখন কেবল ব্রিটেনেই নয় বরং পুরো বিশ্বেই নিরন্তর প্রচারণা চালানো হচ্ছে, ইসলাম নারীকে পরাধীন রাখে, তাকে প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখে, ইত্যাদি ইত্যাদি। অবাক কান্ডই বটে। তুমি কি Marrylin এর সাক্ষাৎকারটা দেখেছ? জেমা কোন উত্তর দিল না। ধরেই নিয়েছি, সে তা দেখেনি। নিরর্থক তর্ক ছাড়া এসবে তার আগ্রহ নেই। খেয়াল করলাম, এক কোণায় বসা মেলেনি জনসন চট করে হাতের তালুর উল্টো পিঠে লিখে নিলেন একটা কিছু। সম্ভবত সেই মহিলা জজের নামটা। জেমার কাছ থেকে উত্তর না পেয়ে বললাম;

'তুমি ইচ্ছা করলেই ইউ টিউব'এ Judge Marrylin Moryngton লিখে সার্চ দিয়ে স্বাক্ষাৎকারটি পারলে দেখে নিও। তোমার অনেক প্রশ্নের উত্তর পাবে। তিনি সেখানে স্পষ্ট বলেছেন, কুরআন পড়েই ইসলাম চিনেছেন। আরও বলেছেন; 'ইসলামে নারীর অবস্থান ও মর্যাদা নিয়ে যে রটনা শুনি, তা যে নিছকই অপপ্রচার, সেটা কুরআন পড়েই বুঝেছি। পুরো কুরআনকেই মন দিয়ে বার বার পড়েছি। একজন মানুষ হিসেবে, একজন নারী হিসেবে, একজন বিচারক হিসেবে, বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে পড়েছি, এখনও পড়ি। এর পরে নিজ গরজে মুসলমান হয়েছি। আলহামদুলিল্লাহ।'

পনেরো

এভাবেই কুরআন ব্যক্তির মনোজগতে পরিবর্তন ঘটায়। একজন বিচারক হিসেবে তিনি ভালো করেই জানেন, কেবলমাত্র আইন বা জেল-জরিমানার ভয় দেখিয়ে মানুষকে অপরাধ থেকে নিবৃত রাখা সম্ভব না। তা যদি হতো, তা হলে ব্রিটেন, আমেরিকা তথা পুরো পশ্চিমাবিশ্বে অপরাধ সংঘটনের মাত্রা এতটা বেশী হতো না। মানুষকে কেবলমাত্র পরকালের জবাবদিহিতার ভয়ই পারে অপরাধ করা থেকে নিবৃত রাখতে। সে উপলব্ধি তাঁর হয়েছে কুরআন পড়ে।

জেমা, মেলানি, সুজি, তোমরা সকলেই শিক্ষিত, সচেতন এবং উন্নতসমাজের বাসিন্দা, স্বভাবতই আশা করা যায়, তোমরা যুক্তি আর বাস্তবতাকে স্বীকার করবে। অন্তত তা নিয়ে লুকোচুরি করবে না। ভালো করে তোমাদের চারপাশ দেখ, জ্ঞান-বিজ্ঞান-শিক্ষা

www.pathagar.com

এসব কি মানুষের মন থেকে অপরাধপ্রবণতা দূর করে তাকে মানবিক, সৎ, নিরপেক্ষ আর উদার করতে পেরেছে? পেরেছে কি তার ভেতরে ন্যায়, ইনসাফ, প্রতিষ্ঠা করতে? তোমরা বাস্তবতাকে অস্বীকার না করলে মানতে বাধ্য যে, দু'একটা ব্যাতিক্রম ছাড়া এসব প্রশ্নের উত্তর নেতিবাচক।

জ্ঞান বিজ্ঞানের এত উন্নতির পরেও মানুষের জীবনমানের উন্নয়ন হলো না কেন? কেন এখনও বিশ্বের অর্ধেক মানুষই অভূক্ত থাকে? সম্পদ-প্রাচুর্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান, প্রযুক্তি-দক্ষতা এসব কেনই বা মানুষের জীবনে প্রতাশিত প্রভাব রাখতে ব্যর্থ হলো? কেন মানুষের মন থেকে সহমর্মীতা, মানবপ্রেম, দয়া, মায়া, ত্যাগ, এইসব মৌলিক গুণাবলী দূরীভূত হয়ে গেল? কেনইবা মানুষ আজ এতটা আত্মকেন্দ্রিক?

কেন এমনটা হলো? তাহলে কি জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্নয়ন অপ্রয়োজনীয় ছিল? জানি, প্রশ্নটা বোকার মত শোনাবে, কিন্তু অবস্থার নিরিখে এটাই সবচেয়ে বড় প্রশ্ন এখন সমগ্র বিশ্বের সচেতন মানুষের মনে। বিশ্বের সংখ্যাগরিষ্ঠ সচেতন মানুষই আজ এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজে ফিরছেন। যাঁরা খুজছেন, তারা অনেকেই উত্তরটা খুজতে খুজতে এক সময় আসছেন কুরআনের কাছে, পেয়েও যাচ্ছেন তাদের প্রশ্নের উত্তর, যা নিত্যই তাদের মন, মগজকে ছেয়ে আছে।

কুরআন যে তাদের কাঙ্ক্ষিত উত্তরই বলে দিচ্ছে, তাই নয়, বরং একইসাথে এক্ষেত্রে তাদের নিজ নিজ ভূমিকা কি হওয়া দরকার, সে বিষয়েও সুস্পষ্ট নির্দেশনা দিচ্ছে। আর দিকনির্দেশনাই তাদের জীবনে স্থায়ী পরিবর্তন আনছে। কুরআনই তাঁদেরকে জানিয়ে দিচ্ছে, মানুষ মূলত ভালো ও মন্দের এক বিস্ময়কর সমাহার। তার ভেতরে ভালো ও মন্দ চেতনা একইসাথে সন্নিবেশিত, এটা তার জন্মগত বৈশিষ্ঠ। সে ভালোকে যেমন জানে তেমনি মন্দকেও চেনে।

কুরআনে এই কথাটাকেই এভাবে বলা হয়েছে 'ফা আল হামাহা ফুজুরাহা ওয়া ত্বাক্বওয়াহা'। অর্থাৎ তাকে (মানুষকে) পাপ ও পুণ্যের জ্ঞান দেয়া হয়েছে। মানুষের চেতনায় উভয় প্রকার বিষয়ে জ্ঞান দেয়া হয়েছে। তার অন্তর্জগতে সব সময় এ'দুয়ের সংঘাত চলতে থাকে। তার চেতনায় পাপ আর পূণ্যের এই যে দ্বন্দ, এই যে সংঘাত, এটা মনুষ্য জীবনের চলমান প্রক্রিয়া।

কখনও কখনও তার মনে অপরাধ প্রবণতা চাঁড়া দিয়ে ওঠে, আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে শয়তান মানুষকে প্ররোচিত করে পাপের পথে টানতে। মানুষও সেই ডাকে সাড়া দেয়, যদিও জানে কাজটা পাপ। এই জানাটা তার স্বভাবজাত, তার জন্ম লগ্ন থেকেই প্রাপ্ত

www.pathagar.com

জ্ঞান ভিত্তিক। এর পরেও সে সাড়া দেয়। আর অপরদিকে তার চেতনার যে অংশটি কাজটিকে খারাপ বলে জানে ও মানে, চেতনার সেই অংশটি তাকে বারণ করতে থাকে, কাজটি না করতে।

কিন্তু তার পরেও কাম, ক্রোধ, লোভ, লালসা, হিংসা, বিদ্বেষ এসব প্রবৃত্তির তাড়নায় মানুষ অপরাধগুলো করে বসে। তারা কারো ধন সম্পদ হরণ করে, কারো অধিকার হরণ করে, অন্যায় করে, পাপ করে।

মানুষের এরকম পরাজয় যখন ঘটে, তখন ভেতরের ভালো চেতনাটুকু জানান দেয়, সে পরাজিত হয়েছে। এই কারণেই পাপ সংঘটনের পর তার মনে স্বাভাবিকভাবেই অনুতাপ জাগে, মনে মনে দংশিত হয়। পরাজয়ের ঘটনাকে সে আড়াল করতে চায় সমাজ ও লোকজন থেকে, সেটাও এই কারণেই। নিজের দুর্বলতা, নিজের পরাজয়কে কে প্রকাশ করতে চায়?

জীবন হলো ভালো-মন্দ, পাপ-পূণ্যের মধ্যে সর্বদা চলমান সংঘাতময় একটি নির্দিষ্ট 'সময়' এর সমষ্টি। ভালো ও মন্দের নিরন্তর সংঘাতও এ সময়ব্যাপি চলমান প্রক্রিয়া, তাতে আমরা নিরন্তর নিয়োজত। মানুষ যতক্ষণ তার বিবেক দ্বারা অন্যায়কে দমিয়ে ন্যায়বোধকে জাগ্রত রাখে, ততক্ষণ সে অন্যায়, পাপ থেকে বেঁচে থাকে। সে এটা করে সযত্ন প্রয়াসের মাধ্যমে। এভাবে মূলত সে নিজেই কল্যাণ প্রাপ্ত হয়। এর ব্যাতয় হলেই তার অক্যলাণ,তার পরাজয়!

কুরআনে বিষয়টিকে অতি সংক্ষেপে সুন্দর করে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এইভাবে, 'ক্বাদ আফলাহা মান জাক্কাহা, ওয়া ক্বাদ খাবা মান দাস্‌সাহা' অর্থাৎ 'যে ব্যক্তি তার চেতনার জগতকে পরিশুদ্ধ করেছে সেই সফলকাম হয়েছে, আর যে ব্যক্তি তার চেতনার জগতকে পরাজিত হতে দিয়েছে সে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে'

কুরআন বার বার মানুষকে জান্নাত এবং তার অকল্পনীয় প্রতিদানের আশ্বাস দিয়েছে এ কারণে যে, এইসব প্রতিদানের আশায় মানুষ অন্যায়, অবৈধভাবে অর্জিত আপত স্বল্পস্থায়ী সূখ ছেড়ে, বৃহত্তর লাভ লোকসানের কথা, নিজের ও অপরের ভালো-মন্দ ও অধিকারের কথা বিবেচনা করবে যে কোন কাজ করার আগে।

সে ভাববে, তার কথা বা কাজের জন্য তাকেই জবাবদিহি করতে হবে, কোন মতেই তা এড়ানো যাবে না, এবং এর মধ্যে কোন গোঁজামিলও চলবে না। এই শিক্ষাটাই তাকে অপরাধ সংঘটন থেকে স্থায়ী ও কার্যকরভাবে বিরত রাখতে পারে। এর জন্য ব্যক্তির সযত্ন প্রয়াস ও সদিচ্ছা দরকার। কুরআন বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছে;

www.pathagar.com

'ওয়াআ'ম্মা মান খাফা মাক্বামা রাব্বিহি ওয়া নাহান্নাফসা আনিল হাওয়া ফাইন্নাল জান্নাতা হিয়াল মাও'য়া' অর্থাৎ: তার রবের সামনে একদিন দাঁড়াতে হবে (জবাদিহিতার জন্য) এই ভয়ে যে নিজের মনের (অবৈধ) খায়েশ পূরণে বিরত থেকেছে তার ঠিকানা হলো জান্নাত'

অতি সহজে এবং এক কথায় জান্নাত প্রাপ্তির পথ বলা হয়েছে। প্রশ্ন হলো, এত কিছুর পরেও মানুষ অন্যায় করে কেন? এর একমাত্র উত্তর: প্রধানত দু'টো কারণে, এক- মানুষের কাছে এই জ্ঞানটুকু না থাকার কারণে সে যথেচ্ছ নিজের খায়েশ মিটিয়ে চলেছে। দুই- যার কাছে এই জ্ঞান আছে, কিন্তু দৃঢ় বিশ্বাস নেই এর যথার্থতায় (ইসলামের ভাষায় 'ঈমান')। তাই জ্ঞান থাকা সত্তেও সে অপরাধ করছে, নিজের উপরে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হচ্ছে।

আজ যারা বিশ্ব পরিচালনায় নিয়োজিত, পার্থিব জ্ঞান-বিজ্ঞানে তারা প্রকৃত অর্থেই উন্নত। কিন্তু দেখ তার পরেও বিশ্ব জুলুম, শোষণ, অবিচার, অনাচারে ভরা। অপরদিকে যাদের এ বিশ্বাসটুকু আছে যে, একদিন প্রত্যেকেকেই আল্লাহর কাছে দাঁড়াতে হবে জবাবদিহিতার জন্য, তাদের কাছে বিজ্ঞানের জ্ঞান ও দক্ষতা নেই যার দ্বারা তারা মানুষের জ্বরা, খরা, রোগ, শোককে জয় করে মানবতার কোন কল্যাণ করবে।

এই গোষ্ঠির মধ্যে এমনও কেউ আছে যে, তাঁরা জবাবদিহিতায় বিশ্বাসের কথা বলেন বটে কিন্তু তাদের সেই জ্ঞানের মধ্যে রয়েছে এক্ব বিরাট খাদ, ফলে এই অপূর্ণ জ্ঞান নিয়ে তারা নিত্যই সংশয়, সন্দেহে নিপতিত। এর কারণে তারা নিজেরা যেমন নিজেদের মনের অবৈধ খায়েশ মেটানো থেকে বিরত থাকছে না, তেমনি অপর কাউকেও বিরত রাখতে পারছে না।

ফলে বিশ্ব এমন ভয়ংকর পরিস্থিতিতে উপনীত হয়েছে, যেখানে আপাতদৃষ্টে জ্ঞানীরাই সবচেয়ে বেশী অন্যায়, জুলুম করছে। আর এরা জ্ঞান বিজ্ঞানে অতি দক্ষ বলে তাদের প্রতিহত করাটাও অত্যন্ত কঠিন। আর যাদের কাছে পরকালে জবাবদিহিতার জ্ঞান ও তাতে বিশ্বাস আছে, তাদের পার্থীব প্রয়োজন পূরণের মত পর্যাপ্ত জ্ঞান ও দক্ষতা নেই বলে এরা অন্যায়, জুলুমের প্রতিবাদে মাঠে নয় বরং মসজিদের কোণায় আবদ্ধ হয়েছে জিকির চিল্লাহর নামে, বাস্তবতা থেকে পলায়নে এক অপকৌশল মাত্র!

এই হলো বর্তমান বিশ্বে মুসলমানদের অবস্থা। ফলাফল কি হয়েছে? আল কুরআনে বর্ণিত দু'টি উদ্দেশ্য;

www.pathagar.com

(এক) 'ওয়ালতুাকুম মিনকুম উম্মাতিইয়াদউনা ইলাল খাইর, ইয়ামুরুনা বিল মারুফ ওয়া ইয়ানহাউনা আনিল মুনকার' অর্থাৎ-তোমাদের মধ্যে একটা গোষ্ঠি এমন থাকতে হবে, যারা মানুষকে কল্যাণের পথে আহ্বান করবে, সৎ কাজের আদেশ করবে ও অন্যায় থেকে বিরত রাখবে। এবং

(দুই) 'কুনতুম খাইরা উম্মাতিন উখরিজাত লিন্নাস, তু'মুরুনা বিল মারুফ ওয়া তানহাওনা আনিল মুনকার, ওয়া তু'মিনুনা বিল্লাহ' অর্থাৎ-তোমরাই সর্বোত্তম জাতি, তোমাদের উদ্ভব হয়েছে এই কারণে যে, তোমরা সৎ কাজের আদেশ করবে ও (মানুষকে) অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখবে, এর পাশাপাশি তোমরা নিজেরা আল্লাহর উপরে বিশ্বাসের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করবে। এ দু'টির কোনটিই তাদের দ্বারা পূরণ হচ্ছে না।

যাদের দায়িত্ব ছিল বিশ্বকে অবিচার-জুলুম-শোষণমুক্ত করা ও রাখা, তারাই যখন মৌলিক উদ্দেশ্য দুটি পূরণে ব্যর্থ, তখন আর কি আশা করা যায়? বিশ্ব যে জুলুম-নির্যাতনে ভরে যাবে, মানবতা যে অবর্ণনীয়, অকল্পনীয় জিল্লতির মধ্যে ডুবে যাবে, তাতে সন্দেহ কেন? হয়েছেও তাই। প্রমাণ চাইলে বিশ্বের চারিদিক একবার চোখ বুলিয়ে নিলেই তা অনুধাবন করা যায়। আমরা মুসলমান, যারা কেয়ামতের মাঠে নিজেদের হিসাব নিকাশ নিয়ে ভাবি, তাদের অধিকাংশ জনই এই বৃহত্তর প্রশ্নের হিসেবের কথা একবারও ভাবি না!

একথা পরিষ্কার, আমরা মুসলমানরা নিজেদের ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক জীবন নিয়েই যে সেদিন কঠিন ব্যর্থতার সম্মুখীন হব, তাই নয়, বরং সেদিন আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক অঙ্গণে আমাদের দায়িত্ব পালনে এই সীমাহীন ব্যর্থতার জন্যও কঠিন ও ভয়ংকর পরিণতির মুখোমুখি হতে হবে। এক ভয়াবহ বিপর্যয়ের সম্মুখিন হতে যাচ্ছি কেয়ামতের মাঠে! এ মহা বিপর্যয়ের একমাত্র কারণ, জ্ঞানের অভাব। মৌলিক এই জিনিসটির অভাবেই আমাদের এই বিপর্যয়।

হায়, মুসলমানরা আজ একথাও বোঝে না যে, তাদের জ্ঞান'এর অভাব! আজ আমাদের এই জ্ঞানটুকুরই বড় দরকার যে 'আমরা মূর্খ, আমাদের জ্ঞানের দরকার'। আত্মোপলব্ধীটাই বিশ্বব্যাপি মুসলমানদের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন।

কিন্তু মুসলমান না হয়েও যারা আজ জ্ঞানী ও উন্মুক্ত মন নিয়ে ভাবছেন, সত্যানুষন্ধানী সেইসব সৌভাগ্যবানরা কিন্তু ঠিকই পথের দিশা পাচ্ছেন। সেরকম দু'চারজনেরই নাম ও তাদের কর্মকান্ডের সামান্য কিছু ফিরিস্তি দিলাম এতক্ষণ। তা ছাড়া এই যে ফারিহা,

www.pathagar.com

তিনিও সেরকমই একজন, যিনি উন্মুক্ত মনে সত্য খুঁজেছেন, বলেই তার দিকে তাকালাম, সবাই তাকাল কিন্তু তিনি নিশ্চুপ পূর্বাবৎ দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েই রইলেন। এবারে জেমা'র দিকে ফিরে বললাম;

'এখন তিনি আলাদা। আর দশ'জন ইংলিশ হতে একেবারে আলাদা। সম্প্রতি মুসলমান হয়েছেন। এক মুসলিম বান্ধবীর সাথে আলাপ ছিল। তাঁকে দেখে, তাঁর কাছ থেকেই সর্বপ্রথম 'ইসলাম' এবং একজন মুসলমানের জীবনাচার দেখেন। এভাবেই ইসলামের সাথে পরিচয়। একদিন ট্রেনে স্কটল্যান্ড যেতে যেতে বাইরের সৌন্দর্য দেখছিলেন, নানান গাছ পালা, সবুজ মাঠ, খোলা প্রান্তর! কী সুন্দর, কী মনোহর বিশ্বটা! এসব যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কী বিনা কারণেই তা করেছেন?

এখানে কথার মাঝখানে বাংলাদেশের একজন বিখ্যাত ব্যক্তি, যাঁর পুরো দেশ জুড়েই নাম ডাক আছে 'বুদ্ধিজীবি' বলে, তাঁকে কেন্দ্র করে একটা ঘটনা মনে পড়ে গেল। তিনি আগামি দিনের জন্য কিছু যুবক যুবতিকে নিজ উদ্যোগেই 'বুদ্ধিজীবি' বানান তাঁর কার্যালয়ে। তাদের জন্য নিখরচায় নিজ অফিসে ক্লাসের আয়োজন করেছেন এবং সেখানে বিভিন্ন বিষয়ে লেকচারও দেন তার গুণমুগ্ধ ছাত্র-ছাত্রীদের।

এরকম এক ক্লাস শেষে দোতলার অফিস হতে ছেলে মেয়েরা নেমে আসছিল, সিঁড়ির দু'ধারে সাজানো টবে সুন্দর ফুল ফুটে আছে। পরিপাটি সাজানো টবে, ফুলের গাছে যত্নের লক্ষণ সুস্পষ্ট। জনৈকা ছাত্রী তার প্রশংসা করলে পেছনে সিঁড়ির মাথায় দন্ডায়মান পৌঢ় বুদ্ধিজীবি সেই ছাত্রীকে লক্ষ্য করে বলে উঠলেন 'তা হলে সুবহানাল্লাহ বলো, সুবহানাল্লাহ বলো'

ছাত্রীটি স্যারের মানসিকতা বুঝতে না পেরে সত্যিই সত্যিই 'সুবহানাল্লাহ্' বলে উঠলে বুদ্ধিজীবি বিদ্রুপের সূরে বললেন 'শোন, এখানে তোমাদের ঐ আল্লাহ্ মিঞার কোন কেরামতি নেই! এই ফুল গাছ তোমাদের স্যার তার টাকায় কিনেছেন এবং মালী'সহ এই স্যারেরই যত্ন ও পরিচর্যাতেই অত সুন্দর ফুল দেখতে পাচ্ছ! বোঝ তা হলে মুসলিম নামধারী ঐ 'বুদ্ধিজীবি'র বুদ্ধির দৌড়!

যাহোক, রাস্তার দু'ধারে সবুজ গাছ-পালা-বাগান, মাঠের পর মাঠ, ঐ নীল আকাশে পাজা পাজা মেঘ! মাথার উপরে প্রজ্জলিত সূর্য! এসব দেখেন আর ফারিহা ভাবেন, আমাদের জন্য এসব সৃষ্টি ও সুন্দর পরিপাটি উপস্থাপন, আমাদের উপযোগী করে তৈরী ও উপভোগ করতে দেয়া, এত অনুগ্রহ! এসব কি একেবারে বিনা উদ্দেশ্যেই করা হয়েছে? কোন কার্যকারণ নেই? যুক্তি কি তা মেনে নিতে চায়?

www.pathagar.com

দারুণভাবে ভাবায় তাকে। তিনি তার মুসলিম বান্ধবীর কাছে জেনেছেন, বিশ্বের কোন কিছুই খেলাচ্ছলে সৃষ্টি হয়নি। এটাই ইসলামের কথা, কুরআনের কথা, অর্থাৎ আল্লাহ্‌র কথা। ইসলাম বা কুরআন বা আল্লাহ, যাই বলি না কেন, সবই তো একই সূত্রে গাঁথা। ইসলামের কথা আর মানবিক যুক্তির স্বতস্বিদ্ধ উপলব্ধি, কেমন যেন অস্বাভাবিকভাবে মিলে যায়! চলতি পথে এই উপলব্ধি তাঁকে খুব ভাবায়। এক অলস মহূর্তে মনের কোণে উদিত ভাবনা সারাক্ষণ তার চিন্তা-চেতনাকে ছেয়ে রাখে, ভাবাতেই থাকে! কিছুতেই স্বস্তি পান না।

এই প্রশ্নের উত্তর জানার আগ্রহ, ব্যগ্রতা তার প্রতিদিনের জীবন, কর্মকান্ডকেও প্রভাবিত করে যায়। ইসলামকে আরও বেশী জানতে মরীয়া হন। তার মুসলিম বান্ধবী, সহকর্মীদের আরও গভীর পর্যবেক্ষণের পাশাপাশি তাঁদের দৈনন্দিন প্রতিটি কাজ-কর্মকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে থাকেন, নিজের মনেই তার জবাব খুঁজতে এবং যুক্তি আর বিবেকের সাথে তার ব্যাখ্যা মেলানোর সাথে সাথে কুরআন বুঝে বুঝে পড়তে থাকেন। এক পর্যায়ে এসে স্বাক্ষ্য দেন, আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ (স:) তাঁর নবী ও রাসুল! আলহামদুলিল্লাহ এখন তিনি পুরোমাত্রায় মুসলমান! ফিওনা নন, ফারিহা থোমাস!

অথচ আমি মুসলমান। রুটি রুজীর তাগিদে বিশ্বের কত দেশে যাতায়াত করেছি। জীবনের দুই তৃতিয়াংশই কাটিয়েছি বিশ্বের নানা দেশে। ট্রেন, বাস, স্টীমার, নৌ-জাহাজ, প্লেন থেকে আকাশ, সমুদ্র, পাহাড় দেখেছি, দেখেছি ভূতল। কত দৃশ্য দেখে অবাক হয়েছি! কিন্তু কোনদিনই কুরআনের কথা ঐ ভাবে জাগেনি মনে, যে ভাবে ফারিহার মনে উদীত হয়েছিল।

আমরা অনেকেই ঘটাকরে স্বামী-সন্তান, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নিয়ে দেশে-বিদেশে দর্শনীয় স্থান, প্রকৃতির মনোহরী রুপ দেখতে যাই, কিন্তু ক'জনের মনে হয়েছে? আল্লাহ পাক এসব খেলাচ্ছলে সৃষ্টি করেন নি! ক'জনের মনে সে চিন্তা'র উদ্রেক হয়েছে, যে চিন্তা ফারিহার মনে উদিত হয়েছিল? আমাদের চেতনায় কি সেই পরিবর্তনের সূচনা হয়েছে? যে পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল ফারিহার চেতনায়। নিত্য দেখা চারিপাশ আমাদের অন্ত র্চক্ষু উন্মোচিত করে তুলতে পেরেছে কি? যে ভাবে তা করেছে একজন ফারিহার ক্ষেত্রে!

ফারিহা জানতেন না, কিন্তু আমরা মুসলিম পরিবারে জন্মানো এবং বেড়ে ওঠার কারণে জানি, কুরআনে আল্লাহ পাক স্পষ্ট বলেছেন 'তিনি এই বিশ্বকে খেলাচ্ছলে সৃষ্টি করেন নি। ফারিহা যখন বিশ্বের আনাচে কানাচে চোখ দিয়ে, অনুসন্ধিৎষু মনের বিশ্লেষণেই

www.pathagar.com

তা বুঝে হয়ে যান 'ফিওনা' থেকে 'ফারিহা'! তখন আমরা মুসলমানরা লজ্জা পাই আমাদের অন্তরের বন্ধাত্ব দেখে! কুরআনের ছয় হাজার আয়াতের মাত্র একটি আয়াত ফারিহার জীবন বদলে দিয়েছে চিরদিনের মত! তাঁকে দেখিয়েছে পথ, দিয়েছে আত্মপরিচয়!

হায়, আমাদের অন্তর্চক্ষু কি এখনও খুলবে না? আমরা কি এখনও নিষ্ঠা আর পূর্ণ উপলব্ধিতে বলে উঠতে পারব না ' রাব্বানা মা খালাকতা হাজা বাতিলাঁও'

ষোল

বিস্ময়করই বটে। কুরআন এরকম লক্ষ বিস্ময়ের জন্ম দিয়েছে কারণ সে নিজেই একটা বিস্ময়। বিশ্বের সবচেয়ে বড় বিস্ময়। এভাবেই কুরআন একটা স্থায়ী পরিবর্তনের সূচনা করে এর পাঠকের মনোজগতে। আরও একটা উদাহারণ দেই, শোন। গল্প নয়, ঘটনার নায়কের কাছে নিজ কানে শোনা। সেটা এক আমেরিকান যুবকের কাহিনী।

পিটার বেল, ২৩ বসরের মার্কিন যুবক, পদাতিক বাহিনীর সৈনিক। আমেরিকার টেক্সাস থেকে ১৯৯০ এর উপসাগরীয় যুদ্ধে কুয়েত ইরাক সীমান্তে এল। যুদ্ধের প্রস্তুতি পুরোদমে চলছে। প্রাণচঞ্চলতায় উদ্যাম পিটার এই প্রথম কোন আরব দেশে এসেছে। আরব জীবনাচার ও সংস্কৃতির ব্যাপারে কোন অভিজ্ঞতাই নেই।

মরুভূমির মধ্যে সামরিক তাঁবুতেই কাটে সারাদিন। সকালে বিকেলে একবার করে কুচকাওয়াজ ফিটনেস ঠিক রাখতে, তাও সেই জিমনেশিয়াম রুপি তাঁবুর মধ্যেই! এখানে না আছে নাইট ক্লাব, না আছে থিয়েটার, আর না স্কি খেলার সুযোগ!

সময় কাটে না! হাতের কাছে যে দু'চারটি বই ছিল তাও শেষ। মা ভাইবোন, গার্লফ্রেন্ড, বন্ধুদের চিঠি লিখে বা লং ডিসটেন্স কল করে কিছুটা সময় কাটে। সন্ধায় জড়ো হয় টিভি'র সামনে। রাজনীতির নামে এসব বাগাড়াম্বর কোনদিনই ভালো লাগে না। সে চায় ধুম ধাড়াক্কা জীবন। মাঝে মাঝে টেক্সাসের পাহাড়ঘেরা জনপদ, বার, নাইট ক্লাব ও ডিসকোর স্মৃতী উন্মন করে দেয়!কয়েকদিনের মধ্যেই জীবন বিষিয়ে উঠে। সৈনিক জীবন রোমাঞ্চে ভরা শুনেছিল, কিন্তু এ যে পুরো উল্টো!

www.pathagar.com

একদিন হঠাৎ তিন চার জন আরব এলেন তাদের তাবুতে। পা পর্যন্ত ধবধবে সাদা পোষাক, মাথার বিশেষ রুমালটি কাধ পর্যন্ত ঝোলানো, তার উপরে কালো বৃত্তাকারের দুটো রিং। দুর থেকে চমৎকার লাগে! এরা কুয়েতি-সউদি নাগরিক। এদের দলনেতা চোস্ত ইংরেজিতে কুশল বিনিময় করলেন, খোজ খবর নেবার এক পর্যায়েই সৈন্যরা জানালো, সারাদিন অলস বসে বসে তারা বিরক্ত হয়ে উঠেছে! শুনে দলটির নেতা গোছের একজন বললেন; 'আমরা যদি বই পুস্তক, পত্রিকা সরবরাহ করি, এবং বলে রাখি, এগুলো আমাদের ধর্ম, শিক্ষা সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য এসব বিষয়ে, তোমরা পড়বে? যদি পড় তবে সেসব বই পুস্তক দিতে পারি। হতে পারে, তোমাদের অলস সময় কিছুটা কাটবে এসব পড়ে। নেবে ?'

কথায় যুক্তি আছে। বাস্তবিকই সময় কাটানোটা একটা বিরাট সমস্যা হয়ে দাড়িয়েছে। নতুন কিছু জানতে দোষ কি? অভিজ্ঞতার ঝুলিতো সমৃদ্ধ হবে! অতএব একদল মার্কিন সৈন্য সানন্দে রাজী হল। আগন্তুকরা তখনই কিছু বই পুস্তক দিলেন এবং নিয়মিত সরবরাহের আশ্বাসও দিলেন। দলটি ছিল কুয়েতের বিখ্যাত ইসলাম প্রচার সংস্থা, আই পি সি'র, এরা ইরাক কর্তৃক কুয়েত দখল হবার পরে সউদি আরবে আমেরিকান সৈন্যদের মধ্যে প্রচারকাজ চালাচ্ছিল।

তারা মার্কিন সৈন্যদের তাঁবুতে এ জাতীয় পুস্তিকা, লিটারেচার সরবরাহ চালু রাখলেন। প্রথমদিকে খুব বেশী পাঠক পাওয়া না গেলেও অচিরেই এসব বই পত্রের চাহিদা দ্রুত বেড়ে গেল। এবং উল্লেখযোগ্য সংখক মার্কিন-ফরাসী সৈনিকরা যে এগুলো যথেষ্ট মনযোগের সাথেই পড়ছে, তা বোঝা যায় যখন পরবর্তি স্বাক্ষাতে প্রতিনিধি দলটিকে তাদের মনে জমে থাকা প্রশ্নগুলো করে, আরও জানতে চায়, তখন।

তাদের আগ্রহ দেখে প্রচারকরা বললেন, তোমরা কোন এক্সপার্টের মুখে তোমাদের প্রশ্নের উত্তর জানতে চাইলে সে ব্যবস্থাও করতে পারি! সৈনিকরা সমস্বরে আওয়াজ তুলে বলল, যদি পারো তবে তাই করো। ঠিক হলো, মাসে একদিন কোন প্রথিতযশা এক্সপার্ট এসে তাদের প্রশ্নের জবাব দেবেন, ব্যবস্থা করবে আই পি সি কর্তৃপক্ষ। সেই থেকে মাসের একটি দিন আধা ঘন্টা বিরতিসহ মোট তিন ঘন্টার অনুষ্ঠান। বক্তারা ইসলামের উপরে বক্তৃতা দেন, মাঝে আধাঘন্টার বিরতির পরে ঘন্টাব্যাপি প্রশ্নোত্তর।

দু'মাস না যেতেই সমস্যা দেখা দিল। পিটার'সহ সমবয়স্ক ক'জনের দাবী মাসে একদিন পর্যাপ্ত নয়। অনুষ্ঠানের সংখ্যা বাড়াও। অবশেষে স্থানীয় সামরিক কর্তৃপক্ষের সম্মতিতে ঠিকই বাড়ানো হল, সপ্তাহে একদিন, তবে দেড়ঘন্টা। দেখতে দেখতে

www.pathagar.com

অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা বাড়ল অস্বাভাবিকভাবে! ধু-ধু মরুভূমির মধ্যে সামরিক তাবুতে প্রতিষ্ঠিত হল মাদ্রাসা, শেখায় ইসলাম কিন্তু ছাত্র সকলেই অমুসলিম!

মিশরের আল আজহার থেকে প্রফেসর ড. জগলুল নাজ্জার এলেন একবার আমন্ত্রিত অতিথি হয়ে। পর পর দু'সপ্তাহ আলোচনা উপস্থাপন করলেন সৈন্যদের উদ্দেশ্যে, বিষয় ছিল 'ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনের পারস্পরিক সম্পর্ক'। তথ্য ও যুক্তি নির্ভর আলোচনা শেষে ড. জগলুল জবাব দিলেন প্রতিটি প্রশ্নের। অনেকে প্রশ্ন করল। পিটার বেল এক কোণায় বসে মন দিয়ে শুনছিল। একটা কথাও বলেনি। এমনভাবে বসে আছে যেন কোনে দিকেই তার কোন খেয়াল নেই! শেষে শান্তভাবে দাঁড়িয়ে ড. জগলুলকে প্রশ্নটি করল ' জনাব, আপনি কি নিশ্চিত যে, কোন কিছুই মৃত্যুর পরে হিসাবের বাইরে রবে না'?

প্রফেসর জগলুল আলোচনায় যুক্তি ও কুরআন হতে দলিল দিয়ে বলেছিলেন, মুসলমান, খৃষ্টান, ইহুদী বা অন্য যে কোন ধর্মেরই হই না কেন, মৃত্যুর পরের জীবনে আমাদের সকলের এ জগতে করা সব কাজ ও কথার যুক্তিগ্রাহ্য জবাব দিতে হবে। তার হাতের শাহাদাত আঙ্গুলি উঁচিয়ে অত্যন্ত জোরের সাথেই বলেছিলেন; Nothing will go unaccounted for! হিসেবের বাইরে কিছুই রবে না!

কথাটি পিটারের মনে আলোড়ন তোলে। সেদিনই পিটার'সহ ষোলজন মার্কিন সৈন্য তাদের নাম তালিকাভুক্তি করে এক সপ্তাহের মধ্যেই আনুষ্ঠানিকভাবে মুসলমান হয়। প্রথম গালফ ওয়ারের এগারো মাসে কুড়ি হাজারেরও বেশী মার্কিন ও ফরাসী সৈন্য ইসলাম গ্রহণ করে! যুদ্ধশেষে পিটার আমেরিকায় ফিরে ব্যস্ত হয়ে পড়ে নতুন জীবন নিয়ে। ড. জগলুলও ব্যস্ত নিজের দাওয়াতি মিশনে। কোন যোগাযোগ নেই, কেউই কারো খবরও রাখেন না। এভাবেই কাটছিল।

১৯৯৮ সালে হঠাৎ ড. জগলুলের হাতে একটি চিঠি আসে। টেক্সাস হতে আঃ সালাম বেল লিখেছেন। ১৯৯০ এ ধর্মান্তরিত পিটার'ই আজকের আ: সালাম, টেক্সাসে ফিরে এখনও আল্লাহ্ রহমতে মুসলমানই আছেন অনাকাংক্ষিত সামাজিক ও পারিবারিক চাপ সত্ত্বেও! তার প্রচেষ্টায় মা, ভাই-ভাবীসহ কিছু পাড়া প্রতিবেশী ইসলাম সম্বন্ধে জানতে প্রস্তুত। ড. জগলুল দয়া করে তার অতিথি হয়ে আট বসর আগের বক্তব্যটাই যদি আবার তুলে ধরেন, হয়ত বিস্ময়কর কিছু ঘটতেও পারে! বেশ ক'টি ই-মেইলও এলো একই আহ্বান এবং যাবতীয় ব্যয়ভার বহনের প্রতিশ্রুতি'সহ।

www.pathagar.com

বারংবার অনুরোধের ফলে ড. জগলুল শত ব্যস্ততার মধ্যেও ১৯৯৮ সালের ৩রা নভেম্বর সেখানে গেলেন। চেহারাটাও মনে নেই আট বসর আগে দেখা যুবকের। তাই টেক্সাসে যখন আঃ সালামকে দেখলেন, তখন একটু অবাকই হলেন! লাল টুক টুকে চেহারা, থুতনীর নীচে কয়েকটা লালচে দাড়ি। ধীর স্থীর আঃ সালাম খুশীতে আটখানা হয়ে একে একে সবার সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন 'ইনি সেই প্রফেসর! যার কাছে আমি ইসলাম শিখেছি!'

তার মা, ড. জগলুলকে জানালেন 'আমার দুই ছেলের মধ্যে ও ছোট, কিন্তু খুব দুরন্ত ছিল! সেই বেয়াড়া, দুরন্ত পিটার কি ভাবে বদলে গেল! সবসময় যেন এক গভীর ভাবাবেগের মাঝে নিবিষ্ট থাকে। সবার মাঝেও সে যেন সবার থেকেই আলাদা! দেখলে মনে হবে, ওর মাথায় পাখী বসে আছে, নড়লেই যেন উড়ে যাবে!

ভাই বললেন 'কত করে বুঝালাম, কত ভয় দেখালাম, কত প্রলোভন! কিন্তু সে অনড়! জবাব দিল, তোমাদের অসুবিধা হলে বলো আমি অন্যত্র চলে যাই কিন্তু ইসলাম ছাড়তে বলো না! বাপ মরা আদরের ছোট ভাই, চোখের আড়াল যাক চাইনি, তাই ওকে ওর রাস্তায় ছেড়ে দিয়েছি! তবে প্রফেসর, স্বীকার করতেই হবে, সে চমৎকার একটা মানুষে রুপান্তরিত হয়েছে! তাকে দেখি, আর বিস্ময়ে 'থ হয়ে যাই!

তার প্রাক্তন বান্ধবীর সাথে পরিচিত হলে জানালো 'জানো প্রফেসর, যুদ্ধ হতে ফিরে আমার দিকে আজ পর্যন্ত চোখ তুলে তাকায়নি! অতিতের মত ডেটিং-এর ডাকলে এড়িয়ে বলেছে 'আমি সে পথের যাত্রী নই! ক্ষমা করো, কখনেই আমাকে ওপথে ডেকো না! ভুলে যাও সেসব কথা, যদি ভুলতে না পার, অন্তত আমাকে ভূলতে দাও! মনে রেখো এগুলো উশৃংখলতা, পাপ। এসবের কৈফিয়ত দিতে হবে। এ জীবনের প্রতিটি কাজ, প্রতিটি কথার কৈফিয়ত দিতেই হবে। জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত কি ভাবে, কোন কাজে ব্যয় করেছ, সে জবাবদিহি করতেই হবে! Nothing will go unaccounted for! কি অদ্ভুত!

প্রফেসর জগলুল মোট এগারো দিন থাকলেন। টুকি-টাকি আলোচনা ছাড়াও আনুষ্ঠানিকভাবে মোট তিন দিন ইসলামের উপরে লেকচার ও প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। বিভিন্ন মিডিয়ার বদৌলতে পশ্চিমা সমাজে ইসলাম নিয়ে যেসব বিভ্রান্তি ছড়িয়ে আছে, তার জবাবও দিতে হয়েছে। তার সমস্ত জ্ঞান আর দক্ষতায় এক এক করে সে সবের যুক্তিনির্ভর জবাব ও ব্যাখা বিশ্লেষণ তুলে ধরেছেন। অষ্টম দিনে আঃ সালামের মা, ভাই-ভাবী ও বন্ধুবান্ধবদের মধ্য থেকে চব্বিশ জন মার্কিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন। প্রফেসর জগলুলের মুখে এ কাহিনী শুনে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলাম।

www.pathagar.com

আমার বিস্ময়টাকে তিনি শংকায় পরিণত করলেন, যখন বললেন 'তেইশ বসরের যুবক, মৃত্যুর পরে প্রতিটি কর্মের জবাবদিহি করতে হবে জেনে ভীত হলো! শত প্রলোভন, ভয়-ভীতি, চাপ সহ্য করে, প্রচণ্ড বৈরী সমাজের সকল বৈরীতাকে মোকাবেলা করেও তার ধর্মমতে টিকে রইল। এটা কি কম বিস্ময়?'

তিনি কিছুক্ষণ নীরবে চেয়েই রইলেন। মনে হলো, পিটারের পরিবর্তনটা কতটা ব্যাপক, কতটা বিস্ময়কর, সেটা ভালো করে বোঝার সময় দিতে চান আমাকে! এভাবে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকার পরে আবার নিজে থেকেই শুরু করলেন 'তার পরিবর্তনে প্রভাবিত হয়ে তার নিকটাত্মীয়, তার বন্ধু-বান্ধব, একই সমাজের আরও চব্বিশজন মুসলমান হলো! একটাবার চিন্তা করে দেখ, ইসলাম তার জীবনযাত্রায় কী গভীর ছাপ ফেলেছে যে তার আশেপাশের এতগুলো লোককেও প্রভাবিত করেছে! সে নিজেই আমাকে বলেছে;

'প্রফেসর, মরুভূমিতে তাবুতে বসে তোমার কাছে শুনেছিলাম, প্রত্যেকটি কাজের জবাব দিতে হবে, দিতেই হবে! সে থেকে আজও ভয়ে বুক কাঁপে! ভাবি, হায়, যদি জন্মই না হতো!' ড. জগলুল মুখ ঘুরিয়ে আবারও আমার দিকে চাইলেন, চোখে চোখ রেখে প্রশ্ন করলেন 'বলতে পারো, আমরা মুসলমানরা জীবনে কতবার কুরআনে পড়েছি, শুনেছি, মৃত্যুর পরে সকল কাজের জবাব দিতে হবে, তার পরেও কি আমাদের বুক কেঁপেছে ভয়ে? আমরা কি ভীত হয়েছি? কোন পরিবর্তন কী এসেছে আমাদের জীবনে?'

কথাগুলো বলে তার সূতীক্ষ্ণ চোখে চেয়েই রইলেন। মনে হয় তার এই বিস্ময়াভীভূত শ্রোতাকে কিছুটা ভাববার সময় দিচ্ছেন। আসলেই আমি তখন বিস্ময়ে বিমূঢ়, নির্বাক! মুখটা একটুখানি এগিয়ে এনে আবার বললেন 'মনে রেখো, সে জবাবও দিতে হবে! Nothing will go unaccounted for!

মেলেনি, সুষমা, এবং জেমা সবাই অবাক বিস্ময়ে ঘটনাটা শুনল। ঠিক যেমনটা আমি বিস্ময়াভিভূত হয়ে শুনেছিলাম ড. জগলুলের কাছে। সেদিনকার সেই বিস্ময়ভাবটা যেন আজও আবার নতুন করে উপলব্ধী করলাম নিজের মনেই। চোখের সামনে যেন আজও ড. জগলুলের সেই মুখভংগীটা স্পষ্ট দেখতে পাই।

কিছুক্ষণ থামলাম। সবাই নিশ্চুপ। একটু পরে আমিই নীরবতা ভেঙ্গে বললাম 'দেখ, ইসলাম একটি ধর্মের নাম বটে, তবে এ ধর্ম তোমাদের চেনা জানা ধর্মের মত নয়।

www.pathagar.com

'ইসলাম' নামের ব্যাপ্তি ছড়িয়ে থাকে জীবনের সবক'টি। মনুষ্যজীবনের এমন কোন অংগণ নেই, যেখানে ইসলাম তার প্রভাব বিস্তার করে না।

'ইসলাম' নামটির রয়েছে গভীর তাৎপর্যপূর্ণ অর্থ। রয়েছে 'শান্তি'র অভীধা 'আনুগত্য'র অংগীকার 'আত্মসমর্পণ' এর ঘোষণাও। এই 'শান্তি' 'আত্মসমর্পণ' 'আনুগত্য' এগুলো মানুষের সারাটি জীবনব্যাপি। এই 'শান্তি' জীবনের প্রতিটি নিশ্বাস প্রশ্বাসের সাথে জড়িত। এই 'আত্মসমর্পণ' তার প্রতিটি ইচ্ছা অনিচ্ছার সাথে সম্পর্কিত। তোমরা যাকে বল 'ব্যক্তি স্বাধীনতা' সেই ব্যক্তি স্বাধীনতার সাথে ইসলাম ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ইসলাম কোথাও তা নিয়ন্ত্রণ করে, সীমিত করে। বিশেষ করে, যেখানে এই 'ব্যক্তিস্বাধীনতা' ব্যক্তি বা গোষ্ঠির ক্ষতি করার বিন্দুমাত্রও সম্ভাবনার সৃষ্টি করে।

ইসলামের সকল শিক্ষা আর দর্শন আবর্তিত হয় ব্যক্তিকে ঘিরে। আবর্তনের সুত্রপাত ও পরিধি ব্যক্তি থেকে শুরু হয়ে ছড়িয়ে পড়ে পরিবার, সমাজ, দেশ এবং সমগ্র বিশ্বসমাজে। এই কারণেই আমরা বলি 'ইসলাম একটি বৈশ্বিক ধর্ম, একটি সার্বজনীন মতবাদ।'

খেয়াল করে দেখলে দেখবে, ইসলাম তার সকল শিক্ষা আর আহ্বানের গোড়াতেই ব্যক্তিকে টার্গেট করে। অর্থাৎ ইসলাম পরিবর্তন দাবী করে সর্বপ্রথম একজন মানুষের ব্যক্তি চরিত্রে। তার মন মানস, ভেতর বাহির, চিন্তা-চেতনা, শিক্ষা-আদর্শ, ও কর্মকাণ্ড, এক কথায় তার পুরো জীবনেরই পরিবর্তন চায়।

কোন অর্থবহ পরিবর্তন হতে হলে তা সর্বাগ্রে ব্যক্তির মন মানসে, মনোজগতে হতে হবে। মনোজগতে পরিবর্তনের প্রকাশটুকুই প্রতিফলিত হবে তার প্রতিটি কথা কাজে, আচরণে। প্রতি মুহূর্তে। ইসলাম যে শান্তি আর সমৃদ্ধির কথা বলে, ইসলাম যে মুক্তি আর প্রগতির কথা নির্দেশ করে, যে আনুগত্য ও অংগীকারের নির্দেশনা দেয়, তাও এই ব্যক্তি জীবনেই সর্বাগ্রে প্রতিফলিত হতে বাধ্য।

এতক্ষণ টমাস বেল এর যে পরিবর্তনের কথা শুনলে তার নিকটাত্মীয়দের বক্তব্যে, তাতে দেখেছ তার চেতনার জগতে পরিবর্তনটাই হলো আসল। এই পরিবর্তনই ইসলাম চায় একজন ব্যক্তির কাছে। ইসলাম ব্যক্তি-চেতনাতেই সবার আগে পরিবর্তন চায়। ঐ পরিবর্তনটুকু ছাড়া তার বাহ্যিক আচার আচরণে যতই পরিবর্তন হোক না কেন, তার কোন মুল্য নেই, কোন গুরুত্বও নেই।

www.pathagar.com

সভোরো

আরও একজনের কথা বলি, শোন। তিনি একজন ফিলিপিনো, আমার বন্ধু ও সহকর্মী, এলভিন রামোস গারসিতুকা। এখন অস্ট্রেলিয়া নিবাসী। প্রায় ছয় বসর একত্রে কাজ করেছি, একই বিল্ডিং'এ বাস করেছি। ইসলাম কি ভাবে একজন মানুষের মনোজগতে পরিবর্তন ঘটায়, তা তাঁকে দেখেই বুঝেছি।

ছোট খাটো একজনা, চ্যাপ্টা নাক, ছোট ছোট চোখ, কোঁকড়ানো চুল, বত্রিশ বসরের তাগড়া যুবক। ১৯৯৪ সালে উড়ে এলেন কুয়েত সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে চাকুরিতে সুদুর ফিলিপিনস থেকে। দীর্ঘ প্রায় মাসখানেকের আনুষ্ঠানিকতা শেষে জয়েন করলেন, কুয়েতের একমাত্র মেন্টাল হাসপাতালে। এখনেই ক'বসর ধরে আমি কর্মরত। এলভিনও যোগ দিলেন আমারই ইউনিটে। এ দেশে নতুন, তাকে ওরিয়েন্টেশনের দায়িত্বটাও পড়ল আমারই ঘাড়ে।

দু'জনের পেশা এবং কাজের ক্ষেত্রই কেবল এক নয়, বিশেষত্বও একই বিষয়ে, মেন্টাল হেলথ'এ। ফলে দু'জনের মধ্যে অচিরেই বন্ধুত্ব গড়ে উঠল। তা ছাড়া কুয়েতের রিগাই অঞ্চলে ছয়তলা যে ভবনটির ছয়তলায় আমি, তারই দ্বিতীয় তলায় তিনি থাকেন। ফলে অফিস ছাড়াও আমাদের দেখা স্বাক্ষাৎ হয় প্রতিদিনই।

তার কিছু চারিত্রিক বৈশিষ্ঠ ছিল আকৃষ্ট করার মত। তিনি ধীরস্থির, চঞ্চল নন। কথা বলেন কম, শোনেন বেশী। একজন মনযোগী শ্রোতা, বইপোকা মানুষ. সুযোগ পেলেই পড়েন, হাতের কাছে বই, পত্র-পত্রিকা বা ম্যাগাজিন যাই পান, পড়তেন। আর আমারও ব্যক্তিগত পাঠাগারে রয়েছে বাংলা ও ইংরেজি কয়েকশ বই। সে কারণেই ঘন ঘন আমার ফ্লাটে আসতেন, কথা বার্তা শেষে দু'একটা বই নিয়ে যেতেন, পড়া শেষে ফেরতও দিতেন। বাহুল্য সময় নষ্ট করতেন না।

আরব পরিবেশে নতুন, আরবি জানেন না। অথচ মানসিক রুগীদের সাথে তাঁকে আরবিতেই কথা বার্তা বলতে হবে, হাতে গোণা দু'একজন রুগী ইংরেজি জানলেও সংখ্যাগরিষ্ঠ রুগী ও মিশরীয় কর্মচারিদের সাথে আরবিতে কমিউনিকেশন ছাড়া আর কোন পথ নেই।

www.pathagar.com

কুয়েতে বিদেশীদের জন্য দেয়া সরকারের এক বিশেষ ভাষা কোর্সে তিন বসর আরবি শেখার কারণে একটু আধটু যাই শিখেছি, তাতেই এলভিনের চোখে আমি আরবি বিশেষজ্ঞ (!)। তিনি বিভিন্ন সময়ে জানতে চান এটা কি? ওটা কি? আরবিতে এটা কেমন করে বলে? ওটা কিভাবে বলতে হয়? ইত্যাদি ইত্যাদি। কখনও কখনও আমার বলা দু'একটা শব্দ পকেটে থাকা নোট বুকে টুক করে লিখেও নেন।

অফিস আওয়ারে নামাজটা অফিসেই পড়ি। এ ব্যাপারে তিনিও দারুণভাবে সাহায্য করেন। একজন অমুসলিম হয়েও নামাজ আদায়ে তার সহযোগিতায় খুবই উপকৃত হয়েছি এবং তার প্রতি কৃতজ্ঞও বটে। সুযোগ পেলেই নামাজ, ইসলাম নিয়ে মাঝে মাঝে দু'একটা প্রশ্নও করেন। সীমিত জ্ঞানে যতটা পারি উত্তর দেই। তিনিও মন দিয়ে শোনেন। কখনও কখনও বিবাহ তালাক এসব নিয়েও প্রশ্ন শুরু করেন।

আমাদের কয়েকজন ভারতীয় সহকর্মীদের মধ্যে একজন ছিলেন শিখ ধর্মাবলম্বী, রঞ্জিত সিং। তার ভালো লাগত না এসব সেটা তার আচরণেই বোঝা যেত। এলভিনের সাথে ইসলাম নিয়ে আলোচনা জমে উঠলেই দেখতাম রঞ্জিত সিং কায়দা করে তার মধ্যে ছেদ টানছে। এলভিনকে ডেকে কোন কাজে লাগিয়ে দিত। অথবা ভিন্ন কোন প্রসঙ্গের অবতারণা করত। আমরা রঞ্জিতের ব্যবহারকে আমলই দিতাম না।

আরবদের একটা চমৎকার বৈশিষ্ঠ হলো, তারা যে কোন সুযোগে পরস্পরের কল্যাণ কামনায় দোওয়া করে। যেমন ধর, তুমি অফিসে তোমার কাজ করছ, পাশে একজন আরব কলিগও আছেন, তার কলমের কালি শেষ, তোমার কলমটা একটু সময়ের জন্য চেয়ে নিল, কাজ শেষে সেটা যখন তোমাকে ফেরত দেবেন তিনি, তখন তোমার জন্য দোওয়া করে বলবেন 'যাজাকাল্লাহ খাইর' অর্থাৎ আল্লাহ তোমাকে উত্তম প্রতিদান দিন। তোমরা এ ক্ষেত্রে বলে থাক 'থ্যাংক ইউ'।

অথবা ধর তুমি নতুন গাড়ী কিনলে, তোমার এ্যরাবীয়ান বন্ধু তা জানলে অমনি সে তোমার গাড়ীর জন্য দোওয়া করে বলে উঠবে 'বারিকাল্লাহু লাক' অর্থাৎ আল্লাহ এতে তোমাকে বরকত দিন'। তোমরা এ ক্ষেত্রে বলে থাক, কংগ্রাচুলেশনস!

অথবা ধর, তুমি কারো রুমে প্রবেশ করলে, হোক না সে তোমার কলিগ, কিংবা স্ত্রী-পুত্র বা কন্যা কিংবা পরিবারের কেউ, ঢুকতেই একজন মুসলমান হিসেবে তুমি তাদের সালাম দেবে আসসালামু আলাইকুম বা 'তোমার উপরে শান্তি বর্ষিত হোক' বলে, তেমনি তারাও তোমার সালামের জবাব দেবার পাশাপাশি বলে উঠবে

www.pathagar.com

'আলহামদুলিল্লাহ সালামা' অর্থাৎ সকল প্রশংসা আল্লাহর, তোমার আগমন শুভ হোক'। তোমরা এ ক্ষেত্রে বলে থাক, গুড মর্ণিং বা গুড ইভনিং ইত্যাদি।

ছেলে-বুড়ো, ছোট-বড় দেখা হলেই সালাম দেবে, যতবারই দেখা হোক, সালাম বিনিময় করবে। আর সালাম তো কল্যাণ কামনায় একটা দোওয়া বৈ কিছুই নয়। এগুলো আরবদের দৈনন্দিন সংস্কৃতিতে এমনভাবে মিশেছে যে, মানসিক রুগী, যাদেরকে সাধারণত মানসিক দিকে অক্ষম বলেই ধরা হয়, সেই তাদেরও প্রাত্যহিক আচরণে এগুলো দেখা যায়। এই বিষয়টিই এলভিনকে আকৃষ্ট করে।

আসলে কখন কার নজরে ইসলামের কোন দিকটি আটকে যায়, বলা মুশকিল। এক ফ্রেঞ্চ ইন্টোরিয়র ডিজাইন ইঞ্জিনিয়ারের কথা জানি, তার নজরে প্রথমে পড়েছিল মুসলমান পরিবারে বাবা-মা, স্বামী-স্ত্রী, সন্তানের, ভাই-বোন ও আত্মীয়-স্বজনের পরস্পরিক দায়িত্ববোধের বিষয়টা। তার নাম মিশেল। তিনি যেদিন মুসলমান হন, সেদিনই তার সাথে কথা বলার সুযোগ হয়েছিল অনেকটা আকস্মিক ভাবেই। সেটাও ছিল কুয়েতের আই পি সি অফিস সংলগ্ন মসজিদের ঘটনা।

দিনটি ছিল ১১ ই জুলাই। ১৯৯৯ সাল। রাত সাড়ে আটটা। মরুর দেশ কুয়েতের আবহাওয়া প্রচন্ড উত্তপ্ত। সূর্য ডুবে গেছে সেই কখন কিন্তু এখনও বাতাসে আগুনের হল্কা, মনে হয় চামড়া পুড়িয়ে দেবে! সন্ধার আগে বেরিয়েছিলাম, বাসায় ফেরার তাড়া নেই যদিও, তবু যতটা দ্রুত কাজ শেষ করে ফেরা যায় ততই ভালো। এই উত্তপ্ত আবহাওয়ায় হেটে বেড়ানোটাও বড়ই কষ্টকর!

সাথে ছিলেন বন্ধুবর শামসুল হক ভাই। একটা ভালো মত জায়গা দেখে গাড়ীটা রেখে দু'জনে হাটতে হাটতে কুয়েত শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত মোল্লাহ সালেহ মসজিদের কাছাকাছি পৌছুতেই এশার আজান হলো। নামাজের তখনও দেরি কুড়ি মিনিট সময়, শামসুল হক ভাইকে বললাম 'চলুন নামাজ শেষে বাজারে ঢুকি, নইলে জামাতটাই মিস হবে।' সে মতই দু'জনে গিয়ে মসজিদের ভেতরে বসলাম।

এখানে প্রায়ই আসি। এখানেই রয়েছে পুরো মধ্যপ্রাচ্যের বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান, 'আই পি সি' বা 'ইসলাম প্রেজেন্টেশন কমিটি'র অফিস। ইসলামের বিভিন্ন দিক নিয়ে নিয়মিত আলোচনানুষ্ঠান হয়। বিশ্বখ্যাত ইসলামি চিন্তাবীদ ও বক্তারা প্রায়ই আসেন, আলোচনা করেন। মরহুম আহমেদ দীদাত, মিশরের জগলুল নাজ্জার এবং ভারতের ডা. জাকির নায়েক'সহ অনেকেই এখানে আলোচনা করেছেন। কুয়েতে অবস্থানরত আমেরিকান

www.pathagar.com

কিংবা ইউরোপীয় সৈন্যরা প্রতিমাসে নিয়মতি এরকম অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়। কখনও কখনও নিজেও কোন কোন লেকচারে উপস্থিত থেকেছি।

বিশ্বের সত্তরটিরও বেশী দেশ থেকে চাকুরি, ব্যবসা বা অন্যান্য কাজে এসে অনেক অমুসলিমের বাস কুয়েতে। এ ছাড়াও রয়েছে হাজার হাজার আমেরিকান ও ন্যাটো সৈন্য, অনেকের পরিবার পরিজন। 'আই পি সি' এদের কাছেই অত্যন্ত দক্ষতার সাথে ইসলামের দাওয়াত তুলে ধরছে।

এখানেই পরিচয় হয়েছিল খৃষ্টান পাদ্রী থেকে ধর্মান্তরীত দা'য়ী ইলাল্লাহ, ফিলিপিনো নওমুসলিম মরহুম আব্দুলাহ স্পিরিটো'র সাথে। নিজের এক দাওয়াতি টার্গেটের কারণে আব্দুল্লাহর কাছে ঘন ঘন আসতাম। এখনও সময় পেলেই আসি, কেননা এখানে নিয়মিতই কিছু স্বর্গীয় মহুর্তের অবতারণা হয়, যার সাক্ষী হতে চাই। নামাজ শেষে সালাম ফেরানোর পরই দেখলাম 'আই পি সি'র ইউরোপ ও পাশ্চাত্য বিভাগের প্রধান ড. ইউসুফ এগিয়ে এসে ইমাম সাহেবের সাথে কথা বলে মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড়ালেন। ইমাম সাহেবই প্রথমে মুখ খুললেন, আল্লাহর হামদ ও রাসুলাহ (স:) এর উপরে দরুদ শেষে;

'সম্মানীত মুসল্লীবৃন্দ, আল্লাহ যাকে খুশী হেদায়েত দান করেন, দান করেন ইসলামের মত অমুল্য নিয়'মত। এখন আপনাদের কাছে এমনই একজনকে উপস্থাপন করছি, যাঁকে আল্লাহ তার অপার অনুগ্রহে ধন্য করতে যাচ্ছেন। যিনি মহান আল্লাহর রহমতের বারীধারায় সিক্ত হতে যাচ্ছেন।'

এতটুকু বলেই ড. ইউসুফের দিকে তাকালেন। ড. ইউসুফ দরজার দিকে ঈশারা করতেই দেখলাম 'আই পি সি'র একজন কর্মচারী কুয়েতি যুবকের সাথে এগিয়ে আসছে পরিপাটি বেশভূষায় সজ্জিত প্রায় সাত ফুট উচ্চতার ইউরোপীয় ব্যক্তি। লাল টুক টুকে রং, সাদা রেশমী চুল, বিনম্র ভঙ্গিতে ইমামের পাশে দাঁড়ালেন।

ইমাম তাকে কলেমা পড়ালেন। তিনিও অশ্রু চিকচিক করা দু'চোখ নিয়ে অনভ্যস্ত উচ্চারণে তা পড়লেন। মসজিদ ভর্তি মুসল্লীরা ত্বাকবির ধ্বনী দিল। বেশ ক'বার মসজিদ ভরে ধ্বনিত হল আল্লাহু আকবর! তিনি মুসলমান হলেন। প্রথমে ইমাম সাহেব এবং পরে ড. ইউসুফ কোলাকুলি করলেন। এরপরে শুরু হলো উপস্থিত মুসল্লীদের কোলাকুলির পালা। একসময় আমিও এগিয়ে সৌভাগ্যবান ব্যক্তিটির সাথে কোলাকুলি করলাম, বললাম; Welcome to the world of eternal peace। তিনিও জবাবে বললেন; Thank you।

www.pathagar.com

সুন্নত শেষে দেখি তখনও কোলাকুলি চললেও ভীড় অনেকট কম। এক কোণায় ড. ইউসুফ দাড়িয়ে একা, কোলাকুলি শেষে তিনি নওমুসলিমকে নিয়ে যাবেন, এই জন্য। পূর্ব পরিচয় থাকার সুবাদে ড. ইউসুফকে ধরলাম 'তোমার ব্যস্ততা না থাকলে আমি নওমুসলিমের সাথে একটু কথা বলতে চাই'। তিনি সানন্দে রাজী হয়ে বললেন 'চল আমার অফিসে গিয়ে বসি, সেখানেই কথা হবে'।

এরপরে বেসমেন্ট-এ ড. ইউসুফের সুসজ্জিত অফিসে মোট চারজন মুখোমুখি বসলাম। নওমুসলিমের পাশে আমি, আমার পাশে সামসুল হক আর ড. ইউসুফ আমাদের মুখোমুখি সোফায়। তিনিই পরিচয়টা করিয়ে দিলেন নওমুসলিমের সাথে।

'এই প্রথম জানলাম তার নাম, মিশেল। অভিনন্দন জানালাম তার নতুন জীবনের জন্য 'কংগ্রাচুলেশন, এই মুহূর্তে তোমার আবেগটুকু বুঝি, বুঝতে পারি মানসিক অবস্থাটাও। এরপরেও একটু বিরক্ত করব, আমাদের সময় দেবার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ। আমাদের বড় ইচ্ছা, তোমার পরিচয়টুকু জানি তোমার নিজের কাছ থেকেই' বলেই তাকিয়ে রইলাম।

ভদ্রলোক একটু নড়ে চড়ে বসলেন এবং জানালেন, দক্ষিণ ফ্রান্সে জন্ম, নাম মিশেল, বয়স বিয়াল্লিশ বসর, পেশায় ইন্টেরিয়ার ডিজাইন ইঞ্জিনিয়ার, প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছেন। বিগত আট বসর কুয়েতের একটি প্রতিষ্ঠানে চাকুরিরত এবং এই প্রথম কোন আরব দেশে বসবাস করছেন। বসর পাঁচেক ছিলেন রাশিয়ায়। যুক্তরাষ্ট্রসহ ইউরোপের সবক'টি দেশ ঘুরেছেন নেশা, পেশা, কিংবা শখের বশে। স্ত্রীর সাথে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটেছে, দুই কন্যা ফ্রান্সে পড়াশোনা করছে।

এই পর্যায়ে একটু থামলেন। ক'টি মুহূর্ত নীরবে কেটে গেল। তার আবেগটুকু বোঝার চেষ্টা করছি। সম্ভবত প্রবাসে একজন স্নেহপরায়ণ পিতার চোখের সামনে ভাসছিল পারিবারিক ছায়াবঞ্চিত দুই কন্যার মুখচ্ছবি! একজন পিতার জন্য বড়ই দূর্বল জায়গা, কিন্তু আমার'তো চলছে না থেমে থাকলে! তাই আবার নীরবতা ভেংগে জানতে চাইলাম, 'তুমি মুসলমান হলে। পূর্বপরিকল্পনামত কাজটি করলে? না, কোন আবেগতাড়িত সিদ্ধান্ত!

সরাসরি আমার চোখে চোখ রেখে বললেন 'দেখ, দীর্ঘ আট বসর আরবদের মাঝে বাস করছি, ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছি। বিগত পাঁচ বসর বইপত্র ও কুরআনের তরজমার মাধ্যমে ইসলামক জানছি, আরবি ভাষা শিখছি কুরআনকে ভালোমত বোঝার জন্য। যা করেছি, বুঝে শুনে, ভেবে চিন্তেই করেছি।

www.pathagar.com

ইসলামের কোন বিষয়টি তোমাকে বেশী আকৃষ্ট করেছে'? জানতে চাইলাম। 'তোমাদের মুসলিম সমাজে স্বামী-স্ত্রী, পিতা-মাতা ও সন্তান-সন্ততি, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন, এদের মধ্যে যে অসম্ভব রকম অটুট বন্ধন, সহমর্মিতা ও ভালোবাসা, এটা এ বিশ্বে একমাত্র মুসলিম সমাজ ছাড়া আর কোথাও দেখতে পাওয়া অসম্ভব ব্যাপার! আমরা পশ্চিমের বাসিন্দারা এগুলো হতে যোজন যোজন দূরে! এগুলো কল্পনাও করতে পারি না! তাই যখন এই ধরনের সম্পর্ক বাস্তবে দেখলাম, তখন অবাকই হলাম! বুক ভরা হাহাকার কিন্তু অন্তর জুড়িয়ে গেল তা দেখে!

ড. ইউসুফ জানতে চাইলেন, 'তুমি কি জানো এর পেছনে মূল কারণটা কি'?

'হা, গভীরভাবে ভেবেছি, একবার মনে হয়েছিল এটা আরবি কালচার। অনেক অনারব মুসলমানের সাথে মিশেছি, তাদের মধ্যেও একই অটুট পারিবারিক ও মানবিক বন্ধন, বৃহত্তর ভাতৃত্ববোধের চেতনা। আমার যে কোন প্রয়োজনে, সমস্যায় প্রথম যারা এগিয়েছেন, তারা মুসলমান, অথচ সেই একই ক্ষেত্রে স্বজাতি পরিচিত বন্ধুদের ভূমিকা প্রশ্নাতিত নয় বরং দু:খজনক!

এই জিনিসটিই আমাকে ভাবিয়েছে গভীরভাবে। একসময়ে এ সিদ্ধান্তে আসতে বাধ্য হয়েছি, এর পেছনে অবশ্যই কোন ধর্মীয় কারণ আছে। বাইবেলে কোন সুত্র নেই। কুরআনের তরজমা পড়েছি, এখনও পড়ছি, আমার অবসরই কাটে কুরআন পড়ে। এর ছত্রে ছত্রে ভালবাসা ক্ষমা, ঔদার্য আর ভ্রাতৃত্বের আহ্বান! সকল প্রশ্নের উত্তরই কুরআন নীরবে আমাকে দিয়ে গেছে! এরপরেই সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এখন আমি মুসলমান। আলহামদুলিল্লাহ'।

'তোমার কন্যাদের জানিয়েছ?' জানতে চাইলাম।

'হ্যা জানিয়েছি, আমার সহকর্মী, বন্ধু বান্ধবদের জানিয়েছি। জীবনের শ্রেষ্ঠতম কাজটি গোপনে করতে চাইনি। চেয়েছি সারা বিশ্ব জানুক আমার সৌভাগ্যের কথা, আমার প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহের কথা, আমি মুসলমান। আমি মুহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ সঃ-এঁর উম্মত!

কথায় কথায় রাত হয়েছে। নওমুসলিম এবং ড. ইউসুফকে ধন্যবাদ জানিয়ে উঠলাম। আসার সময় নওমুসলিম হাতটি চেপে ধরলেন, সরাসরি চোখে চোখ রেখে বললেন 'আমার জন্য দোওয়া করো'। হৃদয়ের গভীরে পৌছুলো যেন কথাগুলো। তাকে সালাম জানিয়ে পা বাড়ালাম।

www.pathagar.com

এয়ারপোর্ট রোড ধরে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিলাম ফোর্থ রিং রোড পানে। রাস্তায় অসংখ্য গাড়ী, পাশে সামসুল হক বসে। গাড়ীর স্টিয়ারিং এর উপরে হাত, দৃষ্টি সামনে। কিন্তু মনের কোণে বার বার ভেসে উঠছিল নওমুসলিম মিশেলের কথাগুলো 'আল্লাহ আমাকে মুসলমান বানিয়েছেন, বিশ্ব জানুক আমার সৌভাগ্যের কথা! আলহামদুলিল্লাহ, আমি রাসুলুলাহ সঃ এঁর উম্মত!

আহা, আমরা যারা নিজেদেরকে 'আশেকে রাসুল' তাঁর 'খাঁটি উম্মত' বলে নিত্য ঘোষণা দেই, জেহাদের মেকী উত্তাপে মুসলমান হয়ে মুসলমানের গলা কাটি, তারা যদি একটাবার বুক ফুলিয়ে বলতে পারতাম 'বিশ্ব জানুক আমার সৌভাগ্যের কথা, আল্লাহ আমাকে মুসলমান বানিয়েছেন, আলহামুদলিল্লাহ, আমি রাসুলুল্লাহ সঃ এঁর উম্মত!'

আঠারো

এরই মধ্যে রমজান মাস এসে গেল। বেশ কিছুদিন এলভিনের সাথে আমার কোন রকম আলোচনা হয়নি, যদিও দেখা সাক্ষাৎ হয়েছে একটু আধটু। একরাতে তারাবির নামাজ শেষে রুমে এসে বসার মিনিট দুয়েকের মধ্যেই তিনি এলেন। কিন্তু বসলেন না, তেমন কিছু বললেনও না, শুধু বললেন 'তুমি কি আমার সাথে একটু নিচে আসবে?'

তার দিকে চেয়ে মনে হলো একটা কিছু ঘটেছে, বিস্মিত হলেও কোন প্রশ্ন না করে নীচে নেমে এলাম। এমনকি লিফটের মধ্যেও তিনি কিছুই বললেন না! 'তোমাকে বিরক্ত করার জন্য দুখিত, আমাকে কি একটা কুরআন ও তার অনুবাদ দিতে পার?' অবাকই হলাম।

'ও, এই কথা? তা এর জন্য নীচে আসার কি দরকার ছিল? রুমে বললেই পারতে, ওখানেই তা কপি দিতে পারতাম! ' জবাবে আমতা আমতা করে যা বললেন তা এই যে, একই ফ্লাটে আমার পাশের রুমে বৃহত্তর রাজশাহী জেলার এক বাংলাদেশি খৃষ্টান ভদ্রলোক থাকেন, যিনি একাধারে এলভিনেরও সহকর্মী ও বন্ধু। এলভিন তাকে জানাতে চান না যে, আমার কাছ থেকে তিনি কুরআন কপি নিয়েছেন।

আমার কৌতুহল বাড়ল। জিজ্ঞেস করেই ফেললাম সেই বন্ধুটির কথা। সেও কি তবে মিশরীয় খৃষ্টান ও ভারতীয় শিখ সহকর্মীর ভূমিকায় নেমেছে? এলভিন কোন জবাব না

www.pathagar.com

দিয়ে কেবল এতটুকু বললেন 'তোমকে পরে বলব। এখন এ বিষয়ে জানতে চেও না।' আমিও কথা বাড়ালাম না। একটা কিছু বুঝে নিয়েছি। এলভিনকে বললাম;

'তুমি ফ্ল্যাটে যাও, আমি এক্ষুণি ইংরেজি তরজমাসহ কুরআনের একটা কপি পৌছে দেব। তবে আমার একটা অনুরোধ থাকল, যখনই তা পড়বে, গোছল সেরে পবিত্র হয়ে পড়বে। যেখানে সেখানে ফেলে রাখবে না। প্রয়োজন ফুরিয়েছে মনে করলে আমাকে ফেরত দেবে। আমি যদি না থাকি, তবে যে কোন মুসলমানের হাতে কিংবা আশে পাশে যে কোন মসজিদে দেবে। তিনি সানন্দে আমাকে আশ্বস্ত করলেন।

ঐ রাতেই আমার ব্যক্তিগত লাইব্রেরী থেকে কুরআনের ইংরেজি তরজমাওয়ালা কপি দিয়ে এসেছিলাম। এরই মধ্যে ঈদ এসে গেল রোজা শেষে। এক নাগাড়ে আটদিন লম্বা ছুটি সাপ্তাহিক ছুটির দিনগুলোসহ। ঠিকমত দেখা স্বাক্ষাৎ নাই ওর সাথে। আমিও ঈদের সামাজিকতায় বন্ধু বান্ধব নিয়ে ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছি। আর ঐ ক'টা দিন ছুটির মাঝেও আমাকে দিন তিনেক অফিস করতে হয়েছে।

ঈদের পরে অফিস খুলল। ছুটির পরের তৃতিয় দিনে বিকেলে শিফটে অফিসে বসে আছি, এমন সময় টেলিফোনটা বেজে উঠল। অপরপ্রান্তে এলভিনের চেনা কণ্ঠস্বর, বলল 'তুমি কি একটু সময় দিতে পারবে? জরুরী কিছু' জানতে চাইলাম আমি। 'হ্যা খুবই জরুরী কিছু কথা আছে তোমার সাথে' বললেন তিনি।

'ঠিক আছে চলে এস' বলে ফোনটা রেখে ভাবতে থাকলাম, কি এমন জরুরী কথা থাকতে পারে? বেশিক্ষণ ভাবতে হল না, আধাঘন্টার মধ্যেই এলভিন এসে ঘরে ঢুকলেন। উস্কো খুস্কো চুল, কোটরে ঢুকে যাওয়া চোখ, খোঁচা খোঁচা দাঁড়ি থুতনীর নিচে, স্পষ্টতই বিধস্থ চেহারা। তাঁকে দেখে চমকেই উঠলাম অনেকটা, জানতে চাইলাম 'তুমি ঠিক আছ তো? অসূখ বিসূখ করেনি তো?

উত্তর না দিয়ে এলভিন হাসার চেষ্টা করলেন। কিন্তু তার চেহারা, পোষাক-আশাক, চাহনীই বলছে তিনি স্বাভাবিক নন। চেয়ারটা ঠেলে দিলে তিনি ধপাস করে বসলেন। মুখে কোন কথা নেই তার। একবার ছাদের দিকে তাকান, আর একবার আমার দিকে তো পরক্ষণেই জানালার বাইরে! অস্থির একটা ভাব!

কিছু না বলে খুব ভালো করে খেয়াল করতে থাকলাম। চুপচাপ অপেক্ষা করছি, জানি তিনি কিছু একটা বলতেই এসেছেন, বলবেনও। কিছুক্ষণ না যেতেই তিনি আমার দিকে তাকালেন, সরাসরি আমার চোখের দিকে 'আমাকে একটু সাহায্য কর জিয়া,

www.pathagar.com

আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, মুসলমান হব।' আমার বুকের ভেতরে উত্তেজনা দানা বাধছে যেন! চোখের কোনে জ্বালা করে উঠল আবেগে!

আমার দাওয়াতি টার্গেটের তালিকায় এলভিন চার নম্বর। এর আগে মাত্র দু'জনের বেলাতে এমনটা ঘটেছিল। এক বাংলাদেশী হিন্দু যুবকও মুসলমান হয়েছিল, তার কাছে ইসলাম তুলে ধরতে বসর দু'য়েক সময় লেগেছিল। সেও ইসলাম নিয়ে প্রশ্ন করত, তবে সেগুলো তেমন জটিল ছিল না, কাজেই দাওয়াত তুলে ধরতে বেশী বেগ পেতে হয়নি।

এলভিনের বেলায় অবস্থাটা ভিন্নরকম। তার অনেক প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর আমার নিজেরই জানা ছিলনা। তাই নিজেকে পড়াশোনার উপরেই রাখতে হয়েছে। যদিও তাতে লাভ আমারই হয়েছে। এলভিন যদি সত্যিই মুসলমান হন, তবে সেটা হবে আমার জীবনে এরকম তৃতীয় ঘটনা। আলহামদুলিল্লাহ্ পড়লাম মনে মনে। ভেতরের উত্তেজনাটুকু চেপে বললাম 'ভাল তো, আল্লাহ্ চাইলে হবে। তবে তাড়া হুড়ার কি আছে? ইসলামকে আরও জান, বোঝার চেষ্টা করো। কত প্রশ্ন উঠবে মনের মধ্যে, সেগুলোর উত্তর ভেবে দেখ, জানার চেষ্টা করো।'

'তা ছাড়া, ইসলাম তোমার কাছে যে পরিবর্তনটুকু দাবী করে, সেটুকু তুমি মেটাতে পারবে কি না, সেটাও তো ভাবতে হবে তোমাকে। যদি মনে করো যে, তুমি সে দাবী মেটাতে প্রস্তুত এবং তা মেটাতে পারবে, তা হলে মুসলমান হও, নিশ্চয়ই তোমাকে সাহায্য করব, নিশ্চিন্ত থাক।' কথাগুলো এলভিন মন দিয়ে শুনলেও নাছোড় বান্দাহর মত বলে উঠলেন;

' আজ ক'দিন ধরেই ভাবছি জিয়া, আবেগে সিদ্ধান্ত নেইনি। তুমি যে কুরআনটা দিয়েছিলে তা ছুটির মধ্যে রাত দিন পড়েছি। জানো জিয়া, কুরআন যেন আমার নিজের কথাই বলছে এর সব পাতাগুলো জুড়ে! আশে পাশের চেনা জানা লোকগুলোকে নিখুঁতভাবে চিনিয়ে দিচ্ছে! আমার সামনে যেন হীরা, মনি-মুক্তার ছড়াছড়ি! আমি যেন এক স্বপ্ন রাজ্যে উড়ে বেড়াই! এত অবাক করার মত বই, আগে বুঝিনি, স্বপ্নেও ভাবিনি। কেউ আমাকে সে কথাটা একবারের জন্যও বলে নি!' কিছুক্ষণ থামলেন তিনি। আমিও নিশ্চুপ চেয়ে রইলাম। মাত্র কয়েক সেকেন্ড চুপ থেকে আবারও মুখ খুললেন 'যত পড়ছি, তত অবাক হচ্ছি, দেশে স্ত্রীকে জানিয়েছি। সে মহাক্ষ্যাপা, হুমকি দেয়া থেকে শুরু করে অনূনয় বিনয়, সব কিছুই করে যাচ্ছে, ছোট্ট মেয়েটার কথাও বলছে, অন্তত তার দিকে চেয়ে হলেও যেন এমন কাজ না করি, সে অনুরোধও করছে বার বার।'

www.pathagar.com

এ পর্যায়ে এসে আবার থামলেন, হয়তবা স্ত্রী কিংবা শিশুকন্যার মুখখানা মনে করার চেষ্টা করলেন আর একবার। কিছুক্ষণ নীরব থেকে আবারও চাইলেন আমার দিকে, যেন তার স্ত্রীকে নয়, বরং আমাকেই আশ্বস্থ করতে বলে উঠলেন 'আমি তাকে ভালবাসি জিয়া, বিশ্বাস করো, সত্যিই তাকে ভালবাসি তাই চেষ্টা করছি বোঝানোর। প্রাণের চেয়েও বেশী ভালবাসি পুতুলের মত মেয়েটাকে, সে আমার কলিজার টুকরা! দেখে নিও, একদিন তারা বুঝবে, তারা ঠিকই আমার জীবনে ফিরে আসবে একদিন '

তার গলাটা ধরে এল, মুখ নীচু করলেন তিনি, চোখ থেকে টপ টপ করে কয়েক ফোটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল তার কোলের উপরে। ওর এ অবস্থা দেখে মনটা কেমন এক দু:খবোধে ভরে গেল যেন। সেই সে যুগে, প্রিয় রাসুলুল্লাহ সাঃ-এঁর যুগেও যে সব সাহাবীরা তাদের আপনজন ছেড়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, তারাও তো এমনি করেই ত্যাগের বিরাট নজরাণা দিয়েই নতুন ধর্মে এসেছিলেন! আমার সামনে যেন ভেসে উঠল সেইসব চিত্র।

নিজেকে সে মুহূর্তে খুবই সৌভাগ্যবান মনে হয়েছে। মুসলমান পরিবারে জন্মের কারণে ইসলাম যেন পারিবারিক সুত্রেই পেয়েছি। এর ধারক, বাহক হতে গিয়ে কোন ত্যাগ স্বীকার করতে হয়নি, বাবা মা, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা, পরিবার, পরিজন, আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব কাউকেই ছাড়তে হয়নি। মুসলমান হতে কোন মুল্যই দিতে হয়নি।

এলভিন চুপচাপ নীচমুখে বসে আছেন। চেয়ার ছেড়ে তার পাশে দাঁড়াতেই তিনিও উঠে দাঁড়ালেন। তাকে সাথে করে অফিস থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বললাম ' চিন্তা করবে না, তাড়াহুড়োও করবে না। ধৈর্য ধর। আরও ভালো করে ইসলাম বোঝ, স্ত্রীকেও বোঝাতে থাক। ইনশাআল্লাহ তিনিও একসময় বুঝবেন এবং ফিরে আসবেন, দেখে নিও। এখন বাসায় যাও, বিশ্রাম নাও। কাল তোমার সাথে যোগাযোগ করব, কালও আমার বিকেলের শিফট, সকালে ফ্রী আছি। তখন আরও বিস্তারিত আলাপ হবে।'

তাকে গাড়ী পর্যন্ত বিদেয় দিয়ে এসেই আই পি সি'তে আব্দুল্লাহ স্পিরিটোকে ফোনে সব বললাম। তিনি আগামি পরশু মাগরিবের পরে এলভিনকে সাথে করে নিয়ে যেতে বললেন তার অফিসে।পরদিন সকালে এলভিনকে খোঁজ করলাম তার ফ্লাটে। পেলাম না। তার ফ্লাটে বসবাসরত ফিলিপিনো যুবকরা বলতে পারল না তিনি কোথায়। না পেয়ে আমিও ফেরত চলে এলাম।

www.pathagar.com

বিকেলের শিফটে এসেছি কাজ কর্ম তেমন নেই, তাই বসে বসে একটা বই পড়ছিলাম। আসরের সময় হয়েছে, উঠব উঠব করছি, এমন সময় হঠাৎ এলভিন সামনে এসে দাঁড়ালেন! একেবারে সামনে। আজ তাকে অন্য রকম দেখাচ্ছে। মুখ ভর্তি হাসি, পরিপাটি বেশ ভূষা। তাঁকে দেখেই বলে উঠলাম 'তোমাকে সারাটা সকাল খুঁজেছি, কোথায় ছিলে? তোমার ফ্লাটেও গিয়েছিলাম, সেখানেও পাই নি।'

ততক্ষণে এলভিন আমার পাশে এসে গা ঘেষে দাঁড়িয়েছেন। নিজের অজান্তেই উঠে দাঁড়ালাম, সাথে সাথেই এলভিন যেন আমাকে একটা টান দিয়ে চেয়ার থেকে বের করে নিলেন, জড়িয়ে ধরলেন। মুখে বললেন 'জিয়া আমি সেরে এসেছি'। তাকে ছাড়িয়ে নিয়েও ধরে থাকলাম, সরাসরি তার চোখে চোখ রেখেই প্রশ্ন করলাম 'তার মানে'?

তিনি আমাকে ছেড়ে একটু পিছিয়ে দাঁড়ালেন, প্যান্টের পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ বের করে তা দেখিয়ে বললেন 'কোর্টে গিয়েছিলাম, এফিডেভিট'টা সেরে এসেছি'। কাগজটা আমার দিকে তুলে ধরে তিনি আরও একবার হাসলেন, বললেন 'আমি আর সেই আমি নেই। আমি এখন 'মুহাম্মদ রামোস গারসিতুকা।' পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষটির নামটিকে নিজের নাম হিসেবে নিয়েছি। আমি এখন 'মুহাম্মদ'।

তার মুখে হাসি, হাতে ধরেই আছেন কাগজটা। কিন্তু আমি হাত বাড়ালাম না। পড়ে দেখার তো কোন প্রয়োজন দেখি না, ওর মুখের কথা বিশ্বাস করতে কোন বাধা নেই। আজ দু'টো বসর ধরে তার এ পরিবর্তনটুকু আমার চোখের সামনেই হয়েছে। চিন্তায় ছেদ পড়ল, তিনি বলে উঠলেন;

'কাল তোমাকে বোঝাতে পারিনি আমার অবস্থা, আমি সত্যিই কনভার্ট হতে চাচ্ছিলাম, তুমি আরও ভাববার সময় দিলে। আজ সকালে এক স্বদেশী মুসলিম বন্ধুকে নিয়ে কোর্টে এফিডেফিট সেরেছি, এর পরে গিয়েছি ওজারাতুল আওকাফ-এ, সেখানেই শাহাদা পড়ি। জিয়া, আমি এখন মুসলমান। আমি একজন মুসলমান! আলহামদুলিল্লাহ। জিয়া, আমি একজন মুসলমান!!' ওঁর কথা বিস্ময়ের সাথে শুনছিলাম। কিন্তু তার চেয়েও বিস্মিত হলাম, যখন মুসলমান হবার আনন্দে তিনি শিশুর মত নেচে উঠতে চাইলেন!

নিজের কাছেই নিজেকে আবারও অপরাধী মনে হলো যেন। হায়, আমরা বংশগত 'মুসলমান'রা একটাবারের মতও যদি উপলব্ধি করতাম, ভিন্ন ধর্মের একজন পরিবার পরিজন, সংসার, সহায়-সম্পদ, সব ছেড়ে নিঃসম্বল হয়ে ইসলামে আসেন, মুসলমান

www.pathagar.com

হন। এরা নিজেদের বাবা-মা, স্বামী-স্ত্রী-সন্তান, পরিবার পরিজন, আত্মীয় স্বজন, চাকুরী, বাড়ী-ঘর, ব্যবসা-বাণিজ্য, পারিবারিক বিত্ত বৈভব, এসবের উত্তরাধিকার, সব কিছুই ছেড়ে আসেন।

সব কিছুই তাদেরকে ছাড়তে হয় কেবল সেটুকু পাবার জন্য, যেটুকু আমরা, মুসলমান'রা কোন ত্যাগ স্বীকার ছাড়াই পেয়েছি! একেবারে মুফতে পেয়ে রেডিমেড ভাবেই 'মুসলমান' হয়েছি। ইসলামকে জানা, মানা এবং চেনার ব্যাপারে কোন মানসিক আবেগ ও সংশ্লিষ্ঠতা ছাড়াই মুসলমান বলে পরিচয় দিয়ে চলেছি! ইসলাম বোঝা বা জানার জন্য কিছুই করতে হয়নি, কোন কোন ক্ষেত্রে, কারো কারো ক্ষেত্রে তো জানাও লাগেনি! ইসলাম জানি না, তার পরেও আমরা মুসলমান!

একটা দারুণ লজ্জাকর ঘটনা মনে পড়ল। যতদুর মনে পড়ে ১৯৯৭ কিংবা ১৯৯৮ সালের দিকে কুয়েতের রিগাই এলাকার ঘটনা। এখানে আমেরিকান আর্মি ঘাঁটি গেড়ে বসে আছে। আছে ফরাসী আর্মির বিশেষজ্ঞ টিমও। বাংলাদেশী আর্মিও আছে কয়েক হাজার। আমেরিকান ও ফরাসী আর্মিদের কর্মস্থল 'ক্যাম্প দোহা'। এলাকাটি ইরাক বর্ডার সংলগ্ন কুয়েতের অন্যতম প্রদেশ 'আজ জাহারা' যাবার পথে পড়ে। এটা মূলত মরুভূমির মধ্যে বিরাট এক 'সামরিক শহর'।

হাজার হাজার মার্কিন সৈন্যদের এই ক্যাম্পে বেসামরিক যেসব শ্রমিক কাজ করে, তারা ভারতীয়, শ্রীলংকান আর বাংলাদেশী। এইসব শ্রমিকদের জন্য আলাদা ক্যাম্প করেছে কুয়েত সরকার। সেটা 'ক্যাম্প দোহা' থেকে মাইল দশেক দূরে কুয়েতের 'রিগাই' এলাকায়। কুয়েত সিটি থেকে 'রিগাই'র দূরত্ব মাইল চারেক। এখানেই আমার সরকারি বাসা ছিল, থেকেছি এক যুগ। আমার বাসার সামনে ছোট একটা মাঠ পেরুলেই সেই শ্রমিকদের ক্যাম্পটি। আমার ছয়তলার ড্রইং রুমে বসেই ক্যাম্পটি দেখা যায়।

সেখানে কিছু বাংলাদেশী শ্রমিক ছিল, যাদের বেশীরভাগই লেখাপড়া না জানা যুবক। এদেরকে নিয়ে ঐ ক্যাম্পেই একজন উৎসাহী বাংলাদেশী ছেলের রুমে খুলেছিলাম নাইট স্কুল। চব্বিশ ঘন্টায় আমার কাজ মাত্র আটটি ঘন্টা, এর পরে ফ্রি, কোন কাজ নেই। তদুপরি সপ্তাহে দু'টি দিন ছুটি। তাই সপ্তাহে চার থেকে পাঁচটি দিন ঐ ক্যাম্পে কয়েকজন বাংলাদেশী যুবককে অক্ষর জ্ঞান দেবার চেষ্টা করতাম।

www.pathagar.com

উদ্যোগটি দারুণভাবে সমাদৃত হয়েছিল ওদের মাঝে। যে সব ছেলেরা দেশে থাকতে লেখা পড়া করেনি বা করতে চায়নি কিংবা সেরকম কোন সুযোগই পায়নি, তারাই হামলে পড়ত এক থেকে দেড় ঘন্টা পড়ার জন্য, অক্ষর জ্ঞানটুকু পেতে।

আমার সাথে নিজ থেকে জুটেছিলেন ওদেরই সহকর্মী আরও এক বাংলাদেশী, পাবনার যুবক, মাদ্রাসায় দাখিল পাশ করে বিদেশে চলে এসেছেন। তার প্রস্তাবে এবং ছেলেদের উৎসাহে আরবী শেখার ব্যবস্থাও হলো। এক ঘন্টার স্কুল গিয়ে দাঁড়ালো আড়াই ঘন্টায়। নামাজও শেখানো শুরু হলো। এরা সেই ভোরে যায় আর ছয়টা'র দিকে ফিরেই গোছল নামাজ সেরে শুরু করে। আগ্রহের কমতি দেখিনি কখনই। প্রায় সাড়ে চারটি বসর চলেছে আমি ইংল্যণ্ড আসা পর্যন্ত।

সেই স্কুলেরই এক ছাত্র, বাড়ী ঢাকা'র দোহারে, তাকে নিয়েই ঘটনাটা। মাঝে মাঝে ঐ ক্যাম্পে আয়োজন করা হতো বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের। বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই তামিলরাসহ অন্যান্য ভারতীয়রা মিলে নাটক, সংগীত, ইন্ডিয়ান নাইট, এসব চটকদার নামে অনুষ্ঠানের আয়োজন করলে আমেরিকান ও ফরাসী সৈন্যরাও আসত সে অনুষ্ঠানে। একবার এরকমই এক অনুষ্ঠানে ক'জন মার্কিন সৈন্যও এসেছিল, যাদের মধ্যে ক'দিন আগে মুসলমান হয়েছেন, এমন একজনও ছিল।

নওমুসলিম সৈন্যটি অনুষ্ঠানে যোগ না দিয়ে ঘুরে দেখছেন ক্যাম্পের ভেতরটা। ক'জন বাংলাদেশী মুসলমান শ্রমিকও রয়েছে তার সাথে। সন্ধার পরে 'স্কুল 'শেষে' বেরিয়ে যাবার পথে ওদের সাথে দেখা হয়ে গেলে দু'মনিটি কথা বললাম, পরিচিত হলাম নওমুসলিম মার্কিন সৈন্যর সাথেও। যুবকটি আই পি সি'তে মুসলমান হয়েছেন (২০১০ সাল পর্যন্ত সেখানে প্রায় ষোল হাজার আমেরিকান, ফরাসী সৈনিক মুসলমান হয়েছে।) ক'দিন আগে ওমরাহ করে এসেছেন, এখন আই পি সি'তেই আরবি শিখছেন।

মনে হলো, ইচ্ছাকৃতই স্বধর্মী মুসলমান, যারা আই, ইউ, বাট, ইয়েস, নো, হৌয়াট, টুডে, টুমোরা, এরকম গুটিকতক শব্দ ছাড়া ইংরেজির কিছুই জানে না, তাদের সাথে সময় কাটাচ্ছেন কেবলমাত্র স্বধর্মীয় চেতনায়, নাচ গানের আসর এড়াতে। ইংরেজি আর আরবির সংমিশ্রণে অদ্ভুত জোড়াতালিতে চলছে কথা বার্তা। নওমুসলিম জেনে বাংলাদেশী যুবকদের আগ্রহটা যেন একটু বেশীই। সময়টা ভালই কাটছিল।

কিন্তু বিপত্তি বাধল যখন এক বাংলাদেশী যুবক, উক্ত মার্কিন নওমসুলিমকে প্রশ্ন করে বসল, সে নামাজ পড়ে কি না! আর যাবে কোথায়! ঐ একটা মাত্র প্রশ্নেই পরিস্থিতি

www.pathagar.com

পাল্টে গেল মহূর্তের মধ্যেই। নওমুসলিম তো রেগে লাল! কি বললে? আমি মুসলমান জেনেও আমাকে প্রশ্ন করছ, আমি নামাজ পড়ি কি না? তুমি কি আমার মুসলমানিত্ব নিয়ে সন্দেহ করছ? তিনি রাগে গর গর করছেন, আর বাংলাদেশী যুবকটা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়েছে, বুঝতেই পারছে না, তার দোষটা কোথায়?

সে কেবল জানতে চেয়েছে, ঐ মার্কিন মুসলমান নামাজ পড়ে কি না? আমার হস্ত ক্ষেপে পরিস্থিতি শান্ত হয়েছিল সেদিন। বাংলাদেশী যুবককে বুঝিয়েলাম 'একজন মুসলমান হিসেবে উক্ত মার্কিন যুবক জানেন, নামাজ না পড়ে কেউ কোনদিন মুসলমান থাকতে পারে না। তাকে মুসলমান হিসেবে জেনেও প্রশ্নটা করে মূলত সে সত্যিই মুসলমান কি না, সে প্রশ্নটাই তুলছেন আপনি, তাই সে এত রেগেছে'!

মার্কিন নওমুসলিমকেও বোঝালাম 'আসলে ছেলেটা তোমাকে অপমান করতে চায়নি, সেটা তার অভিপ্রায়ও নয়। সে যে পরিবেশ থেকে এসেছে, ইসলাম নিয়ে তার জ্ঞান ও ব্যক্তি জীবনে ইসলাম চর্চার যে মাত্রা, তাতে সে মনে করে, নামাজ না পড়েও মুসলমান থাকা যায়! নিজেকে মুসলমান বলে দাবী যে করে, সেই তো মুসলমান! ঈদে, পার্বণে, উৎসবে কিছু আচার আচরণ পালন, মিষ্টি খাওয়া আর খাওয়ানো'ই ইসলাম, এমন সীমাবদ্ধ বিশ্বাসের মুসলমান কোটি কোটি! তুমি দেখনি, মুসলমান হয়েছ, এখন দেখবে এরকম মুসলমানে বিশ্বটা সয়লাব!

কিছু মনে করো না, সে অজ্ঞতা থেকেই প্রশ্নটা করেছে। অপমান করা, কিংবা তোমার মুসলমানিত্ব নিয়ে প্রশ্ন তোলার জন্য নয়।' নওমুসলিম বিশ্বাসই করতে পারেন নি কথাগুলো। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে শুনেছেন! ভেবেছেন, এ কেমন কথা যে, নামাজ পড়বে না, ইসলাম জানবে না, অথচ মুসলমান! সমাজও তাকে মুসলমানই মানবে! ইসলাম কি এতই সহজ?

সেদিন এক রাশ বিস্ময় নিয়েই ক্যাম্প ত্যাগ করেছিলেন নওমুসলিম যুবকটা। আমিও বাসায় ফিরেছিলাম, মুসলমান হিসেবে একরাশ লজ্জা আর অনুশোচনা নিয়ে।

উনিশ

আজ আমার সামনে উপবিষ্ঠ এলভিনের মানসিক ও আচরণগত পরিবর্তনটাও চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছি। এর সাথে যখন আমার দেখা আশে পাশের মুসলমানদের চাল চলন, আচার আচরণ, ইসলামের বিধি বিধান, শিক্ষা আদর্শের প্রতি এদের

www.pathagar.com

সম্পর্ক, মানসিকতা এবং দৃষ্টিভংগী দেখি, তখন বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে পড়ি! হিসেব মেলে না কিছুতেই।

আল্লাহ, তাঁর রাসুল সাঃ এবং তাঁর সাহাবীদের প্রতি এদের কারো কারো মন্তব্য দেখে শুনে কখনও কখনও মনে প্রশ্ন জাগে, কোন মুল্য না দিয়ে, কোন ত্যাগ স্বীকার না করেই এরা মুসলমান, তাই কি এদের এই আচরণ? তাই কি এরা মুসলমান হয়েও রাসুলুল্লাহ সাঃ এঁর বিরুদ্ধে কথা বলে, সাহাবীদের গালাগাল করে, ইসলামি শরীয়াতের বৈধতা, উপযুক্ততা নিয়ে প্রশ্ন তোলে? এদের কি আদৌ কোন অধিকার আছে মুসলমান বলে দাবী করার? কিছুই যেন বুঝে উঠতে পারিনা, কেমন যেন গোলমাল হয়ে যায় সব।

চটকদার প্রলোভনে পড়ে মানুষ ভুল করতেই পারে, কিন্তু সেটা তো হয় কাজ কর্মের ক্ষেত্রে, কথা বার্তার ক্ষেত্রে। যেটাকে আমলে গলদ বা দুর্বলতা হিসেবেই জানি। এ দূর্বলতা নিয়েও মুসলমান থাকা যায় জানি, মানিও বটে। কিন্তু তাই বলে কেউ কি বিশ্বাসে বা আক্বিদ্বায় গলদ নিয়েও মুসলমান থাকতে পারে? এসবই ভাবছিলাম, এলভিনের কথাতেই সে ভাবনায় ছেদ পড়ল। তাঁকে বলতে শুনলাম 'আই এ্যম প্লানিং টু গো টু মাক্কা, টু পারফর্ম ওমরাহ '

সে ওমরাহ করতে যাবে, শুনলাম চুপচাপ। তাকে আরও একবার আলিঙ্গন করে বললাম 'আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ যাঁকে খুশি পথ দেখান, আমি খুবই খুশি তোমার এ পরিবর্তনের কারণে।'

'তোমাকে ধন্যবাদ জিয়া, তুমি যে ধৈর্যের সাথে আমার কাছে ইসলাম তুলে ধরেছ তার জন্য আমি তোমার কাছে.---।' তাকে থামিয়ে দিলাম, হয়ত আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন তিনি। বললাম;

'এলভিন অমন করে বলতে নেই, কেউ তোমাকে হেদায়েত দেননি এক আল্লাহ ছাড়া। হেদায়েতের এখতিয়ার আল্লাহ কারো সাথে শেয়ার করেননি। এমনকি তার প্রিয় রাসুলদের সাথেও না। এ ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহরই। সেই তিনিই বাছাই করেছেন তোমাকে ইসলামের জন্য। এর সকল কৃতিত্বটুকু একমাত্র আল্লাহরই, তার কাছেই কৃতজ্ঞ থাক। আমিও তার কাছেই কৃতজ্ঞ, আলহামদুলিল্লাহ।

মনে মনে তার স্ত্রীর কথা জানতে চাইছিলাম, সে ব্যাপারে প্রশ্ন করব কিন্তু তার আবেগ উচ্ছলতা এবং বিরতিহীন কথা বলায় সুযোগই পাচ্ছিলাম না। অবশ্য বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না, তিনি নিজ থেকেই সে প্রসঙ্গ তুললেন;

www.pathagar.com

'সকালে স্ত্রী কে জানিয়ে দিয়েছি আমার সিদ্ধান্তের কথা। সেও তার সিদ্ধান্তে অটল, একই কথা, মেনে নেবে না। আমারও করার কিছু নেই, বলেছি, তাকে আজও ভালোবাসী কিন্তু তার কারণে, আমার মেয়ের কারণে আমি মুসলমান হওয়া থেকে বিরত থাকতে পারি না। আজ যদি মরে যাই, তা হলে তো আমি মুসলমান না হয়েই মরলাম, এটা হতে পারে না।'

চমকে উঠলাম তার কথা শুনে! এ কথাটাই তো আল্লাহ কুরআনে মানুষের উদ্দেশ্যে বলেছেন 'ওয়ালা তামুতুন্না ইল্লা ওয়া আনতুম মুসলিমুন' অর্থাৎ: তোমরা মুসলমান না হয়ে মরো না। মাত্র ক'দিন কুরআন পড়েই এলভিন কথাটা বুঝতে পারলেও আমরা যারা কুরআন পড়ি বা পড়াই, শুনি বা শোনাই, খতমও দেই বা দেওয়ায়, তারা কেন সারা জীবনেও তা বুঝলাম না? চিন্তায় ছেদ পড়ল আবারও। এলভিন বলে চলেছেন;

'এ নিয়ে ভাবি না জিয়া, ধৈর্য ধরব। যাঁকে রব মেনেছি তিনি একটা ব্যবস্থা করবেনই। আর তিনি যা করবেন, ভালোর জন্যই করবেন। গতকাল পর্যন্ত আমার প্রচণ্ড অস্থিরতা ছিল, আজ নেই, পুরো মনটা জুড়ে রয়েছে গভীর প্রশান্তি। সব কিছুই আল্লাহ'তে সপেছি, তিনি ব্যবস্থা একটা করবেনই।'

গভীর প্রত্যয়দীপ্ত তার গলা। অবাক বিস্ময়ে দেখছি আর ভাবছি, মাত্র চব্বিশ ঘন্টায় একটা মানুষের কি গভীর পরিবর্তন হয়ে গেল! কাল যাকে দেখেছি বিধ্বস্ত, বিপর্যস্ত, আজ সেই তিনিই কথা বলছেন আল্লাহতে গভীর প্রত্যয় নিয়ে! আমার সামনেই পরিবর্তনগুলো সিনেমার সিকোয়েন্সের মতই ঘটে গেল আর আমি মুগ্ধ দর্শক সেজে তা দেখলাম! বিস্ময় যেন কাটছেই না! কেবল এতটুকু বলতে পারলাম 'তোমাকে স্বাগতম এ ভূবনে, ইসলামের পরিমণ্ডলে।'

বলার আর কিছু পেলাম না। এতদিন দু'জনে কথা বলেছি, তিনি প্রশ্ন করেছেন আমি সাধ্যমত জবাব দিয়েছি। আজ তিনি একাই বক্তা, আমি নীরব শ্রোতা মাত্র! তাঁকে বলতে শুনলাম ' জিয়া, টাকা কামাতে এসে এমন একটা কিছু পেয়ে গেলাম, যা বিশ্বের সকল কিছুর চেয়ে দামী, কোনদিন কল্পনাও করিনি।'

এলভিন একাই কথা বলছেন। আর আমি ভাবছিলাম, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ যার অন্তরকে ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দেন, তাকে এভাবেই দেন, আমরা তার সেই করুণাটুকুরই ভিখারী মাত্র। সেদিন ইংলিশ জেমা, কানাডিয়ান মেলেনি, ভারতীয় সুষমা, গ্রীক মারজুরী, মেক্সিকান সুজি, আর স্কটিশ নওমুসলিম ফারিহা, ছয়জন নারী মন্ত্রমুগ্ধের মত আমার কথাগুলো শুনেছিলেন।

www.pathagar.com

সেদিনকার সেই আড্ডার পরে সবাই উঠলেও মেলেনি জনসন বসে থেকেছেন অনেক্ষণ, নিশ্চুপ। মেয়েটা খুবই শান্ত ও ধীর স্থির। অন্য পাঁচজন পশ্চিমা নারীর মত না। জন্ম ও বেড়ে উঠা কানাডার ওন্টারিও'তে। ব্রিটেনে হলিডে কাটাতে এসে বসর তিনেকেরও বেশী এখানে চাকুরি করছেন। ফারিহার সাথে তার একটা চমৎকার ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠেছে।

ফারিহা সুন্দর করে হেজাবসহ ইসলামি পোষাকে আসতেন দেখেই কিনা জানি না, ইংলিশ নার্স জেমা, পোলিশ সহকারী নার্স ক্যাথরিণ, ভারতীয় নার্সিং এ্যাসিস্ট্যান্ট সুষমা দিক্ষিত, সবাই যেন এড়িয়ে চলত। ব্যতিক্রম ছিল কেবল কানাডার মেলেনি জনসন, জিম্বাবুই এর শ্যারণ, সাউথ আফ্রিকার ফ্রান্সিনা, এবং ফিলিপনিস এর পলা সালসেডো, এরা।

মেলেনি জনসন একদিন এলেন আমার অফিসে। আসেন প্রতিদিনই, কিন্তু সেদিন তিনি এলেন, তার আসাটা ছিল কেমন যেন 'অন্যরকম' আসা। সেদিন মাসিক ম্যানেজারস মিটিং' ছিল আঞ্চলিক পরিচালকের উপস্থিতিতে। প্রায় সারাটা দিন বৈঠক শেষে টেবিলের উপরে সেক্রেটারির রেখে যাওয়া এক গাদা মেইল আর ফাইলগুলো দেখছিলাম। মন বসাতে পারছি না ক্লান্তির কারণে।

অফিস থেকে বেরুব বেরুব করছি এমন সময় মেলেনি এলেন। আসার আগে সাধারণত একবার ফোন করে জেনে নেন আমি এখন ফ্রী কি না, কিংবা একটু সময় দিতে পারব কি না। কিন্তু সেদিন এলেন কোন খবর না দিয়ে, কোন ফোন না করেই। কাঁচের ভেতর দিয়ে তাকে দেখতে পেয়ে ইশারায় আসতে বললাম।

তিনি ধরে ঢুকলেন। কিন্তু কেমন যেন সংকোচ সংকোচ ভাব তার আচরণে। মেয়েটাকে দেখি আর অবাক হই, একবিংশ শতাব্দীর যুবতি, কানাডার মত পশ্চিমা দেশে ইংরেজ বাবা মা'র ঘরে জন্ম ও বেড়ে উঠা, অথচ আচার আচরণে সেই পশ্চিমা উদ্দামতা নেই। সব সময়ই নরম, ধীর স্থির! অনেকটাই এশিয়ান কোন রক্ষণশীল ফ্যামিলির মেয়ে যেন!

কেমন যেন একটা ধাঁধাঁয় পড়ে গেলাম। আমি তো উঠি উঠি করছিলাম বাসায় যাবার জন্য, আর এ সময়ে তিনি এসে যেন সব ওলট পালট করে দিলেন। জানতে চাইলাম কোন সমস্যা হয়েছে কি? আমি কি তার জন্য কিছু করতে পারি?

'হ্যাঁ, জিয়া, আমি তোমার একটু সাহায্য চাই।' বললেন। কি ধরনের সাহায্য চাও? জানতে চাইলাম।

www.pathagar.com

'আমি ব্রিটিশ কলাম্বীয়াতে চাকুরির একটা দরখাস্ত করেছিলাম, চাকুরিটা হয়েছে। আর আজই খবরটা পেলাম। অনেক দিন ধরেই দেশে ফেরত যাব ভাবছিলাম, এই সুযোগটা হাত ছাড়া করতে চাচ্ছি না। এ ব্যাপারেই তোমার সাহায্য চাই।' কথাগুলো বলে তিনি চেয়েই রইলেন। মেলেনি দেশে ফিরবেন এখানকার চাকুরি ছেড়ে, সেটা তার জন্য ভালো খবর। আমরা চাইব না তার মত নার্সকে হারাতে। ব্রিটেনে দক্ষ নার্সের যে কি অভাব, তা যারা কোন হাসপাতাল পরিচালনায় জড়িত, তারা জানেন।

কাউকে তো জোর করে ধরে রাখা যায় না। যেতে চাইলে তাকে ঠেকানো আমার অসাধ্য। জানতে চাইলাম 'তা তুমি আমাকে কি করতে বলো? যেতে চাইলে রেজিগনেশন নোটিশ দাও। আমরা তোমার শূন্য পোষ্ট পূরণের চেষ্টা করি এখন থেকেই।' এবারে তিনি আমতা আমতা শুরু করলেন। এতক্ষণে বুঝলাম ব্যাপারটা, তিনি নোটিশ পিরিয়ডের সময়কালটা সার্ভ করতে চাচ্ছেন না। তাতে তার নতুন চাকুরিতে জয়েন করতে দুই মাসের মত লাগবে। ততদিন হয়ত তারা অপেক্ষা করবে না। নার্সিং'এর ক্ষেত্রে প্রায়ই এমন হয়। নিয়োগকর্তারা দ্রুত তাদের নিয়োগকৃত নার্সকে জয়েন করানোর চেষ্টায় লেগে থাকে।

মেলেনি যা বললেন, তার মর্মার্থ, আমি যদি তাকে সপ্তাহ দু'য়ের মধ্যে ছেড়ে দেই, তা হলে খুবই ভালো হয়। যেহেতু হাসপাতালের ক্লিনিক্যাল দিকটি আমারই দায়িত্বে, আর তিনিও একজন ক্লিনিক্যাল স্টাফ, তাই তার বিশ্বাস, আমি ইচ্ছা করলেই তাঁকে এই সময়ের মধ্যে রিলিজ দিতে পারি, ম্যানেজার আটকাতে পারবে না। আর নতুন নিয়োগ কর্তার চাহিদা মত জব রেফারেন্সটা সময়মত এবং তার ব্যাপারে ভালো কমেন্টসহ দিলে তিনি কৃতজ্ঞ থাকবেন।

মেয়েটার দিকে তাকিয়ে রইলাম কিছুক্ষণ। মনে হলো সত্য বলছে। সে অত্যন্ত দক্ষ নার্স, ভালো মানুষও বটে। তাকে নিয়ে কোনদিন কোন ঝামেলা পোহাতে হয়নি। সপ্তাহ দু'য়েকের মধ্যেই রিলিজ দিলেও তেমন অসুবিধা হবে না, যদিও নিয়ম রেজিগনেশন দেবার দিন থেকে পুরো এক মাস কাজ করা।

তার অনুরোধ রেখে ঠিক দুই সপ্তাহ পরে রিলিজ দিয়েছিলাম। তার ব্যাপারে একটা চমৎকার জব রেফারেন্সও দিয়েছিলাম। তিনিও যথাসময়ে তার নতুন কাজে জয়েন করেছেন। যাবার আগে কয়েকবারই দেখা হয়েছে, শেষ দেখা করতে এসেছিলেন যাবার দিন সকালে। বিকেলে তার ফ্লাইট ছিল।

www.pathagar.com

আমি অফিসে ফারিহা ও তার মা'র সাথে কথা বলছিলাম। ফারিহার মা, মিসেস শীলা গ্রে এলে আমার সাথে দেখা না করে যেতেন না। আর বুড়ি একবার এসে বসলে অনেকক্ষণ কথা বলতেন, যেন অনেকদিন পরে একজন মনযোগী শ্রোতা পেয়েছেন। তার বাতের ব্যাথা কি ভাবে কষ্ট দিচ্ছে সে কথা থেকে শুরু করে স্বামী টমাস গ্রে'র সাথে কোথায় হলিডে কাটিয়েছেন, সে সব কথা তিনি বলবেনই।

আমি হুঁ হাঁ করে শুনি আর এরই ফাকে কম্পিউটর মনিটরে কিংবা সামনের ফাইলে নিজের কাজ চালিয়ে যাই। কাজের চাপ না থাকলে বুড়ির সাথে আলাপও জমাই। সেদিনও এরকমই সময় ও সুযোগ পেয়ে কথা হচ্ছিল। ফারিহা জানতে চেয়েছিলেন আমার লেখা লেখি, পড়াশোনা কেমন চলছে। তিনি জানতেন যে, আমি বই কিনি, বই সংগ্রহ করি। নতুন কোন বই কিনেছি কি না তাও জানতে চাইছিলেন।

ব্রিটেন বই পাঠকদের জন্য স্বর্গ। এখানে চ্যারিটি শপগুলোতে বিশ্বের সেরা সেরা বই সস্তা দামে পাওয়া যায়। সেগুলো নিয়মিত কিনি, সেটা তিনি জানেন, তাই প্রশ্ন করতেন নতুন কোন বই কিনলাম কি না, কিনে থাকলে কি বই কিনলাম? তিনিও মাঝে মধ্যে আমার জন্য বই ম্যাগাজিন আনতেন।

ফারিহার কাছে একদিন জানতে চেয়েছিলাম 'তুমি যে মুসলমান হলে, তোমার মা আর দু'বোনের রি-এ্যকশন কেমন?' জবাবে বলেছিলেন 'বিরুপ কোন রি-এ্যকশন নেই। বরং তারা খূশী। কারণ, তাদের দৃষ্টিতে অনেক শান্ত হয়ে গেছি, কোন উশৃংখলতার মধ্যে নেই।' ফারিহা কিছুক্ষণ থেমে আবার বললেন তারা খুশি আর আমিও ভীষণ সুখী।'

মাঝে মাঝে এই ফারিহা ক্ষোভ ঝাড়তেন বিভিন্ন মুসলিম নেতাদের নাম উচ্চারণ করে। সেদিনও মিশরের প্রধান মুফতীর উপরে ক্ষোভ ঝাড়লেন। বেশ দু'কথা বলে গেলেন গর গর করে। তার এই রাগ দেখে আমার হাসিপেল। পৃথিবীতে বোধ হয় সব মেয়েরাই এক। রেগে গেলে গর গর করতেই থাকে।

তার ক্ষোভের কারণটা জিজ্ঞেস করতে হয়নি। বিশ্বের অনেক মুসলমানের মনেই মিশরের প্রধান মুফতীর ভূমিকায় ক্ষোভ আর প্রশ্নের জন্ম হয়েছে, কারণ, তিনি ফরাসী সরকারের বোরকা নিষিদ্ধ করাকে সমর্থন দিয়ে ফ্রান্স ও ইউরোপ জুড়ে আন্দোলনরত মুসলমানদের সমালোচনা করেছেন। তার সেই সমালোচনা ইউরোপের প্রতিটি দেশের প্রধান প্রধান পত্র-পত্রিকা আর টিভি ফলাও করে প্রচার করছে। ফারিহা সে বিষয়েই তার ক্ষোভ ঝাড়লেন।

www.pathagar.com

একজন মুসলমান হিসেবে ক্ষোভ হবারই কথা। তাকে সান্তনা দিলাম, আশস্ত করলাম 'দুঃখ করো না, এর মধ্যেই দেখবে কোন না কোন কল্যাণ বেরিয়ে আসবে মুসলমানদের জন্য।' সেদিন অনেক কথাই বলেছিলাম, শান্তনার জন্য নয়, বরং বৈশ্বিক রাজনীতির বাস্তবতা আর অধূনা মুসলিম নেতৃত্বের বাস্তব চিত্র, এসব বিষয়ে সজাগ করতে।

কুড়ি

রাসুল (সঃ) গত হবার পর যে তিরিশ বসর খোলাফায়ে রাশেদার শাসন ব্যবস্থা চালু ছিল। সেই তিরিশ বসর মুসলিম উম্মাহর নিরুপদ্রব কাটেনি। তাঁর ওফাতের পরপরই কাফের ও মুনাফিক সম্প্রদায়দ্বয় যৌথ উদ্যোগ ও ষড়যন্ত্রে নবীন ইসলামি রাষ্ট্রটিকে সমূলে বিনাশ করতে উঠে পড়ে লাগে। তাছাড়া ঐ একই সময়কালে আভ্যন্তরীণ মতবিরোধও ছিল দুঃখজনকভাবে। যার মর্মান্তিক পরিণতিতেই হযরত ওসমান রাঃ, হযরত আলী রাঃ, হাসান রাঃ ও হযরত হোসেইন রাঃ এঁদের দুঃখজনক শাহাদতের ঘটনাগুলো ঘটে।

তথাপি উক্ত সময়কালেই, বিশেষ করে, হযরত আবু বকর এবং হযরত ওমর রাঃ এঁর প্রজ্ঞাপূর্ণ নেতৃত্বে ইসলাম একটি সুসংহত সামাজিক, রাষ্ট্রিয়, রাজনৈতিক ও আদর্শিক শক্তি হিসেবে বিশ্বে শক্ত ভিত্তিমূলে প্রতিষ্ঠিত হয়। এর পাশাপাশি এই সময়েই একটি আদর্শ হিসেবে ইসলাম ছড়িয়ে পড়ে দূর দূরান্তে।

একটি আদর্শ ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার যে ধারা স্বয়ং রাসুলুল্লাহ (সঃ) এঁর হাতে সূচিত হয়েছিল, তা পূর্ণ সফলতার দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়ায়। বিশেষ করে, ইসলামের রাজনৈতিক ও সামাজিক দিকটি এই সময়কালেই পূর্ণতা পায়। ইসলামি শিক্ষাব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক অবকাঠামো, ইসলামি বিচার ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য ও প্রতিরক্ষা, ভূমিজরিপ ও বন্টন ব্যবস্থা, রাজস্ব আদায়, সংরক্ষণ ও ব্যয়ের রীতি নীতি, বাজার নিয়ন্ত্রণ, বিপনন এবং ইসলামি অর্থব্যবস্থা পূর্ণরুপে বিকশিত হতে থাকে প্রিয় রাসুলুল্লাহ (সঃ) এঁর শিক্ষা ও আদর্শকে ভিত্তি করে। ইসলামের ইতিহাসে এসবই হলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও ঘটনাবহুল বিবর্তন এবং ক্রমধারা।

বিবর্তনগুলো কেবলমাত্র ইসলামি সভ্যতার জন্যই নয় বরং পুরো মানব সভ্যতার জন্যই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সুদুরপ্রসারী। এসবের পেছনে সাধারণ মুসলমানের চেয়ে রাসুলুল্লাহ (সঃ) এঁর মহান সাহাবা (রাঃ) 'গণ এবং তৎকালীন উম্মাহ'র্ আলেমা ওলামা'দের ভূমিকাই ছিল প্রধানতম।

www.pathagar.com

এর পরে উমাইয়া ও আব্বাসীয় খেলাফত, স্পেনে পাঁচশত বসরের ইসলামি শাসন, মিশরে ফাতেমী খেলাফত, সাত শত বসরের ওসমানীয় খেলাফত, ভারতবর্ষে মুসলিম শাসন, এসবই ঘটনাবহুল অধ্যায় ইসলাম ও মুসলমানদের জীবনে। এর মধ্যে সাফল্যের ইতিহাস যেমন আছে, তেমনি আছে নানান ব্যর্থতার করুণ কাহিনীও। ত্যাগের মহিমায় ভাস্বর ঘটনা যেমন আছে, তেমনি আছে ভোগের লালসায় কলংকিত লজ্জাজনক অধ্যায়। বীরোচিত ঘটনার পাশাপাশি কাপুরুষোচিত ন্যক্কারজনক ঘটনাও আছে।

বিশ্ব ইতিহাসে মাত্র দেড় হাজার বসর বয়সী মুসলিম উম্মাহর জীবন অত্যন্ত ঘটনাবহুল ও তাৎপর্যপূর্ণ এবং পুরো মানব সম্প্রদায়ের উপরে প্রভাব বিস্তারকারী। কারণও আছে। প্রধান কারণ হলো, বিশ্বের তাবৎ শক্তি কখনই একক বা সম্মিলিতভাবে মুসলমানদের উপস্থিতি সহজে ও নিরুপদ্রবে মেনে নিতে চায়নি। অস্তিত্বের এই সংঘাত ইসলাম আবির্ভাবের প্রথম দিনটি থেকেই নিরবিচ্ছিন্নভাবে চালু আছে।

কারণ, ইসলাম কখনই তার আদর্শ থেকে এক চুল পরিমানও সরে আসেনি, সে আপোস করেনি আদর্শের ক্ষেত্রে। ইসলাম তার অনুসারীদের বেলাতেও কোন রকম বিচ্যুতিকে বিন্দুমাত্র মেনে নেয়নি, নিতে চায়নি। এ কারণেই সংঘাত চলে আসছে, আজও চলছে এবং আগামিতেও চলবে। আজ স্যামুয়েল হান্টিংটনই নন, বরং অনেক পশ্চিমা বুদ্ধিজীবি এটাকেই 'সভ্যতার সংঘাত' বলে চালিয়ে দিচ্ছেন।

কিছুদিন আগে টনি ব্লেয়ার লন্ডনের 'ক্যানারি ওয়ার্ফ' এ ২০০৬ এর মার্চে (যতদুর মনে পড়ে) এক অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে তথাকথিত বৈশ্বিক সন্ত্রাসবাদ নির্মূলে আফগানিস্থান ও ইরাকে আমেরিকা ব্রিটেনের আগ্রাসন'কে তাদের গৃহিত সঠিক স্বিদ্ধান্ত বলে চালিয়ে দিতে গিয়ে বলেছিলেন, বিশ্বজুড়ে এই যুদ্ধ 'সভ্যতা নিয়ে সংঘাত'। (সুত্রঃ দি ডেইলি মেট্রো, মার্চ ২২, ২০০৬, পৃষ্ঠা-৪)।

খৃষ্টবিশ্বাসে বিশ্বাসী হান্টিংটন কিংবা টনি ব্লেয়ার, অথবা ওরকম আরও কেউ, যাই বলুন না কেন, মুসলমান হিসেবে আমরা ভালো করেই জানি, আসলে এটা হলো সত্য আর মিথ্যার চিরন্তন দ্বন্দ। হক ও বাতিলের সংঘাত। যার সূচনা হয়েছে বিশ্বের মানুষ বসবাসের সময়কাল হতে, আর তা নিরবিচ্ছিন্নভাবে চলবে শেষ দিন পর্যন্ত।

এ সংঘাতে জড়িত পক্ষদ্বয়ই তাদের ভূমিকা অনুযায়ী প্রতিদান পাবে কেয়ামতের মাঠে, জবাবদিহি ও হিসেব নিকেশ শেষে। এটাও জানি, মুসলিম হোক বা অমুসলিম হোক, সত্য-মিথ্যার এই চলমান সংঘাতে মিথ্যার পক্ষালম্বনকারী প্রত্যেকে নিজেদের চেষ্টা ও

www.pathagar.com

শ্রম দিয়ে যে প্রচেষ্টা চালিয়েছে, তারা সেদিনটাতেই উপলব্ধি করবে, তারা প্রকৃত অর্থেই মিথ্যার পক্ষাবলম্বন করেছিল। এই উপলব্ধিটা সন্দেহাতীতভাবেই তাদের কাছে ধরা দেবে কেয়ামতের মাঠে।

সেদিন উপলব্ধির সাথে প্রতিফল হিসেবে প্রাপ্য চিরন্তন আজাবের সম্মুখিন হয়েই বাদানূবাদে লিপ্ত হবে। তবে সেদিনকার সেই বাদানূবাদ হবে তাদের নিজেদের মধ্যেই। এই অনুতাপ-অনুশোচনা, বিলাপ আর রোদন কোনটাই সেদিনকার অপমান, জিল্লতি, শাস্তি কোনটাই লাঘব করবে না। তারা এবং তারা যাদের অনুসরণ করেছে, সেসব নেতা নেত্রীরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ অপরাধের মাত্রা ও ব্যাপকতা অনুযায়ি শাস্তি ভোগ করবে।

এর বিপরীতে সেদিন সত্যপন্থী অর্থাৎ সংঘাতের দ্বিতীয় পক্ষের চিত্র হবে ভিন্নরকম। প্রথম পক্ষের যে চিত্র, তার উল্টো। সত্যপথে আহ্বানকারী, সুপারিশকারী, চলাচলকারী, নেতৃত্বদানকারী নেতৃবৃন্দ, (আলেম ওলামা-মাশায়েখ, রাজনৈতিক সামাজিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক নেতৃবৃন্দ, শিল্পী লেখক সাহিত্যিক বাগ্মী) নিজ নিজ কৃতকর্মের প্রতিদানতো পাবেনই, এর পাশাপাশি যোগ হবে তাদের আহ্বানে সৎকর্ম সম্পাদনকারী কর্মী, আবার তাদের পরবর্তী প্রজন্ম, এভাবে প্রতিটি সৎকর্ম সম্পাদনকারীর কৃত সকল সৎকর্মের প্রতিদান। যদিও কোন পর্যায়েই কোন আমলকারীদের নিজস্ব হিস্যা হতে কমতি করা হবে না।

এই জন্যই কেয়ামতের মাঠে কোন্ কোন ভাগ্যবান মুসলমান হাতে আমলনামা পেয়ে বিস্ময়ে অবাক হবেন! তারা বিশ্বাসই করতে পারবেন না যে, আমলনামাটি তার। আমলনামায় সৎকর্মের দীর্ঘ ফিরিস্তি দেখে ভেবে অবাক হবেন যে, এত সৎ কাজ আমি করলাম কবে? এটা আমার আমলনামা নয়! কিন্তু প্রকৃত ব্যপার হলো, আমলনামাটি তারই।

দয়াময় আল্লাহ এ ব্যক্তির আমলনামায় সেসব সৎ কর্মের পুরস্কারও যোগ করেছেন, যেগুলো এ ব্যক্তির কথা, কাজ, আহ্বান, নির্দেশ, বক্তব্য, লেখনী ও যুক্তির প্রভাবে তাদের নিষ্ঠাবান কর্মী, সেইসব কর্মীদের অনুসারী, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশীরাও সম্পাদন করেছে! কুরআন ও হাদিসের সচেতন পাঠকই তা জানেন। এ চেতনাই ইসলামের ইতিহাসে দাওয়াতি কার্যক্রম, ধর্ম প্রচার, সৎ কাজের আদেশ, উপদেশ, উৎসাহ, পৃষ্ঠপোষকতা প্রদানে মূল ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করেছে। এক্ষেত্রে আপোষহীন ভূমিকা পালন করেছেন উম্মাহর আলেম, ওলামারা।

www.pathagar.com

এ কারণেই আলেম ওলামারা সাধারণ মুসলমানের কাছে অনুসরণীয়, অনুকরণীয়। এ কারণেই তাঁদের এত মর্যাদা, এত ইজ্জত। আল্লাহর রাসুল (সাঃ) স্বয়ং আলেম ওলামাদের সম্মানিত করেছেন, বলেছেন, আলেমগণ হলেন নবী, রসূলদের ওয়ারিস বা উত্তরাধিকারী! আর আল্লাহপাকও কুরআনে ওলামাদের সম্মান বৃদ্ধির কথা, উচ্চতর মর্যাদার কথা বলেছেন।

মুসলিম উম্মাহর যে কোন ক্রান্তিলগ্নে সমকালীন সমাজের আলেম ওলামাগণ যে বিস্ময়কর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন, তা স্বল্প পরিসরে আলোচনা অসম্ভব। আব্বাসীয় কিংবা উমাইয়া, ফাতেমী কিংবা মূর, মোগল কিংবা ওসমানীয়, যে কোন মুসলিম শাসনের কথাই আলোচনায় আন, যে কোন ইতিহাসই ঘাঁট, দেখবে সেইসব শাসনকালে রাজা বাদশাহ, আমীর ওমরাহ বা তাদের আশীর্বাদপুষ্ঠ ব্যক্তি বা গোষ্ঠির যে কোন অনৈসলামিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সবার আগে যিনি রুখে উঠেছেন, তিনি একজন আলেম।

ফকিরের মত জীবন যাপনকারী আলেম-ওলামারা প্রবল প্রতাপশালী রাজা, বাদশাহ, তাদের ক্ষমতা আর প্রভাব, অর্থ-বিত্ত, সৈন্য-সামন্ত কোনটারই তোয়াক্কা করেননি। সমকালীন সাধারণ মুসলমানরাও এইসব আলেম ওলামাদের অনুসরণ করে রাজা বাদশাহ, তাদের সৈন্য সামন্ত'র বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন, জীবন দিয়েছেন হাসিমুখে! আলেমরাই সাধারণ মুসলিম উম্মাহর সম্মুখে নির্দেশনা তুলে ধরেছেন, রাজা বাদশাহর কোন সিদ্ধান্তটিকে মেনে নিতে হবে, আর কোনটিকে করতে হবে অমান্য।

আজ এ যুগেও জীবন, সমাজসংশ্লিষ্ঠ যে কোন সমস্যার সমাধানে উম্মাহ আলেম ওলামাদের দিকেই চেয়ে থাকে। এ প্রবণতা নতুন নয় বরং যুগের ধারাবাহিকতা মাত্র। স্মরণ কর, বাদশাহ আকবর ও বাদশাহ জাহাঙ্গীরের অনৈসলামিক কর্মকাণ্ড প্রতিরোধে মুজদ্দেদ আলফেসানী (রহঃ)'র ভূমিকা। ব্রিটিশ শাসনে মুসলমানদের ঘোর দূর্দিনে মাওলানা আশারফ আলী থানভী, মাওলানা ইলিয়াস, মওলানা মওদুদি, জামালুদ্দীন আফগানী, স্পেনে বিভ্রান্ত শাসকদের আল্লামা কুরতূবী (রহঃ), আব্বাসীয় খেলাফতে কতিপয় অর্বাচীন শাসকের স্বেচ্ছাচারীতার বিপরীতে ইমাম আবু হানিফা, ওসমানীয় যুগের শেষ প্রান্তে নুরউদ্দীন তূরসী, এঁদের ভূমিকার প্রতি একবার চোখ বুলিয়ে দেখ।

ইসলামের মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখতে, অনৈসলামিক কর্মকাণ্ড রুখতে তাঁদের ত্যাগ তিতীক্ষা, নিষ্ঠা, সাধারণ মুসলমান জনগোষ্ঠির অকুণ্ঠ ও অকৃত্রিম সমর্থনের প্রেক্ষিতে এসব ফকিরবেশী দরবেশদের বিপরিতে তৎকালীন ক্ষমতাদর্পী প্রতাপশালী রাজন্যবর্গ কি ভাবে পিছু হটেছে, সে ইতিহাস দেখ। এসব আলেমরাই যুগে যুগে মুসলমান

www.pathagar.com

জনগোষ্ঠিকে ইসলামের পক্ষে, অন্যায় ও বাতিলের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়েছেন। ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে সামনের সারীতে নেতৃত্ব দিয়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়েও ইসলামকে টিকিয়ে রেখেছেন।

আজ সমগ্র বিশ্বব্যাপী বৈজ্ঞানিক জাহেলিয়াতের যুগে মুসলিম উম্মাহ যখন একের পর এক আক্রমণের শিকার, তাদের না আছে কেন্দ্রীয় ঐক্য, আর না আন্তর্জাতিক প্লাটফরম, যেখানে দাঁড়িয়ে তার বক্তব্য বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরবে। এ উম্মাহ ইতিহাসে কখনই এতটা অসহায় হয়ে দিন কাটায়নি। এতটা অনিশ্চিত সময়ের মুখোমুখি হয়নি।

অতিসম্প্রতি তারা আঘাত হেনেছে ইসলামের মৌলিক ফরজ হিজাব, তথা কুরআনের উপরেই! হিজাব নিষিদ্ধ করা হয়েছে রাষ্ট্রীয়ভাবে গণতন্ত্রের অন্যতম সূতিকাগার বলে পরিচিত উন্নত (!) দেশ ফ্রান্স, বেলজিয়াম'সহ ইউরোপের বেশ ক'টি দেশে! বিশ্ব মোড়ল আমেরিকার তত্তাবধানে এবং অর্থায়নে ছাপা হয়েছে 'ফুরকানুল হাক্ব' নামে নকল কুরআন! দেদারসে বিলি করা হচ্ছে মুসলিম দেশ সমূহে!

বিগত শতাব্দীর পুরোটা সময়কাল চালু ছিল ইসলাম ও মুসলমানদের উপরে আক্রমণ। এ আক্রমণের বিরোধিতায় ঈমানের বলে দীপ্ত কিন্তু বৈষয়িক শক্তিতে দূর্বল আলেম-ওলামা ও সাধারণ জনগণ জীবন দিয়েছেন, তবু পিছপা হননি, পিছুটান দেননি কোনভাবেই!

বর্তমান শতাব্দীর শুরুতে এসেই অধুনা সভ্যবিশ্বের নাকের ডগায় পূনরায় ইসলামের মৌলিক বিধানের উপরে আঘাত হচ্ছে। এর প্রতিবাদে সাধারণ মুসলমানগণ যখন ঘৃণা ও ক্ষোভে, প্রতিবাদে রুখে দাঁড়িয়েছেন, ঠিক তখন বিশ্বস্বীকৃত আলেম মিশরীয় প্রধান মূফতি, আল আজহারের চেয়ারম্যান শেখ মুহাম্মদ সাঈদ তানতাউঈ এবং তার নিয়োগদাতা মিশরীয় প্রেসিডেন্ট মুবারক দু'জনেই ফরাসি সরকারের হিজাব নিষিদ্ধকরণের সমর্থনে প্রতিবাদরত মুসলমানদের সমালোচনা করেছেন।

তাদের এই ভূমিকায় ফরাসী সরকার দারুণ উল্লসিত হয়ে নিজের দেশে তো বটেই, এমনকি বিশ্বের সকল দেশের প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় তা বার বার প্রচারও করেছে। তা হলে বোঝ, জাহেলিয়াতের কোন পর্যায়ে আমরা আজ দাঁড়িয়েছি! বিগত ক'বসর ধরে দেখছি যখনই ফিলিস্তিনে ইন্তিফাদার জোয়ার মিশরীয় জনগণের মধ্যে লাগে, তখনই কায়রোয় মিশরের 'আল আহ্লী' আর 'জামালেক' এর মধ্যে আয়োজিত

www.pathagar.com

হয় ফুটবল টুর্নামেন্ট। ফুটবল পাগল মিশরীয়রা ছোটে ষ্টেডিয়ামে, আর ইন্তিফাদা ওঠে শিকোয়!

আবার কখনো বা আন্তঃআফ্রিকীয় ফুটবল টুর্নামেন্ট, নাট্য প্রতিযোগিতা, ফিল্ম ফেষ্টিভেল, নৃত্য প্রতিযোগীতা, চিত্র প্রদর্শনী, অথবা মিশরীয় শিল্পী আমর দিয়াব, সামীরা সাঈদ, মুহাম্মদ মুনির, হানি শাকের'দের সঙ্গীতানুষ্ঠান, কিংবা প্রখ্যাত অভিনেতা আদেল ইমাম, নুর শরীফ'দের লাইভ অনুষ্ঠান বা পরলোকগত আহাম্মদ ইয়াসিনের কৌতুকাভিনয় কিংবা রাতভর উম্মে কুলসুমের গান আর নাইল স্যাটেলাইট চ্যানেলে অশ্লীল নৃত্য ও ছবির আয়োজন।

ক'বসর আগে যখন ফিলিস্তিনে ইন্তিফাদা তুঙ্গে, নৃশংস হত্যাকান্ড চলছিল ইসরাইলিদের দ্বারা, ঠিক তখনই ফাষ্টলেডী সুসান মুবারকের তত্ত্বাবধানে আয়োজিত হলো আন্তর্জাতিক ফিল্ম ফেষ্টিভেল। ভারত হতে আমন্ত্রিত অমিতাভ বচ্চন ও জয়াপ্রদা ছুটে গেলেন সেখানে। নারী পুরুষ, ছাত্র যুবকের ঢল নামল তারকা দর্শনে। আর সারা মিশর জুড়ে ফিলিস্তিনিদের সমর্থনে গড়ে ওঠা আন্দোলন হাওয়ায় উবে গেল!

একত্রে এক যুগ বসবাসের সুবাদে ঘনিষ্ঠ মিশরীয় বন্ধুদের দেখেছি ছুটিতে দেশে যাবার আগে মুখের দাঁড়ি কেটে ফেলে 'ক্লিন শেভ্ড' হতে! অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ মিশরীয় যুবক আশরাফ মাগরেবি এক যুগ আমার সহকর্মী ছিলেন, চারটি বসর আমার সাথে একই ফ্লাটে বাস করেছেন। তিনি দেশে যাবার আগে মুখের দাঁড়ি কেটে ফেলেছিলেন। কৌতুহল বশত কারণটা জানতে চাইলে, ছল ছল দু'চোখে বাকরুদ্ধ আশরাফ জবাব দিয়েছিলেন 'এ্যহ্না আয়েশীন মাআয়া'আল ফিরআউন' অর্থাৎ আমরা ফেরআউনের সাথে বসবাস করছি!

বর্তমান মিশর হলো সেই দেশ, যেখানে মুসলমানরা রাসুল (সঃ) এঁর নির্দেশ, তার সুন্নাত পালন করতে পারে না ঘোষিত বা অঘোষিত রাষ্ট্রীয় বিধি বিধানের কারণে! যেখানে হাজার হাজার ইখওয়ান কর্মী মুবারকের তিন দশক শাসনামলে নিহত বা নিখোজ হয়েছেন, লক্ষ লক্ষ মুসলিম যুবক পঙ্গু গোয়েন্দাদের নির্যাতনে, ঘন ঘন মসজিদে নামাজে যাবার অপরাধে (!)। এসব দেখেশুনেও তানতাওয়ী সাহেব কোনদিন তার নিয়োগকর্তা মুবারকের বিরোধিতা করেন নি ঘুণাক্ষরেও!

সেই তিনিই আগ বাড়িয়ে ফরাসি সরকারের হিজাব বন্ধে সমর্থন দিয়ে প্রতিবাদকারী মুসলমানদের সমালোচনা করেছেন! প্রেসিডেন্ট মুবারকও তার প্রিয় মুফতিকে সমর্থন দিয়েছেন। আর উল্লসিত ফ্রান্স, ব্রিটেনসহ বিশ্বের পত্র-পত্রিকা, মিডিয়া তাদের এই

www.pathagar.com

সমালোচনাকে ফলাও করে প্রচারও করেছে! ভেবেছিলাম 'ও আই সি' প্রতিবাদ করবে। কিন্তু হায়! তখন প্রতিষ্ঠানটির মহাসচিব ছিলেন মুবারকের অতি প্রিয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী আমর মুসা।

এই কুটনীতিবীদের কাছে আরব জাতীয়তাবাদ গুরুত্বপূর্ণ হলেও ইসলামি জাতীয়তাবাদের ধারণা একেবারেই অপাংক্তেয়, অনুল্লেখ্য, গুরুত্বহীন বিষয়! অতএব তার নেতৃত্বে 'ও আই সি' সে পথে এগুবে না, তা নিশ্চিত করেই বলতে পারি। আর আরব দেশের শেখরাতো আছে শাদ্দাদের বেহেশতী আয়েশে মগ্ন! তাদের দিকে চেয়ে লাভ নেই! আজ পুরো মুসলিম বিশ্ব নেতৃত্বহীন, নির্দেশনাহীন, পথহারা, পরিত্যক্ত একটি উম্মাহ। পথ দেখানোর যেন কেউ নেই, যেন চারিদিকেই শুধু নিকষ কালো আঁধার !

একুশ

এ পর্যায়েই মেলেনি প্রবেশ করলেন। আজ তিনি এসেছেন সাধারণ পোষাকে। এক এক করে সবার সাথে দেখা করে সবশেষে এলেন আমার রুমে। দরজার কাছে দাঁড়াতে দেখেই হাতের ইশারায় রুমে ঢুকতে বললাম। তিনি রুমে ঢুকেই ফারিহার গালে গাল রেখে চুমু খেলেন। বিষয়টার প্রতি হঠাৎ করেই যেন নজর পড়ল। ফারিহার সাথে তার সাবলীল হৃদ্যতাটা দেখে ভালো লাগল। তিনি চেয়ার ফারিহার পাশেই বসলেন। আমি ফারিহার দিকে তাকিয়ে পূর্বের আলোচনায় ফিরে গেলাম;

'সত্যিই অবাক হই যখন দেখি, একটা সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগোষ্ঠির দেশেও ইসলাম পালন করা বা তার কথা বলা কিংবা তার দাওয়াত দেয়া যায় না। সেখানে কমিউনিষ্ট দর্শনের দাওয়াত দেয়া যাবে, সেটা 'প্রগতিবাদীতা'! সেখানে অঞ্চল বা ভাষা ভিত্তিক জাতিয়তাবাদের দাওয়াত দেয়া যাবে, তা খাঁটি 'দেশ প্রেম'! নাস্তিকতার কথা বললে তারা হবে 'উদারপন্থী'! ইসলামের বিরোধিতা করা, তার সংস্কারের কথা বলা যাবে, কুরআনের ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতার (নাউজুবিল্লাহ) কথা বলা যাবে, তারা হবে 'মুক্তমনা'! কেবলমাত্র কুরআনের কথা বলা যাবে না। মুসলমানদের দেশে বলা যাবে না প্রিয় রাসুল সাঃ এঁর আনুগত্যের কথা!

www.pathagar.com

অথচ সেসব দেশে কোন জেমা রিচার্ডসন, কিংবা মেলেনি জনসন, ক্যাথরীণ দ্যবরোস্কা বা মারজুরী কণ্ডাকোস, সুজি গুজম্যান কিংবা পলা সালসেডো, ফিওনা থোমাস, কিংবা শ্যারণ কাশুন্ডি বা ফ্রানসিনা'র মত অমুসলিমদের কাছে নয়, বরং ইসলামের কথা তুলে ধরা হয় সেই তাদের কাছে, যারা আল্লাহ চেনে, কুরআন বোঝে, তা পড়ে, পড়ায়। তেলওয়াত করে, করায়। যারা নিজেদের মুসলমান বলে জাহির করে, সদর্পে দাবীও করে!

ইসলামের কথা বলা হয় তাদের কাছে, যারা রাসুল সাঃ কে জানে, চেনে। এটাও জানে যে, সৎকর্ম সম্পাদনকারী যেমন প্রতিদান পাবে, তেমনি প্রতিদান পাবে তাতে সহযোগিতাকারীও। চিত্রটা খুবই দুঃখজনক, মুসলমান হিসেবে লজ্জারও। মুসলমানদের দেশেই ইসলাম প্রতিরোধের সম্মুখিন হলে অবাক হতেই হয়। অথচ এরা কুরআন পড়েন, তেলওয়াতও করেন, খতম করেন, খতম করানও। কুরআন পাঠক, তার ধারকদের এ আচরণ কুরআনেই বর্ণীত একটা ঘটনা ও তার শিক্ষার সাথে পুরোপুরি সাংঘর্ষিক।

রসুল (সঃ)-এর প্রেরণের পূর্বে বর্তমান সিরিয়া কিংবা ফিলিস্তিনের এক জনপদে প্রেরিত হয়েছিলেন তিনজন নবী। জনপদের অধিবাসীদের কাছে প্রথমে দু'জন নবী প্রেরিত হয়ে ইসলামের ডাক দিলে তারা সে ডাক প্রত্যাখ্যান করে। তারা উক্ত দুই নবীকেই তাদের দেশের সকল সমস্যার কারণ বলে চিহ্নিত করে এবং তাঁদের বিরুদ্ধে সম্ভাব্য সকল অপপ্রচারের মাধ্যমে স্থানীয় জনগণকে ক্ষেপিয়ে তুলতে থাকে।

এমতাবস্থায় আল্লাহ পাক উক্ত দু'জন নবীকে সাহায্যের জন্য আরও একজন নবীকে ঐ জনপদে ইসলামের দাওয়াত তুলে ধরার জন্য পাঠান। এভাবেই তিন জন নবী একত্রে ঐ জনপদে সত্য আর সুন্দরের দাওয়াত দেয়া সত্তেও জনপদের লোকজন হঠকারীতায় অটল থাকে। হাতে গোণা গুটি কতক বিবেকবান ছাড়া পুরো জনপদই নবীদের দাওয়াতকে অস্বীকার করে সত্যপন্থীদের বিরুদ্ধে সম্ভাব্য সকল অপপ্রচার বজায় রাখে। যত প্রকার শারিরীক ও মানসিক নির্যাতন সম্ভব ছিল, তা-ও তারা করে যেতে থাকে।

এরকম প্রেক্ষাপটে একদিন উক্ত তিন নবী একদল লোকের সামনে তাঁদের দাওয়াত উপস্থাপন করলে লোকজন তাদের দাওয়াতকে অস্বীকার করে সেই সম্মানিত নবীরাই যে তাদের দেশে সকল বিভক্তি আর অশান্তি, অনগ্রসরতা, পশ্চাৎপদতার জন্য দায়ী, উন্নতী আর প্রগতির পথে একমাত্র অন্তরায় অভিযুক্ত করতে থাকে।

www.pathagar.com

ঠিক এসময় একজন ছুতার, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রভাব, প্রতিপত্তি বিবেচনায় অতি নগণ্য ব্যক্তি, নাম হাবিব নাজ্জার, সমাজপতীদের সামনে এসে তাদের হঠকারীতার জবাবে যুক্তি উপস্থাপন করে বলে 'এঁরাতো আমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাইছেন না বরং একান্তই নিঃস্বার্থভাবে আমাদেরকে সত্য আর সুন্দরের দিকে আহ্বান জানাচ্ছেন। আপনারা এঁদের কথা শুনুন।' কুরআন কি ভাবে সে চিত্র তুলে ধরেছে তা জানতে সুরা ইয়াসিনের কুড়ি নম্বর আয়াতটি দেখতে পার, সেখানে বলা হচ্ছে;

'অতঃপর শহরের প্রান্তভাগ থেকে এক ব্যক্তি দৌড়ে এলো। সে বলল, হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা রাসুল গণের অনুসরণ কর। অনুসরণ করো তাঁদের, যাঁরা তোমাদের কাছে কোন বিনিময় কামনা করেন না, অথচ তাঁরা সুপথপ্রাপ্ত'। নিজ সম্প্রদায়ের লোকদের প্রতি তার যুক্তিপূর্ণ আবেদন 'আমরা কেন ভেবে দেখব না? কেন সেই আহ্বানের প্রতি কর্ণপাতটুকু না করে উল্টো সেইসব নিঃস্বার্থ লোকদেরকেই দোষারোপ করব? আর আমি-ই বা কেন সেই আল্লাহর প্রতি ঈমান পোষণ করব না, যাঁর কাছেই আমাদেরকে ফিরে যেতেই হবে?'

নেতাদের মুখের উপরে সামান্য (?) এক ছুতারের এইসব কর্থা বার্তা, যুক্তি ভালো লাগল না। তারা ক্ষেপে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল সকলে মিলে হাবিব নাজ্জারের উপরে। যার যা ছিল, লগী, বৈঠা, বাঁশ কিংবা খেজুর ডাল, পাদুকা, যাদের তাও ছিল না, তারা চালাল কিল, ঘুঁষি, লাথি। এভাবে হাবিব নাজ্জারকে মারতে মারতে মেরেই ফেলল!! এর পরেই ঘটল আসল ঘটনা। মারা যাবার সাথে সাথে তার সামনে খুলে গেল সফলতার স্বর্ণদূয়ার। যিনি ইসলামের জন্য কিছুই করতে পারেননি ঈমান আনা ছাড়া, পারেননি মসজিদ বা খানক্বাহ বা ইসলামিক ফাউন্ডেশন বানাতে, পারেননি হজ্জ করতে, যাকাত দিতে। তিনিই সফলতা পেলেন!

তিনি পারেন নি গরীব দুঃখীদের পূনর্বাসন করতে, পারেননি ত্যাগের কোন নজরাণা দেখাতে। কেবলমাত্র ইসলামের আহ্বান মেনে নিয়ে, এর দাওয়াত উপস্থাপনকারীদের প্রতি একটু মৌখিক সমর্থন দেখানো ছাড়া আর কিছুই তিনি পারেন নি। সেই লোকটিকেই বলা হলো 'ক্বিলাদ্বখূলীল জান্নাহ' অর্থাৎ 'তাকে বলা হলো, জান্নাতে প্রবেশ করো।' মৃত্যুর সাথে সাথে তাকে নেয়া হলো জান্নাতে!

এই সামান্য (!) কাজটুক'র বিনিময়ে জান্নাত পেয়ে হাবিব নাজ্জার খূশীতে গদ গদ হয়ে স্বগোতোক্তি করে উঠলেন। কুরআনই আমাদের বলে দেয় সে উক্তিটি কি ছিল? কুরআনের ভাষায় 'সে বলল, হায় আমার জাতি যদি কোনক্রমে জানতে পারত যে,

www.pathagar.com

আমার প্রভূ আমাকে ক্ষমা করেছেন, আর আমাকে সম্মানিতদের অন্তর্ভূক্ত করেছেন (সুরা ইয়াসিন, ২৬-২৭)

এই যে চেতনা, সত্য আর মিথ্যার চিরন্তন দ্বন্দে কোন না কোন পক্ষে নিজের আন্তরিক সমর্থনটুকু ঢেলে দেয়া, সেটা সহজ নয়। এর জন্য প্রয়োজন সত্যকে মানার মত সাহস। প্রয়োজন নিজের দল বা নেতা-নেত্রীর আনুগত্য ছেড়ে একমাত্র সত্যের আনুগত্য করার মানসিক দৃড়তা। এটাই ঈমানের পূর্ব শর্ত। এ সাহস আর দৃড়তা ছাড়া ইমান লাভ হয় না, ঈমানদার থাকাও যায় না।

হক্বের সাথে বাতিলের, সত্যের সাথে মিথ্যার দ্বন্দে যারা নিরপেক্ষতার ভান করে বসে থাকেন, তাদের ঈমান কোন পর্যায়ে, তারা ইসলামের দৃষ্টিতে কোন স্তরের, সেটা হজরত আলীর শাসনামলে একটা ঘটনা থেকেই বোঝা যেতে পারে।

এক ব্যক্তি কোন এক আক্রোশে হাতে উদ্যত তরবারীসহ অপর এক ব্যক্তিকে হত্যা করতে তেড়ে যাচ্ছে, আক্রান্ত ব্যক্তি নিজের প্রাণ বাঁচাতে দৌড়ে অনতিদুরে দাঁড়িয়ে আলাপরত দুই ব্যক্তির আড়ালে নিজেকে লুকোনোর চেষ্টা করল। তার পরেও ঘাতক তেড়ে গিয়ে অনায়াসেই উক্ত হতভাগাকে হত্যা করে ফেলল। তবে দাঁড়িয়ে আলাপরত দু'ব্যক্তির একজন ঘাতককে জাপটে ধরে কাবু করে ফেলেছে ততক্ষণে।

ঘটনার বিচার গেল আদালতে। মদীনার কাজী পুরো ঘটনার সুক্ষ বিশ্লেষণ শেষে সাজা ঘোষণা করলেন। ঘাতককে দিলেন মৃত্যুদন্ড। আর নিরপেক্ষ (?) দাঁড়িয়ে থাকা দুই সাক্ষীকেও ছাড়লেন না। দিলেন কঠিন সাজা। যে ব্যক্তি ঘাতককে জাপটে ধরে নাগরিক দায়িত্ব পালন করেছে, বিচারক তাকে দিলেন যাবজ্জীবন কারাদন্ড। কারণ, উক্ত ব্যক্তি তার নাগরিক দায়িত্ব পালন করেছে ঘাতক হত্যাকান্ডটি সংঘটিত করার পরে আগে নয়। আগে পালন করলে নিহত এবং ঘাতক, দু'জনের জীবনই বাঁচত।

তারা তা করেনি। যে ব্যক্তি সমাজে থেকেও যথাসময়ে তার নাগরিক কর্তব্যটুকু পালন করে না, সমাজে তার মুক্তাবস্থায় থেকে লাভ কি? এই বিবেচনায়ই তাকে যাবজ্জীবন কারাদন্ড প্রদান করা হয়েছে। আর অপর ব্যক্তি, যে কোন ভূমিকাই পালন করেনি বরং নিরপেক্ষ(!) থেকেছে, বিচারক তাকেও কঠোর সাজা প্রদান করেন রায়ে, তিনি উক্ত নিরপেক্ষ(!) ব্যক্তির চোখ দুটো উপড়ে ফেলার আদেশ দেন! সমাজে সংঘটিত অন্যায়, অবিচার দেখে না, প্রতিরোধে কোন ভূমিকা রাখে না যে লোক, তার চোখ সমাজের কোন কাজে লাগবে? এমন ব্যক্তির চোখ থাকা বা না থাকায় সমাজের কি লাভ?

www.pathagar.com

ইউসুফ (আ:) কে কেনানের বাজারে তোলা হয়েছে নিলামে বিক্রির জন্য। তাকে কেনার জন্য মন্ত্রী, উজির, নাযীর, আর বণীকের মত ধনাঢ্য লোকজন জড়ো হয়েছে। এদেরই পাশে কেনানের জনপদে ভিক্ষা করে নিজের খাবার জোগাড় করেন, এমন বুড়িও হাজির হয়েছেন! স্বর্ণমুদ্রা নয়, রৌপ্য মুদ্রাও নয়, হাতে একটা পয়সা মাত্র, তাও ভিক্ষা করেই পাওয়া। বুড়ি তা নিয়েই মন্ত্রী মিনিষ্টার, ধনীক, বণীকদের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন, তিনিও নিলাম ডাকবেন!

ইউসুফ (আ:) কে নিলামে ক্রয়কারীদের মধ্যে উপস্থিত গণ্যমান্য ধনকুবেরদের পাশে ভিখারিণী বুড়িকেও হাজির দেখে, এবং তিনিও ইউসুফ (আঃ)কে কিনতে চান, বুঝতে পেরে উপস্থিত সকলেরই সীমাহীন কৌতুহল! কেউ কেউ বুড়িকে লক্ষ্য করে দু'একটা কৌতুক করতেও পিছপা হয়নি। বুড়ি সব নীরবে সহ্য করলেও একবার কেবল কটাক্ষের জবাবে বললেন 'বাবা, তোমরা জানো, আমিতো ভিখারিণী, কোন সাধ্য নেই তোমাদের সাথে পাল্লা দিয়ে ইউসুফকে কেনার।

'তার পরেও পয়সাটা নিয়ে তোমাদের পাশে দাঁড়িয়েছি ইউসুফকে কিনে মুক্ত করার জন্য! জানি, তাঁকে কেনার সামর্থ আমার নাই। অর্থও নাই। কিন্তু কেয়ামতের মাঠে আল্লাহর সামনে যখন দাঁড়াবো, তখন একথাটা তো বলতে পারব 'হে আল্লাহ, আমার কোন সামর্থ ছিল না, তবে যেটুকু সামর্থই দিয়েছিলে, সেটুকুই সম্বল করে তোমার ইউসুফকে মুক্ত করতে দাঁড়িয়েছিলাম। হে আল্লাহ, ইউসুফ'কে যাঁরা মুক্ত করতে তৎপর ছিল, আমিও তাঁদেরই দলে ছিলাম, আল্লাহ, আজ আমাকে সেই প্রচেষ্টার কারণেই ক্ষমা করে দাও প্রভূ'

পর পর তিনটা ঘটনা বললাম কুরআন ও ইতিহাস থেকে। সত্য ও সুন্দরের পক্ষে একজন মানুষের ভূমিকা কি হওয়া দরকার তা বোঝাতে। পক্ষ, বিপক্ষ, আর নিরপেক্ষতা নিয়ে যারা নিত্যই সমস্যায় ভোগেন, যাঁরা সবকিছুতেই 'নিরপেক্ষতা' নামক শয়তানের অব্যর্থ বর্মের আড়ালে লুকিয়ে নিস্পৃহতা, নিস্কৃয়তার অনুকুলে যুক্তি খোঁজে, পরিতৃপ্ত থাকে, তাদের জন্য নিশ্চিতভাবেই শিক্ষণীয় ম্যসেজ আছে ঘটনাগুলোতে। কেউ কেউ এ থেকে শিক্ষা নিতেও পারে, সেই আশায়।

ইসলামের দৃষ্টিতে একজন নাগরিকের নাগরিক দায়িত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সে নাগরিকদের উপরে বাড়তি কোন দায়িত্ব চাপায় না। যে সমাজে সে বাস করবে, সেই সমাজে সে নিজেতো কোন অনাচার করবেই না, বরং কেউ অনাচার সৃষ্টি করতে পারে, এমন যে কোন কর্মকান্ডের বিরুদ্ধে সে রুখে দাঁড়াবে, ঐক্যবদ্ধ, সংঘবদ্ধ ভাবে। নিজেকে 'নিরপেক্ষতা' নামক নিস্কৃয়তার আড়ালে লুকিয়ে রাখবে না। এটা একটা

www.pathagar.com

স্বাভাবিক, স্বতস্বিদ্ধ, মানবিক বিষয়টাকে যে কোন বিচারেই যুক্তিযুক্ত মনে হতে বাধ্য। সম্ভবত এ জন্যই আল্লাহ কুরআনে সামাজিক অনাচার সৃষ্টি করাকে হত্যার চেয়েও গুরুতর অপরাধ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

যাহোক, আজকের বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে তোমার নিজের ভূমিকা কি হওয়া উচিৎ? সে প্রশ্নের উত্তর চাও, তবে খুব একটা গবেষণা করতে হবে না, ঐ তিনটা ঘটনার মধ্যেই রয়েছে তা। কথায় বলে 'আক্কেলমন্দ কি লিয়ে ইশারাই কাফী! সে কথা যদি বোঝেন প্রাচীন যুগের ছুতার হাবিব নাজ্জার, কপর্দকশূন্য বুড়ি। তা হলে আমাদের আলোকিত সমাজের রথী, মহারথীরা কেন তা বুঝবেন না? কেনই বা বা বুঝলেন না শেখ তানতাওয়ী?

আমার কথা শেষ করতেই মেলেনি বলে উঠলেন 'একটা সত্যি কথা বলি জিয়া, তোমার আলোচনাগুলো কিন্তু খুব মিস করব, খুব ভালো লাগত আমার এসব কথা বার্তা শুনতে। বুঝি কম, সেটা ঠিক, তবে শুনে আনন্দ পাই' বলেই তাকালেন ফারিহার দিকে। ফারিহাও তার দিকে তাকিয়ে হাসলেন এবং বলে উঠলেন 'আমি জিয়ার কথা মন দিয়ে শুনি এই কারণে যে, ও নিজেদের সমালোচনা করে কথা বলে, এটাই আমার ভালো লাগে।'

মেলেনির দিকে চেয়ে মনটা খারাপ হয়ে গেল। আজ যেন প্রথমবারের মত ওর জন্য মায়া অনুভব করলাম : তিনি কখনও কোন আলোচনার মধ্যে বাধ সাধেননি। এমনকি আমার ভূলে কখনও তাদের পশ্চিমা সভ্যতা ও দর্শনের বিরুদ্ধে কিছু বলা হয়ে গেলেও কথার মাঝখানে বাধ না সেধে চুপ চাপ শুনে যেতেন মনযোগের সাথে।

মনে আছে একবার লাঞ্চব্রেকে স্টাফ রুমে কি এক কথা প্রসঙ্গে জেমা বলেছিলেন পুরো ইউরোপ তার স্বকীয়তা হারাচ্ছে, ব্রিটেনও তার আসল পরিচয় থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। পোলিশ নার্স ক্যাথরিণ দ্যবরোস্কা সে বিষয়টি নিয়ে বিরতিহীন বলে চলেছেন। বারান্দা দিয়ে যেতে আসতে কয়েকবারই শুনে একবার ঢুকে পড়লাম। এক কাপ কফি বানিয়ে তাতে চুমুক দিতে দিতেই ওদের কথা শুনছি। বার বার আমার দিকে জেমা আর মেলেনি তাকাচ্ছেন। তারা ধরেই নিয়েছেন আমি কিছু বলব। বললামও;

'যাচ্ছেইতো। যাচ্ছে বলেই যে তোমরা কোনদিন ভারতীয় খাবার মুখেও,তোলনি, সেই তোমরাই আজ ইন্ডিয়ান টেকওয়ে বা বাংলাদেশী হোটেল থেকে কাবাব, চিকেন বা মাটন্ বিরিয়ানি আনিয়ে খাও। সেটা তো তোমরা নিজের ইচ্ছাতেই কর, কেউ তো তোমদের বাধ্য করে না। এক শতাব্দী আগে তোমাদের খাদ্য তালিকায় এগুলো ছিল

www.pathagar.com

না। একশ বৎসরের ব্যবধানে পরিবর্তনটুকু হয়েছে। একশত বসর আগে তোমাদের দেশে এত কালো মানুষ ছিল? তখন কি রাস্তা ঘাটে এদের দেখা যেত? অথচ এখন যত্রতত্র তাদের উপস্থিতি লক্ষণীয়। এই যে পরিবর্তন, সেটা কে তো ঠেকানো যাবে না।

বাইশ

'না, আমি সেসবের কথা বলছি না।' জেমা বলে উঠলেন। সে যে সে সবের কথা বলছে না, তা আমিও জানি। কিন্তু উপস্থিত সকলের সামনে তার চেহারাটা আরও একবার উন্মোচনের জন্যই এতক্ষণ ঘুরিয়ে কথা গুলো বলছিলাম। আসল কথায় আসিনি।

আসল কথা হলো, ব্রিটেনের সর্বস্তরে মুসলমানদের সরব উপস্থিতির কথা বোঝাচ্ছে। তার মনে একটা অস্বস্তি আছে আজ, কারণ, এখানে চারজন নতুন কর্মচারী নিয়োগ হয়েছে, এদের দু'জনই মুসলমান। তারা ইন্টারভিউতে অংশ নিয়ে প্রতিযোগিতায় টিকেই নির্বাচিত হয়েছে। একজন ঘানা'র, আর একজন লাইবেরীয়। তারা এদেশেই লেখা পড়া করেছে। সম্ভবত এ ঘটনাই জেমা, ক্যাথরিনকে আহত করে থাকবে, তারা তা মুখে প্রকাশ করতে পারছে না, আবার বুকের জ্বালাটুকু'ও গোপন করতে পারছে না।

জেমা বলতে চাইছে, ব্রিটেনসহ পুরো ইউরোপে মুসলমানদের সংখ্যাবৃদ্ধির কথা। সবখানেই তাদের উপস্থিতি! সেটাই তাকে পীড়া দেয়। তদূপরি ক'দিন আগে রোজার শুরুতে প্রধানমন্ত্রী গর্ডন ব্রাউন মুসলমানদের রমজানের শুভেচ্ছা জানিয়ে বাণী দিয়েছেন, যা ব্রিটেনের রেডিও টিভিতে প্রচারিত হয়েছে।

অনেক দিন থেকেই একটা সুযোগ খুঁজছিলাম জেমা আর ক্যাথরিনকে একটা মোক্ষম জবাব দেবার। আজ এ দু'জনই নয়, এর সাথে ভারতীয় সুষমা ও কানাডিয়ান মেলানি জনসনকেও পেয়ে গেলাম। আর সকলেই একত্রে একই সাথে ব্রেক এ, এতবড় সুযোগ আবার কবে পাব? ভেবে জেমার দিকে তাকিয়ে বললাম 'তুমি কি শুনতে চাও আগামি পঞ্চাশ বসরে তোমাদের এই দেশ, এই ইউরোপ কি রকম পরিবর্তনের সম্মুখিন হবে? যদি চাও, তবে আমি তথ্য দিয়ে সে বিষয়টি তুলে ধরতে পারি।'

www.pathagar.com

কেউ কোন কথা না বললেও পোলিশ ক্যাথরিণ একটা চেয়ার ঠেলে দিল, যেন বসতে বলছে। আমি যখনই কোন আলোচনা করি, তা কোন তথ্যকে ভিত্তি করেই করি। যখনই কোন তথ্য তুলে ধরি, সাথে সাথে সম্ভবমত যুক্তিও দেই, সেটা এরা জানে। এতে লাভ হলো, শ্রোতা যতই বিরুদ্ধবাদী হোক, মেনে নেয়া ছাড়া বা তর্ক পরিহার করা ছাড়া আর কোন পথ থাকে না। এভাবে বিতর্কও এড়ানো যায়। এরকমই কিছু তথ্যসহ একরকম প্রস্তুতই ছিলাম একটা সুযোগের অপেক্ষায়। আজ সম্ভবত সেরকমই সুযোগ করে দিল এরা। চেয়ারটায় বসতে বসতে বললাম;

আজ থেকে শতাব্দী আগে তোমাদের শ্রদ্ধাভাজন একজন, যাঁকে কেবল তোমরাই নও, বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ শ্রদ্ধাভরেই স্মরণ করে, সেই দার্শনিক, সাহিত্যিক আর চিন্তাবীদ জর্জ বার্নাড 'শ তার উপলব্ধী থেকে এই ইংল্যণ্ড এবং পুরো ইউরোপ নিয়েই ভবিষ্যৎবানী করে বলেছেন " I have prophesied about the faith of **MUHAMMAD** that it would be acceptable to the Europe of tomorrow as it is beginning to be acceptable to the Europe of today." অর্থাৎ: আমি মুহাম্মদের ধর্মের ব্যাপারে ভবিষ্যৎবাণী করছি, আজ এটা যেমন ইউরোপের কাছে গ্রহণযোগ্য হতে শুরু করেছে, আগামী দিনের ইউরোপের কাছেও তা গ্রহণযোগ্য হবে।"

তিনি আরও বলেছেন "If any religion had the chance of ruling over England, nay Europe within the next hundred years, it could be Islam. (Sir George Bernard Shaw in 'The Genuine Islam,' Vol. 1, No. 8, 1936. অর্থাৎ: 'আগামী একশত বসরের মধ্যে কেবল ইংল্যণ্ডই নয়, বরং পূরো ইউরোপকে শাসন করার মত কোন ধর্ম যদি থাকে, তবে সেটা ইসলাম।'

সভ্যতা গড়েই ওঠে মানুষকে ঘিরে, কোন মানব গোষ্ঠিকে বাদ দিয়ে কোন সভ্যতা গড়ে ওঠেনি আর না তা কখনও গড়ে ওঠতে পারে। একটা সভ্যতা কিভাবে গড়ে ওঠে, কেন তা স্থায়ী হয়, কেনই বা তা ভেঙ্গে পড়ে, কোন কোন ত্রুটিতে সভ্যতার বিলুপ্তি ঘটে? এর আগের বিশ্বসভ্যতাগুলো, যেমন ধর, রোমান, গ্রীক, আর্য ও পারস্য সভ্যতা, এসব কেন, কি ভাবে এবং কোন ত্রুটির কারণে ভেঙ্গে পড়েছে, তা নিয়ে বিশদ আলোচনাসহ আমার লেখা বই আছে আমার মাতৃভাষায়, প্রায় দশ বসর আগে প্রকাশিত হয়েছে। (ইসলাম: সভ্যতার শেষ ঠিকানা।)

www.pathagar.com

সে দিকে যাব না। সংক্ষেপে তোমাদের দেশ আর সমাজের কথা বলব। মুসলমানদের সমাজ আর দর্শনের কথা নয়। জন্মহার একটা নির্দিষ্ট সংখ্যার নীচে নামলে সভ্যতা আর বিকশিত হয় না। গবেষকরা দেখেছেন, সে জন্মহারটি হলো পরিবার প্রতি ২.১১ জন। ইতিহাসে কোন সভ্যতা পরিবার প্রতি ১.৯ জন্মহার নিয়ে বিকশিত হয়েছে, সে প্রমাণ নেই। আর জন্মহার কমতে কমতে যখন ১.৩ জনে ঠেকে, তখন সে সভ্যতার টিকে থাকাটা অসম্ভব কারণ, এরকম সভ্যতায় এ জন্মহার নিয়ে প্রতিটি নারী পুরুষকে গড়ে ৮০ থেকে ১০০ বসর পর্যন্ত প্রজননক্ষম হতে হবে সভ্যতাকে টিকিয়ে রাখতে হলে, যেটা সম্ভবপর নয়।

অতএব তাকে বিলীন হতেই হবে। তোমাদের সভ্যতা আজ এই অসম্ভবের মুখোমুখি, বাঁচার পথ নেই। এ পরিণতি তোমাদেরই তৈরী, তোমাদের জীবনাচারই দায়ী। কাকে দোষ দেবে? কাকে দায়ী করবে? ব্রিটেনে পরিবারপ্রতি জন্মহার হল ১.৬ জন মাত্র। বিলুপ্তির হার ২.১১ এর নীচে, টিকে থাকবে কী ভাবে? এখানে তোমরা যে ক'জন আছ, তার মধ্যে এক সুষমা ছাড়া কারোরই সংসার নেই, সন্তান নেই। 'পার্টনার' আছে! উদাহারণতো তোমরা নিজেরাই!

অথচ দেখ, তোমাদের আশে পাশে যেসব দেশী-বিদেশী মুসলমান আছে তাদের প্রত্যেকেরই সংসার আছে, দু'চারজন সন্তানও আছে। তাদের জন্মহার পরিবারপ্রতি গড়ে ৪.৬ জন। ফলে তারা বাড়ছে সংখ্যায়। তারা বাড়ছে মানে মুসলমান বাড়ছে, তাদের সংস্কৃতি বাড়ছে। বাজারে হালাল খাবারের দোকান বাড়ছে, রাস্তায় ইসলামি পোষাকে মুসলিম নারী পুরুষ দেখছ। ভাষা, কৃষ্টি, আর শিক্ষা, সংস্কৃতিতে তার প্রভাব দেখছ। তিরিশ বসর আগে ব্রিটেনে মুসলমান ছিল ৮২০০০ (বিরাশি হাজার)। তিরিশ বসর পরে ২০১০ সালে সে সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৫০০০০০ (পচিশ লক্ষ)তে।

অর্থাৎ গত তিরিশ বসরে মুসলমান বেড়েছে তিরিশ গুণেরও বেশী! সারা ব্রিটেনে মসজিদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৩০০ তে! এর কি কোনই প্রভাব পড়বে না সমাজে? একবার কেবল ভাবো ফারিহার কথা। তিনি তোমাদেরই একজন। ক'দিন আগেও তিনিও পাব বা পানশালায় গিয়ে এক পাইন্ট ড্রিংকস্ নিয়ে বসেছেন, তোমাদের মত তাঁরও বয়ফ্রেন্ড ছিল, তিনিও শর্ট স্কার্ট পরে উদোম মাথায় ঘুরেছেন।

আজ তিনি ওসব ছেড়েছেন, তোমাদের সামনেই চলাফেরা করেন, তোমাদেরই একজন, কিন্তু তার আর তোমাদের চলা ফেরার মধ্যে আকাশ পাতাল ব্যবধান। সেই একই মানুষ, কিন্তু তার ভেতরের দর্শন বিশ্বাস, চিন্তা-চেতনায় পরিবর্তনের কারণে তার পোষাক বদলেছে, চাল চলনও বদলেছে। বদলেছে পুরো জীবনাচার। তিনি এখন

www.pathagar.com

আর সেই আগের মত পাইন্টের পর পাইন্ট ড্রিংকস্ এর অর্ডার দেন না, পানশালাতে যান না, নাইট ক্লাবেও নয়। তিনি তোমাদের একজন হয়েও ভিন্ন। এ ভিন্নতা চোখের সামনেই দেখছ।

এটাই পরিবর্তন। সমাজ পরিবর্তন হচ্ছে, ব্রিটেন বদলাচ্ছে, বদলাচ্ছে ইউরোপ! আর তাই তোমাদের কাছে 'কেমন যেন' লাগছে। সেই 'কেমন যেন' লাগার কারণেই এত কথা! এত সমালোচনা! তাতে লাভ হবে না। কারণ পরিবর্তনটা কেবল তোমাদের দেশেই নয়, পুরো বিশ্বেই চলছে। পরিবর্তনটা আঞ্চলিক নয়, বৈশ্বিক। ক্ষয়ীষ্ণু নয়, বর্ধিষ্ণু। আগে ছিল নীরবে, তাই বোঝা যায় নি। কিন্তু এখন তা এতটা গতিসম্পন্ন যে, কারো নজরই এড়ায় না। ঘরে বসেও টের পাওয়া যায় !

ফ্রান্সে তো এক বিপ্লবই ঘটে যাচ্ছে। ফ্রান্সের অবিসংবাদিত নেতা, যাঁকে ফরাসীরা একরকম পুজা করে তাদের জাতীয় বীর বলে, সেই নেপোলিয়ান বোনাপোর্ট কুরআনের শিক্ষার উপর ভিত্তি করে এক বৈশ্বিক ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছিলেন, সেই ১৯১৪ সালে ফ্রান্সে এক সমাবেশে বলেছিলেন "I hope the time is not far off when I shall be able to unite all the wise and educated men of all the countries and establish a uniform regime based on the principles of Qur'an which alone are true and which alone can lead men to happiness (Quoted in CHRISTIAN CHERFILS' BONAPARTE ET ISLAM (PARIS 1914) "

ভাবানূবাদঃ 'আশা হয়, সময়টা দূরে নয়, যখন বিশ্বের সকল দেশের জ্ঞানী গুণীদের সমন্বয়ে কুরআনের শিক্ষা-আদর্শ, যা খাঁটি সত্য এবং বিশ্বমানবতাকে সুখ, সমৃদ্ধির পথ দেখাতে পারে, তার উপরে ভিত্তি করে একটা সমাজ গড়ে তুলতে পারব।' তার সে আশাবাদ পূর্ণ হয়নি। ওয়াটারলুর যুদ্ধে শোচনীয় পরিণতিতেই তার ভাগ্যের ফয়সালা হয়ে গেছে।

কিন্তু ফ্রান্সের ভাগ্যলীপি কোন পথে যাচ্ছে, সে প্রশ্ন এখন মানুষের মুখে মুখে ফিরছে। যাঁরা আশাপশের খবর রাখেন, তারা নিশ্চিত জানছেন ফ্রান্সের মনজিল কোন দিকে। হিজাব ব্যান করে সে পথকে রোখা যাবে না! সে এখন ইসলামের পথে ঝড়ের গতীতে ধেয়ে চলেছে। ফ্রান্সে যেখানে মূল ফরাসি পরিবারপ্রতি জন্মহার ১.৮ জন ৪ সেখানে মুসলিম পরিবারগুলোয় এ হার অবিশ্বাস্য, গড়ে ৮.১ জন! আরও রয়েছে

www.pathagar.com

ক্রমবর্ধমান ধর্মান্তরিত হবার ঘটনা। সরকারি হিসেবে একমাত্র ২০০৯ সালেই সত্তর হাজার ফরাসী খৃষ্টান ইসলাম গ্রহণ করেছে!

দক্ষিণ ফ্রান্স একসময় ছিল বিশ্বের সর্বাধিক গীর্জার এলাকা, কিন্ত আজ সেখানে মসজিদের সংখ্যা বেশী। সেখানে কুড়ি বসরের নীচে জনগোষ্ঠির শতকরা ৩০ ভাগই মুসলমান। নিস, মার্সেই ও প্যারিস শহরে এ হার শতকরা ৪৫ জন। সাম্প্রতিক হিসেবে ২০২৭ সালে ফ্রান্সে মোট জনসংখ্যার প্রতি চারজনের একজন হবে মুসলমান। অর্থাৎ শতকরা ২৫ ভাগই হবে মুসলমান। অর্থাৎ ১৫ বসর পরে সিকিভাগ ফরাসী নাগরিক হবে মুসলমান। এদের মধ্যে উল্লেখিত জন্মহার বজায় থাকলে ২০ থেকে ২৫ বৎসরেই ফ্রান্সে অর্ধেকেরও বেশী হবে মুসলমান।

অর্থাৎ ২০৫০ সাল নাগাদ ফ্রান্স হবে মুসলমান প্রধান দেশ। সে তখনও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রই থাকবে তাই না? সেদিন গণতান্ত্রিক ধারায় নির্বাচনে যখন মুসলিম মেজরিটি জনগোষ্ঠি তাদের মতাদর্শানুযায়ী আইন কানুন পরিবর্তন করবে, তখন কিভাবে তা ঠেকাবে? তখনও কি ফ্রান্স সরকার 'ফরাসী ভেল্যু'র সাথে সাংঘর্ষিক' বলে হিজাব নিষিদ্ধ করার ক্ষমতা রাখবে? সে সাহস দেখাবে? অতএব অপেক্ষা কর, আর মাত্র দুই বা তিনটি দশক, তার পরেই দেখবে ফ্রান্স একটি ইসলামি রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্বকে নিজেদের অবস্থান জানান দেবে! আজকের পরিবর্তনটা ঠিক সে কথাটাই জানান দিচ্ছে।

তোমাদের আর এক প্রতিবেশী জার্মানি, তার অবস্থাও ভিন্ন কিছু নয়। সেখানে পরিবারপ্রতি জন্মহার ১.৩ জন মাত্র। একটা সভ্যতাকে টিকে থাকতে হলে প্রয়োজনীয় সর্বনিম্ন জন্ম হার পরিবারপ্রতি ২.১১ জন, তার চেয়ে খুবই কম। আর তাই জার্মানিতে পরিবর্তনের ধারা এমন একটা পর্যায়ে এসেছে যে, তাকে ঠেকানোর কোন সুযোগই নেই। জার্মানির সরকারতো স্বীকারই করতে বাধ্য হয়েছে যে, বর্তমানে জার্মানীর জন্মহারের যে ক্রমাবনতি, তাকে রুখে দেয়া সম্ভব নয়। সরকার নিজেই স্বীকার করছে, ২০৫০ সালে জার্মানী হবে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ।

তখনও কী জার্মানীর আদালতে বোরকা পরে বিচার প্রার্থি মুসলিম নারীকে কেউ ছুরিতে হত্যা করতে পারবে? পারবে কী সরকার সে ক্ষেত্রে নীরব দর্শক সেজে বসে থাকতে? তখনও তো জার্মানি গণতান্ত্রিক দেশ থাকবে! আর সেই 'গণতান্ত্রিক' 'পশ্চিমা' দেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানরা যখন শরীয়া আঈনের পক্ষে ভোট তখন কী বলে তাদের রুখবে? তোমাদের আশে পাশে দেশগুলোর চিত্র খেয়াল কর, দেখবে একই পরিবর্তন সবখানে। তোমাদের পশ্চিমা খৃষ্টবাদী সমাজটা পরিবর্তিত

www.pathagar.com

হচ্ছে একটা ইসলামি সমাজে। আর তা হচ্ছে তোমাদের নাকের ডগায়, চোখের সামনেই!

জানো, ১৯৯০ এর পর ইউরোপজুড়ে যত জনস্যংখা বৃদ্ধি পেয়েছে তার শতকরা ৯০ ভাগই মুসলমান। ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের এক হিসেবে বর্তমানে পুরো ইউরোপে মোট সোয়া পাঁচ কোটি মুসলমানের বাস। আর ২০২৮ সাল নাগাদ পুরো ইউরোপ ব্যাপি মুসলমানের সংখ্যা গিয়ে দাঁড়াবে দশ কোটির বেশী!

গ্রীসে জন্মহার ১.৩ জন। ইটালিতে ১.২ জান মাত্র। স্পেনে পরিবারপ্রতি মাত্র ১.১ জন! আর পুরো ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের ৩১ টি দেশের গড় হার ১.৩৮ জন মাত্র। ইতিহাসের কোন পর্যায়েই এ জন্মহার নিয়ে কোন সমাজ, সভ্যতা টিকে থাকতে পারেনি। অতএব খৃষ্টসভ্যতা, ইউরোপিয়ান সমাজ বিলীন হওয়াটা সময়ের ব্যপার মাত্র! 'বিলীন' মানে কোন সমাজই থাকবে না, তা নয়, বরং এ সমাজ পরিবর্তিত হয়ে হবে মুসলিম সমাজ। আর ইউরোপের আগামি পরিচিতি হবে 'ইসলামিক ইউরোপ' বলে!

নেদারল্যাণ্ডসে বর্তমানে যত নবজাতক জন্মে, তার অর্ধেকই মুসলিম দম্পতির সন্তান, মুসলিম শিশু। আগামি ১৫ বসরের মধ্যে নেদারল্যণ্ডসের অর্ধেক জনসংখ্যা হবে মুসলমান। এটা আমার নয়, বরং নেদারল্যাণ্ডস সরকারের নিজস্ব পরিসংখ্যান! ক'দিন আগে বেলজিয়ামও বোরকা নিষিদ্ধ করেছে। তাতে কি সেখানে মুসলমান বৃদ্ধির হার কমাতে পারবে? সেখানে মোট জনসংখার শতকরা পচিশ জনই মুসলমান। বর্তমানে জন্ম নেয়া প্রতি একশত শিশুর মধ্যে পঞ্চাশ জনই হলো মুসলিম বাবা মা'র মুসলিম সন্তান।

এটা আমার মনগড়া হিসাব না, বরং বেলজিয়াম সরকারের স্বাস্থ্যদপ্তরের তথ্য আর পরিসংখ্যানই তা বলছে। সরকারের হিসাব অনুযায়ী আগামি ২০২৫ নাগাদ বেলজিয়ামে মুসলিম জনসংখা দাড়াবে দেশের মোট জনসংখার এক তৃতীয়াংশ। শতকরা তেত্রিশ জন এ। এটা সরকারের রক্ষণশীল হিসাব। প্রকৃতপক্ষে এ হার শতকরা চল্লিশজনে দাঁড়াবে। এক তৃতিয়াংশ মুসলমান নিয়ে পরবর্তি সিকি শতাব্দীতে বেলজিয়ামের সমাজব্যবস্থায় কি প্রভাব পড়বে, আর তার চিত্রই বা কি হবে, তা একটু চিন্তা করলেই পেয়ে যাবে।

২০৫০ সাল নাগাদ বেলজিয়ামের সংখাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠি হবে মুসলমান। তখনও কি সে দেশের সরকার হিজাব অবৈধ করে রাখতে পারবে? পারবে কি মসজিদের মিনার

www.pathagar.com

তৈরীর অনুমতি না দিয়ে থাকতে? এতক্ষণ চুপ চাপ বসে বসে শুনেছেন মেলেনি জনসন। এবারে তিনি নড়ে চড়ে বসলেন। তার সাথে চোখাচোখি হতেই তিনি একটুখানি হেসে বললেন 'আমার দেশেও দেখেছি অনেকেই মুসলমান হচ্ছে বা বিভিন্ন দেশ থেকে নতুন নতুন মুসলমান আসছে, তাদের সংখ্যাও বাড়ছে।'

বললাম; কেবল তোমাদের কানাডাতেই নয়, বরং সারা বিশ্বেই একই ধারা। কানাডায় পরিবার প্রতি জন্ম হার হলো ১.৬ জন মাত্র। সভ্যতা টিকে থাকার জন্য কাম্য সর্বনিম্ন হার ২'১১ এর চেয়ে কম। ২০০১ থেকে ২০০৬ পর্যন্ত দেশটির জনসংখ্যা বেড়েছে প্রায় ১.৬ মিলিয়ন বা ষোল লক্ষ।

মজার ব্যাপার হলো এই ষোল লক্ষ বর্ধিত জনসংখ্যার বারো লক্ষই হলো ইমিগ্র্যন্ট বা অভিবাসী, যাদের বেশীরভাগই মুসলিম ইমিগ্র্যন্ট! তারা এখন তোমাদের দেশ আর সমাজের অংশ, অস্বীকার করতে পারবে না। এইসব ইমিগ্রান্টরাই'তো তোমাদের দেশটা গড়ে তুলেছে। আর তারাই কানাডার আগামি দিনের গতি পথটাকে নির্দেশ করবে। তোমাদের পড়শী আমেরিকার বর্তমান জন্মহার ১.৬ জন। সেই কাঙ্ক্ষিত হারের অনেক কম। এর সাথে যদি লাতিন আমেরিকা থেকে আগত অভিবাসীদের হার ধরা হয়, তা হলে সে হার দাড়ায় ২.১১ এ।

১৯৭০ সালে আমেরিকায় মুসলমান ছিল মাত্র এক লক্ষ, আজ চল্লিশ বসর পরে এসে মুসলমানের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে সরকারি হিসেবে নব্বই লক্ষ'তে। অর্থাৎ চল্লিশ বসরে সেখানে মুসলমান বৃদ্ধির হার নব্বই গুণ। তবে বেসরকারী হিসেবে, বৈধ অবৈধভাবে অবস্থানরত সকলকে হিসেবের মধ্যে ধরলে এ সংখ্যা দাড়াচ্ছে এক কোটি ছাব্বিশ লক্ষের কাছাকাছি!

গেল বসর অর্থাৎ ২০০৯ সালে আমেরিকাতে নব্বই হাজার (অপর এক হিসেবে এক লক্ষ কুড়ি হাজার) আমেরিকান ইসলামগ্রহণ করেছে। অথচ ক'দিন আগেও মাত্র কুড়ি হাজার আমেরিকান ইসলাম গ্রহণ করত বসরে। ২০০৭ সালে এ সংখা ছিল সত্তর হাজার। এ ধারা যেমন বেগবান হচ্ছে তেমনি ইসলাম গ্রহণকারীর সংখ্যাও বাড়ছে দিনে দিনে অপ্রতিরোধ্য হারে!

ক'দিন আগে ক্যাথলিক চার্চ ঘোষণা দিয়েছে, বিশ্বে মোট জনসংখার দিক বিচারে তারা মুসলমানদের পিছনে পড়ে গেছে। মাত্র ক'টি বসর আগেও তারা দাবী করত, বিশ্বে একক ধর্মালম্বীর সংখ্যা বিচারে খৃষ্টানরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। কিন্তু আজ নিজেরাই ঘোষণা

www.pathagar.com

দিয়ে সে দাবী থেকে সরেছে। কারণ, পরিবর্তনটা এত সুস্পষ্ট যে, তাকে কোন পাগলেও অস্বীকার করবে না।

তোমরা স্বীকার করো বা না করো, তোমাদের চারিপাশ বদলে যাচ্ছে। তোমাদের সমাজ, দেশ, পরিচিত পরিমন্ডল বদলে যাচ্ছে, বদলে যাচ্ছে তোমাদের জীবনাচার, কৃষ্টি কালচার, ইতিহাস, ঐতিহ্য। বদলে যাচ্ছে তোমাদের আগামি প্রজন্মের চিন্তা-চেতনা, ধ্যান-ধারণা সব। এইসব পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে সমাজ আর জীবনের প্রতিটি অঙ্গণে, প্রতিটি ক্ষেত্রেই।

আমার কথা তাঁরা শুনলেন, কিন্তু কিছুই বললেন না। বলবেনই বা কি? আমি তাদের সমাজ, দেশ, আশ পাশ থেকে বাস্তব তথ্য, সরকারি উপাত্ত নিয়েই কথাগুলো বলেছি। এসবের বিপরীতে একবিংশ শতাব্দীর সচেতন নারীগুলোর বলার মত কোন বক্তব্যই বাকি ছিল না। প্রতিবাদের কোন যুক্তিই তাদের ছিল না।

তেইশ

সেদিনই মেলেনি গেছেন। যাবার সময়ে আমার অধীনে তিনি যে প্রায় আড়াইটা বসর কাজ করেছেন, সে সময়কালটাকে উপভোগ করেছেন বলেই জানালেন। হয়ত করেছেন, হয়ত নয়। বিদায়ের বেলায় এমনটা অনেকেই বলেন সৌজন্যতার খাতিরে। তবে তিনি একজন দক্ষ নার্স ছিলেন, সে কথা মানতে দ্বিধা নেই। আমার আন্ডারে কাজ করাটা উপভোগ করেছেন কিনা জানি না, তবে আমাদের হাসপাতাল তার মত স্টাফ পেয়ে উপকৃত হয়েছে, সে কথা জানিয়েছিলাম।

যাবার সময় সুন্দর ভবিষ্যৎ কামনা করে তার হাতে আমার পক্ষ থেকে কুরআনের একটা ইংরেজি তরজমাকৃত কপি দিয়ে বলেছিলাম 'তোমার জন্য উপহার, আমার পক্ষ থেকে।' তিনি খূশী হয়ে তা হাতে নিয়ে বার বার নেড়ে চেড়ে দেখতে দেখতে আমাকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

মেলেনি গেছেন প্রায় দেড় বসর আগে। আমরা এখনও একই হাসাপাতলে, এখনও সেই একই ভাবে কাজের চাপে কাটে দিন, একই নিয়মে। অবসরের ফাকে ফাকে আলাপও চলে। এর মধ্যে ফারিহার পালক পিতা টমাস গ্রে মারা যাওয়ায় তিনিও

www.pathagar.com

আসেন না। মাঝে মধ্যে মেইলে যোগযোগ হয়। প্রচণ্ড খুশি হয়েছি বিয়ে করেছেন জেনে। গ্লাসগো শহরে প্রতিষ্ঠিত এক ইরাকি কূর্দী ব্যবসায়ীকে জীবনসঙ্গী হিসেবে নিয়েছেন। দাওয়াত দিয়েছিলেন। যাওয়া হয়নি তবে অভিনন্দন জানিয়ে মেইল পাঠিয়েছিলাম।

মেলেনি চলে গেলেও তিনি একটা ধারা শুরু করে রেখে গিয়েছিলেন। মুলত তার আগ্রহেই আমার রুমে কখনও কখনও জেমা, সুজি, মারজুরী, পলা, এরা কেবলমাত্র ইসলাম, মুসলমান বিষয়ে কথা বার্তা বলত বা শুনত। সে ধারাও এক সময় কমে এলো যখন পলা সালসেডো বদলি হয়ে চলে গেলেন আর সুজি এবং মারজুরীর থিসিস শেষ হলে তারাও আসা বন্ধ করলেন ।

সুষমা কিংবা জেমা দুজনের কেউই সিরিয়াস আলোচনা করত না। সুষমা কোন প্রশ্ন করত না। কখনও মন দিয়ে কোন আলোচনা শুনত সেটাও নয়। আর জেমা কেবল বিতর্কের জন্য অথবা বিতর্ক হতে পারে, এমন প্রশ্ন করত। তাই কৌশলে অনেক সময় ব্যস্ততার কারণ দেখিয়ে এড়িয়ে যেতাম। কখনও কখনও কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে সংক্ষেপে দিয়েছি। ফলে আগের মত তেমন আর জমে না।

মাঝে দু'দুবার কানাডার দু'টি হাসপাতাল আমার সাথে যোগযোগ করেছিল ই-মেইলে, মেলেনির জন্য রেফারেন্স চেয়ে। প্রতিবারেই তার ব্যাপারে ভালো রেফারেন্সই দিয়েছিলাম। তিনি যখনই কোন নতুন হাসপাতালে কাজের জন্য আবেদন করেছেন, তখনই প্রথা অনুযায়ি প্রয়োজনীয় দুইজন রেফারির একজন হিসেবে আমার নামটি দিয়েছেন। আর আমিও তার রেফারেন্স পাঠিয়ে দিয়েছি।

এসবই ছিল পরোক্ষ যোগাযোগ। মেলেনি নিজে নন, তার পক্ষ থেকে যোগাযোগ করতেন চাকুরি দিতে আগ্রহী নিয়োগকর্তা, সেইসব হাসাপাতলের হিউমেন রিসোর্স ডিপার্টমেন্টের লোকজন। সে কারণেই জানতে পারতাম, তিনি কখন কোন হাসাপাতলে, কোন দেশে আছেন। এ ছাড়া তাকে সাধারণত স্মরণ হতো না।

অথচ একদিন হঠাৎ সেই মেলেনিকেই স্মরণ হয়ে গেল। তিনিই নিজেই সেই সুদূর কানাডা থেকে আমাকে বাধ্য করলেন তাঁকে স্মরণ করতে। হঠাৎ তার একটা ই-মেইল পেলাম। মেইলটা কোন নিয়োগ কর্তার বা কোন হাসাপাতল থেকে নয়, সরাসরি মেলেনির কাছ থেকেই। এক অদ্ভূত এবং অপ্রত্যাশিত মেইল;

www.pathagar.com

ডিয়ার জিয়া,

আসসালামু আলাইকুম, পিস বি আপন ইউ।

হয়ত অবাক হবে, হয়ত ভুলেও গেছ আমাকে। আমি আজ তোমাকেই খুব স্মরণ করছি। কারণ, আজ স্বীকার করতেই হয় যে, আমার আজকের পরিবর্তনের সুত্রপাতটা হয়েছে তোমার সাথে কথোপকথনের ধারা থেকে।

অথবা নিদেন পক্ষে সেই সব কথোপকথনের সুত্র ধরেই হয়ত নিজের মনের গভীরে প্রশ্ন উদিত হয়েছিল। তোমার অনেক আলোচনাই আমার মনে নানান প্রশ্নের সৃষ্টি করে দিয়েছিল। তোমাকে কোন দিনই বলিনি। তবে তোমার আলোচনাগুলো মন দিয়ে শুনতাম। অনেক কথাই তো শুনেছি, ভুলেও গেছি অনেক। তার পরেও প্রশ্নের একটা ধারা চালু ছিল মনে। ইংল্যণ্ড থেকে আসার পরে আমার একটা নেশাই হয়ে গিয়েছিল তোমার দেয়া কুরআনের তরজমাটা পড়া, আর ইউটিউবে কিংবা ইন্টারনেটে নওমুসলিমদের সাক্ষাৎকার শোনা।

এরকমই একটা সাক্ষাৎকার শুনেছিলাম ক'মাস আগে। এক বুড়ি, ছিয়াত্তর বসরের সাদা চামড়ার আমেরিকান, মুসলমান হয়েছেন। তার একটা কথা মনে দাগ কেটে গেল, বলেছেন 'আশে পাশে সবাই মুসলমান হচ্ছে, জানছে ইসলাম, আমি কেন পেছনে পড়ে থাকব? কেবল কি এই কারণে যে, বয়স ছিয়াত্তর বসর এবং আমি একজন নারী! তা হতে পারে না, আমি বঞ্চিত রয়ে যেতে পারি না। তাই এ বয়সেও খোঁজ খবর নিলাম, জানলাম, ইসলাম কবুল করে এখন মুসলমান! জীবনতো চলেই গেছে, তা যাক, দুঃখ নেই, তারপরেও বরং খুশী যে, শেষ পর্যন্ত আল্লাহ আমাকে মুসলমান বানিয়েছেন। মুসলমান হবার আগে মরে যাইনি!'

তুমি একদিন তোমার ফিলিপিনো বন্ধু এলভিনের কথা শুনিয়েছিলে আমাদের, সেই যে তাকে কিছুদিন ভেবে দেখতে সময় দেবার কারণে সে বলে উঠেছিল 'আজ যদি আমি মরে যাই, তা হলে তো মুসলমান না হয়েই মরলাম, তা হতে পারে না!' সে কথাটা মনে পড়ে গিয়েছিল বুড়ির কথাগুলো শুনতে শুনতে।

বয়সের ভারে কথা জড়িয়ে যাচ্ছে তার পরেও তিনি কি বলিষ্ঠ, কি বোল্ড, কি প্রাউড তার নতুন ধর্মের জন্য। এই বয়সেও তিনি আরবি শিখছেন, কেবল তাই নয়, তিনি সকল মুসলমানদের আহ্বান জানাচ্ছেন তারা যেন বুক ফুলিয়ে বিশ্বকে ইসলাম জানান দেয়! এই বয়সেও তিনি কুরআন শিখছেন। একজন থুর থুরে বুড়িকেও ইসলাম কিভাবে আত্মপ্রত্যয়ী করে তোলে! অবাক কাণ্ড!

www.pathagar.com

জিয়া, আমি এখন মারিয়াম জনসন। আলহামদুলিল্লাহ, আমি মুসলমান। আমার জন্য দোয়া করো, আমি যেন দ্রুত আরবিটা শিখতে পারি। আরবি ভাষা কোর্সে ভর্তি হয়েছি, ভাষাটা একটু রপ্ত হলেই ভাবছি হজ্জ্ব করতে যাব। আর হ্যাঁ, তোমাকে আবারও ধন্যবাদ। হয়ত আবারও দেখা হবে। হয়ত এ দুনিয়াতে নয়, ঐ দুনিয়াতে, জান্নাতে। যেখানে প্রতিটি মুসলমানই হবেন এক নতুন বিশ্বের গর্বিত বাসিন্দা। দোওয়া করো, আমি যেন সেখানে ঠাঁই পাই, উইশ উই উইল মিট এগেইন ইন জান্নাত!'

মারিয়াম জনসন

ওন্টারিও / কানাডা।

অনেক দিন আগে কুয়েতের আইপিসি'তে কর্মরত ফিলিপিনো পাদ্রী থেকে ধর্মান্তরিত মুসলমান মরহুম আব্দুল্লাহ স্পিরিটো'ও তার দু'হাতে আমার ডান হাতটি ধরে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে ঠিক এরকমই বলেছিলেন 'উই উইল মিট এগেইন ইন জান্নাত' (We Will meet again in Jannat!) সে কথাটা মনে পড়ে গেল।

কখন যে চোখ দুটো ভিজে এসেছে মেইলটা পড়তে পড়তে, টেরই পাই নি! সম্বিত ফিরে পেলাম পোলিশ নার্স ক্যাথরিন দ্যবরোস্কা আর তার সাথে আমার এ্যাসিস্ট্যান্ট পল বার্ন এসে দরজায় টোকা দিচ্ছেন, তা শুনে। কাঁচের ভেতর দিয়ে তাদের দেখে উঠে দাঁড়ালাম। ওরাও ভেতরে ঢুকছে ততক্ষণে। কিন্তু ভেজা চোখ তুলে তাকাতে পারলাম না যেন। ওদের দিকে না চেয়েই বললাম 'তোমরা বসো, আমি আসছি।'

বেরিয়ে এলাম দ্রুত কান্না লুকোতে। ততক্ষণে আমার দু'চোখ বয়ে যেন উত্তর পূর্ব ইংল্যণ্ডে আমার বাড়ীর পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া 'টাইন' নদীর ঢেউ নেমেছে! নিরিবিলি থাকি কিছুক্ষণ! কোণার খালি রুমে চোখটা ধুয়ে আসি। এখন আর কোন কাজই করব না, যতক্ষণ না আল্লাহর দরবারে একটা সেজদা দিচ্ছি। বেরিয়ে গেলাম, অন্তরের সকল আবেগ আর উচ্ছ্বাসকে আল্লাহর উদ্দেশ্যে তুলে ধরতে, একটা সেজদার মাধ্যমে! রাব্বানা লাকাল হামদ্। হে রব, সকল প্রশংসা একমাত্র তোমারই।

www.pathagar.com